সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন : স্রষ্টার বহু স্বর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

পিয়ালী দত্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০ ০৩২

২০১৭

Certified that the Thesis entitled

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of ……………………………….

……………………………………………………………….........

…..…………………………………………………………………..

And that neither this Thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by
the Supervisor ::

Dated ::

Candidate ::

Dated ::

মুখবন্ধ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা লোকসংস্কৃতির জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, *ঠা'নদিদির থলে* ও *দাদামশা'য়ের থলে* তাঁর লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তবে তাঁর সাহিত্য রচনা শুধুই লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী, চিঠি, গান— শিষ্ট সাহিত্যের প্রায় সব আঙ্গিক নিয়েই তিনি চর্চা করেছেন এবং কম-বেশি সাফল্যও লাভ করেছেন। বর্তমান গবেষণাপত্রে দক্ষিণারঞ্জনের রচিত-সংকলিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠি, গান এবং ব্রতকথা, লোককথা, রসকথা, গীতিকথা বিষয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আর সবার প্রথমে লেখকের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন যে চিত্রকর হিসাবেও দক্ষ ছিলেন তার কয়েকটা নমুনা প্রদত্ত হয়েছে। আর রয়েছে 'দয়াময়ীর কথা' উপন্যাসের লেখিকা সুনন্দা শিকদারের সাক্ষাৎকার, যাঁর ধারণা মূলত ময়মনসিংহ বিশেষত তাঁর দীঘাপতিয়া (দীঘাপাইত) গ্রামের প্রচলিত কথার ওপর ভিত্তি করেই *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র কাহিনি রচনা।

দক্ষিণারঞ্জনের বিস্তৃত সাহিত্যসম্ভারের মূল উদ্দিষ্ট বাংলার শিশু-বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরীর দল। তবে শুধু একথা বললে সবটা বলা হয় না, তরুণ-তরুণী-প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সমগ্র বঙ্গবাসী দক্ষিণারঞ্জনের সুবিশাল সাহিত্যসৃষ্টি থেকে নিজের নিজের প্রয়োজন বা অভিরুচি অনুযায়ী রসদ খুঁজে নিয়েছেন এবং বলাই বাহুল্য সমৃদ্ধ হয়েছেন। নীতি-আদর্শ-দেশপ্রেম-পরোপকার-গার্হস্থ্যপ্রেম-পাতিব্রত্য-সেবাপরায়ণতা-রূপকথার স্বপ্নময় জগতের ছোঁয়া-হাস্যরস-গীতিধর্মিতা — দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যে সবেরই সন্ধান মেলে। সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় দক্ষিণারঞ্জনের উপলক্ষ্য-লক্ষ্য। তা হল বাংলার হারিয়ে যাওয়া 'কথা'দের উদ্ধার করে তাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং বাংলার মানুষকে সেসব আবার ফিরিয়ে দেওয়া। দেশ-বিদেশের যেসব ব্যক্তি 'বাংলাকে জানার' 'অভিলাষ করেন', তাঁদেরকে 'বাংলার কথা ও গানে'র 'নিবিড় সন্ধান' নিমগ্ন হতে হবে। ''জাতির জীবন-বল, অক্ষয় ঐতিহ্য, অশেষ কাব্য, বিকশিত হৃদয়, দিবস রাত্রি পরিপূর্ণ রয়েছে এই পরিচয়ে'' (অভিভাষণ 'বাংলার কথাসঙ্গীত', *ঠাকুরদাদার ঝুলি*)। দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-পাঠে এই পরিচয় সম্পূর্ণতা পায়।

এই গবেষণা-কর্ম সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের বিশেষ অবদান রয়েছে।

ধন্যবাদ জানাই তাঁদের যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত ও রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ আমার গবেষণাকর্মে বিশেষ সহায়তা করেছে। তবে তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ধৃষ্টতা আমার নেই, গুরুমশাই তথা অভিভাবক হিসাবে তাঁকে নমস্কার জানাই। গুরুপত্নী শ্রীমতি কৃষ্ণা বসু রায়কে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শ্রীমতি সুনন্দা শিকদারকে তাঁর মূল্যবান তথ্যপ্রদানের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

অক্ষর বিন্যাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীযুক্ত শুভেন্দু কৃষ্ণ তরফদারকে ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে সমস্ত কাজের প্রেরণা, আমার বাবা-মাকে জানাই প্রণাম।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাক্কথন	১
প্রথম পর্ব	
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনী	২-১২
১. প্রথম অধ্যায় — দক্ষিণারঞ্জনের জীবনী	৩-১২
দ্বিতীয় পর্ব	
দক্ষিণারঞ্জনের রচনা : আলোচনা ও মূল্যায়ন	১৩-১০৪
২. দ্বিতীয় অধ্যায়— কবিতা	১৫- ৫৮
৩. তৃতীয় অধ্যায় — গল্প	৫৯- ৮৫
৪. চতুর্থ অধ্যায় — প্রবন্ধ	৮৬-১০১
৫. পঞ্চম অধ্যায় — জীবনী, চিঠি, গান	১০২-১০৪
তৃতীয় পর্ব	
দক্ষিণারঞ্জনের লোকসংস্কৃতির উপাদান : সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	১০৫-৩২৬
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় — ব্রতকথা	১০৮-১২৯
৭. সপ্তম অধ্যায় — লোককথা	১৩০-২১১
৮. অষ্টম অধ্যায় — রসকথা	২১২-২৫৪
৯. নবম অধ্যায় — গীতিকথা	২৫৫-৩২৬
চতুর্থ পর্ব	
গবেষণার পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সন্ধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	৩২৭-৩৩৩
১০. দশম অধ্যায় — গবেষণার পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সন্ধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	৩২৮-৩৩৩
পঞ্চম পর্ব	
উল্লেখপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী	৩৩৪-৩৪৪
১১. একাদশ অধ্যায়— উল্লেখপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী	৩৩৬-৩৪৪
ষষ্ঠ পর্ব	
পরিশিষ্ট	৩৪৫-৩৭৯
১. চিত্রসূচি	৩৪৬-৩৭৭
২. একটা সাক্ষাৎকার	৩৭৮-৩৭৯

প্রাক্‌কথন

‘সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন : স্রষ্টার বহুস্বর’ গবেষণাকর্মকে কয়েকটা পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে জীবনী। প্রথম অধ্যায়ে তাই স্রষ্টা দক্ষিণারঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। কারণ কালজয়ী লোকসাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাছাড়া এই অধ্যায়ে দক্ষিণারঞ্জনের সামগ্রিক রচনাবলীকে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের মৌলিক রচনার পর্যালোচনা। তাই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায় যথাক্রমে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও জীবনী, চিঠি, গান। তৃতীয় পর্বে দক্ষিণারঞ্জন কোথা থেকে তাঁর লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোকে কীভাবে সংকলন-সংরক্ষণ-সংরচন করেছেন সেকথা বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক অভিব্যক্তি, ভাষা-ব্যবহার, লোককথার বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। অধ্যায় বিভাজনও সেরকমই— ষষ্ঠ অধ্যায় ব্রতকথা, সপ্তম অধ্যায় লোককথা, অষ্টম অধ্যায় রসকথা ও নবম অধ্যায় গীতিকথা। চতুর্থ পর্বের আলোচ্য বিষয় সমগ্র গবেষণা কর্মের পরিকল্পনা, বিন্যাস ও লোকসাহিত্য সংকলনের ধারায় দক্ষিণারঞ্জনের অবস্থান ইত্যাদি। দশম অধ্যায় তাই সিদ্ধান্ত। পঞ্চম পর্ব ও একাদশ অধ্যায় গ্রন্থপঞ্জি। ষষ্ঠ পর্ব পরিশিষ্ট দুটো অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে চিত্রকর দক্ষিণারঞ্জনের লোককথা বিষয়ক গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত চিত্র ও দ্বিতীয় অংশে একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার যা আলোচ্য গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রথম পর্ব

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনী

১. প্রথম অধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জনের জীবনী

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে সংকলক, সংগ্রাহক ও লেখক তথা শিশু সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ''বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'সাহিত্য সম্রাট' অভিধায় ভূষিত, 'কথাসাহিত্য সম্রাট' অভিধায় তেমনি ভূষিত হয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।''[১] 'যশোর নগরধাম প্রতাপ আদিত্য নাম' — বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম 'রাজা' প্রতাপাদিত্যের জামাতা 'রাজা' উদয়নারায়ণের বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি আবার চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের 'দৌহিত্র বংশীয়' ছিলেন। তাঁর ''বংশধারা প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সাভার-এর নিকটবর্তী উলাইল গ্রামের প্রাচীন মিত্র মজুমদার বংশে''[২] ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২-রা বৈশাখ (ইংরাজি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫-ই এপ্রিল) দক্ষিণারঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মাতা কুসুমময়ী। স্বভাব-চঞ্চল দক্ষিণারঞ্জনের লেখাপড়ায় খুবই অনাগ্রহ ছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতা-মাতার দুশ্চিন্তা ছিল ক্রমবর্ধমান। এমন সময় মাত্র ন'বছর বয়সে তাঁর মায়ের অকাল মৃত্যুতে পিতা যখন দিশাহারা, তখন এগিয়ে এলেন পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী। পতি-পুত্রহীনা রাজলক্ষ্মীদেবী ছিলেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দীঘাপাইত গ্রামের জমিদার গৃহিণী, প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। দক্ষিণারঞ্জন পিসিমার নিরাপদ আশ্রয়ে-আদরে প্রতিপালিত হতে থাকলেন। এই আশ্রয় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

''প্রয়াত মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষিণারঞ্জন লাভ করেছিলেন জীবনের পরম সম্পদ — রূপকথার রস। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথার প্রতি পুত্রের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলতেন কথাকাব্যের মধুরস সংযোগে। মায়ের কাছে শোনা রূপকথার চারাগাছটি সযত্নে বর্ধিত হয়েছিল পিসিমার স্নেহসিঞ্চনে।''[৩] এই পিসিমার 'অসামান্য বাগ্‌ভঙ্গী ও কথাশৈলী'র দ্বারা দক্ষিণারঞ্জনের 'রূপকথার আনন্দলোক' উজ্জীবিত হয়েছিল, সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল। এর সঙ্গে গ্রামের 'পরণ কথা'র আসর *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র পটভূমি তৈরি করেছিল।

দক্ষিণারঞ্জনের শিক্ষাদীক্ষার কথা বলতে গেলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর সুসংবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষা অবহেলিতই রয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই গৃহশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ষোল বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে তিনবছর ধরে পড়াশোনা নিয়ে ঘষামাজার শেষে সন্তোষ গ্রামে সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুলে দু'বছর পড়লেন। এই বিদ্যালয়ে পড়াকালীন কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত ঘটে। মুর্শিদাবাদের নবাব হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। ''খুব কম বয়েসেই দক্ষিণারঞ্জনের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। ১৩ বছর বয়সেই তাঁর লেখা কবিতা 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয়।''[৪] তবে এই তথ্যগুলো থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে তেরো বছর বা কুড়ি বছর যে বয়সেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হোক না, তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন ছাত্র-কিশোরদের জন্য উৎসর্গ করে দেবেন।

বিদ্যালয়ের ''পড়া শেষ করে একুশ বছর বয়সে পিতার সাথে মুর্শিদাবাদ গমন''[৫] করেন। একুশ থেকে ছাব্বিশ - এই পাঁচ বছর তাঁর পিতার সান্নিধ্যে কাটে। কিন্তু সেখানেও দক্ষিণারঞ্জন শিক্ষা-বৈতরণী ঠিকমত পার হতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে এফ.এ. অধ্যয়ন কালে তাঁর কলেজের শিক্ষায় দাঁড়ি পড়ে। তবে মুর্শিদাবাদে থাকায় দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-জীবনের ইতিবাচক দিক হল পিতার কবি-প্রকৃতি এবং চারপাশের প্রকৃতি তাঁকে 'সাহিত্যের পাঠ' দিতে পেরেছে। বহরমপুর থাকাকালীন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'সুধা' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে দক্ষিণারঞ্জনের সম্পাদনার জীবন শুরু। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে রচনা করেন *উত্থান* কাব্যগ্রন্থ। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ এই চার বছর চলার পর 'সুধা'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তবে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ ইতিহাসবিদ 'সুধা'র দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ও আকর্ষিত হয়েছিলেন। এতে সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন একাধারে কবিতা ও বিজ্ঞান উভয়ের চর্চাই করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্থাপিত ব্রাহ্মমিশন প্রেস থেকে 'সুধা'র মুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদিত হত। এই সময় থেকেই আবার 'সাহিত্য পরিষদ', 'প্রদীপ', 'বদ্বীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় দক্ষিণারঞ্জন মুদ্রিত আকারে প্রবন্ধাবলী, লেখাপত্র প্রকাশ করতে থাকেন।

পিতার মৃত্যু ‘সুধা’র প্রকাশে ছেদ টেনে দিল। ফিরে চললেন তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে আবার ময়মনসিংহে, পিসিমার কাছে। পিসিমার দেখভাল করা ছাড়াও জমিদারী পরিদর্শনের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে গ্রামে গ্রামে পর্যটন করতে হত। আর সেই সূত্রেই গ্রাম-বাংলার নানা প্রান্তর, গঞ্জ, ডিঙি, নৌকা, নদী-নালা, ‘দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে’র বাঁশির সুর, ‘রসিক মাঝির ভাটিয়ালী গান’, ধানের ক্ষেতে বাতাসের দোল খাওয়া, পাখির কলতান — সব মিলিয়ে বাংলার ‘লোক’ মানসে লালিত ‘লোককথা’ দক্ষিণারঞ্জনের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিল।

‘‘এক বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে দক্ষিণারঞ্জন লোককথা সংগ্রহ শুরু করেন। তখন আমাদের দেশ পরাধীন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তখন এই দেশ প্রভাবিত, গ্রাম্য সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের প্রতি যখন কেউই দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করত না, সেই সময়ে লোকসাহিত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যথার্থ এক স্বাদেশিক কর্তব্য পালন করেছিলেন।’’[৬] ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত পল্লীর ‘ঠাকুরমা’, ‘ঠাকুরদা’র কথিত নানান গল্পের ঝুলি, অনবদ্য বাচন ভঙ্গির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের গভীর অভিজ্ঞতাবোধ, জীবনবীক্ষা, স্বাদেশিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ‘‘কী অপরিসীম তিতিক্ষা, কী গভীর আগ্রহ, কী আকণ্ঠ দেশপ্রেম! এক প্রেরণাময় নিষ্ঠায় এই একক সারথি দুর্গম পথ পরিক্রমা করলেন। গল্প শুনেছেন, একই গল্প বার বার, বিভিন্ন জনের মুখে কত বিচিত্র-বিভিন্নতায়। তা থেকে ছাঁটাই-বাছাই, পরিবর্জন-পরিমার্জন। হারিয়ে যাওয়া দুটি আখ্যানের যোগসূত্র নির্মাণ। সর্বত্র সংগতিবিধান — এর কথায়, এর কাব্যে, এর সুরে, এর সংস্কারে। তারপর শ্রেণীবিভাগ — গীতিকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও রসকথার চতুর্বর্গে।’’[৭] এদের মধ্যে *ঠাকুরমা’র ঝুলি* হল ‘রূপকথা’, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা হল ‘গীতিকথা’, *ঠা’ন্‌দিদির থলে* ‘ব্রতকথা’ ও *দাদামশা’য়ের থলে* ‘রসকথা’। ‘‘গ্রামের বৃদ্ধাদের মুখের কথা ফোকলা দাঁতের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জড়িয়ে যেতো। সঠিক কাহিনী উদ্ধারের জন্য দক্ষিণারঞ্জন গল্পকারদের কথাকে ফনোগ্রাফের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করে নিতেন। তারপর বারবার সেই রেকর্ড বাজিয়ে তা থেকে সঠিক কাহিনী বুঝে নিয়ে খাতায় লিখে নিতেন। তারপর নিজস্ব লেখন-রীতি অনুসারে সেই কাহিনীকে সাহিত্যরূপ দিতেন।’’[৮]

মুর্শিদাবাদ-ময়মনসিংহের পাট চুকিয়ে ২৯ বছর বয়সী দক্ষিণারঞ্জন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংক্ষুব্ধ কলকাতায় 'খাঁটি স্বদেশী সম্পদ' সঙ্গে উপস্থিত হলেন। পিসিমার অর্থানুকূল্যে 'প্রায় প্রতিষ্ঠিত লেখক' দক্ষিণারঞ্জন নিজেই এক প্রেস খুলে ফেললেন। ইতিমধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় দক্ষিণারঞ্জন রচিত 'গ্রাম্যগীতি', 'গান ও ধুয়া' (ত্রয়োদশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) এবং 'সুকবি বল্লভাদি বিরচিত বৃহৎ পদ্মপুরাণ' (ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র প্রেসকপিও যখন প্রায় তৈরি এমন সময় দক্ষিণারঞ্জনের বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেন কানা হরিদত্তের পুথির সন্ধানে তাঁর বাসায় এলেন। তাঁর চোখে পড়ল *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র পাণ্ডুলিপি। উচ্ছ্বসিত-পুলকিত দীনেশচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তখনকার নামকরা প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্সের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের পরিচিতিকরণ ঘটালেন। আচার্য সেনের সহায়তায় দক্ষিণারঞ্জন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গেও পরিচিত হন এবং তিনি দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত 'পুষ্পমালা'র গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন। 'পুষ্পমালা'র লোককথার গুণমুগ্ধ-মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকবর্গের জন্ম হল।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে) ভাদ্রমাসের শেষে ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয় *ঠাকুরমা'র ঝুলি*। এর ঠিক এক বছর পরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে *ঠাকুরদাদার ঝুলি* প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও দীনেশচন্দ্র এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর সহায়তার কথা মুক্ত কণ্ঠে দক্ষিণারঞ্জন স্বীকার করেছিলেন। এই প্রকাশকই একে একে *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ), *ঠা'নদিদির থলে* (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ), *দাদা মশা'য়ের থলে* (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশ করলেন। দীনেশচন্দ্রের পরামর্শেই দক্ষিণারঞ্জন-সংগৃহীত কাহিনির এই পর্যায়-বিন্যাস। ''প্রথম গ্রন্থে বালকদের উপযোগী রূপকথা, দ্বিতীয় গ্রন্থে নারীদের ব্রতকথা, তৃতীয় গ্রন্থে মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা প্রভৃতি গীতিকথা এবং চতুর্থ গ্রন্থে বৈঠকী গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থসমূহ পূর্ববঙ্গের পল্লী এলাকার কথাসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যে এক স্থায়ী আসন দান করেছে।''[৯]

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র প্রথম সংস্করণের গল্পগুলো অবিকৃত ছিল। কিন্তু 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভাষার দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুললে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে দক্ষিণারঞ্জন সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিমার্জিত করলেন 'ঝুলি'কে। এতে তা

সর্বজনগ্রাহ্য হলেও এই ‘লোকসাহিত্যের অঙ্গহানি’ ঘটে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তিনিও এর কাব্যধর্মিতা, অপরিশীলিত ‘লোক’-ঘেঁষা কথন-রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন — ‘‘দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা’র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলা নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।’’[১০]

গ্রন্থকারের ‘নিবেদন’ অংশে লেখক নিজে লিখেছেন — ‘‘পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত; কিন্তু সেই রূপকথা তা’রপর তা’রপর তা’রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা’রপর শুনিতে শুনিতে, শুনিতে শুনিতে চোখ বুজিয়া আসিত; — সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত আমার মত দুরন্ত শিশু! — শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।’’[১১] শোনা গল্পগুলো নিজের মত করে পরিবেশন করলেন দক্ষিণারঞ্জন, তাঁর হাত ধরে আমরাও বাংলার রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করলাম। ঋষি অরবিন্দ তাঁর ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় *ঠাকুরমার ঝুলি*-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ড. আশা দেবী তাঁর *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে ফ্রান্সের পেরো এবং জার্মানির গ্রিম ভাইদের তুলনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মান ভাষায় গ্রন্থটার অনুবাদ হয়। ‘‘দক্ষিণারঞ্জন সংগৃহীত এই গল্পগুলি প্রভূত সমাদর লাভ করে। লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর *ঠাকুরমা’র ঝুলি* জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। *ঠাকুরমা’র ঝুলি* ও *ঠা’নদিদির থলে* একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে নৃতত্ত্ববিদ্যার পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল।’’[১২]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জনের অতি জনপ্রিয়, দেশপ্রেম বিষয়ক অপূর্ব গীতিগ্রন্থ *মা বা আহুতি* প্রকাশিত হয়। মাসিক ‘সারথি’ পত্রিকায় (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে) তিনি বেশ কয়েকটা স্বদেশপ্রেমের প্রবন্ধ লেখেন যে প্রবন্ধগুলো এখনও সংকলিত হয় নি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সহায়তায় ভারতীয় নারীদের মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থ *আর্যনারী*-র দুটো খণ্ড

প্রকাশ করেন। ঢাকার ‘তোষণী’ পত্রিকায় ‘ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত’ ‘চারু ও হারু’ রচনার দ্বারা দক্ষিণারঞ্জন বাংলা সাহিত্যে ‘কিশোর-উপন্যাস’ নামক নতুন শাখার সূচনা ঘটান বলা যেতে পারে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে এটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *আমার দেশ, আমার বই, উৎপল ও রবি, কিশোরদের মন, খোকাখুকুর খেলা, পূজার কথা, চিরদিনের রূপকথা, ফার্স্ট্ বয়, লাস্ট্ বয়, বাংলার সোনার ছেলে, সবুজ লেখা* ইত্যাদি গ্রন্থ শিশু-কিশোরদের উদ্দেশেই রচিত। বরদাকান্ত মজুমদার সম্পাদিত ‘শিশু’ নামক কিশোর পত্রিকার প্রথম বর্ষ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)-এর প্রথম সংখ্যার শুরুতে ‘শিশু’ নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। তিনি *পৃথিবীর রূপকথা* গ্রন্থের অনুবাদক ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন চিত্রাঙ্কণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র পাতায় সেই বহু পরিচিত ছবিগুলোর স্রষ্টা স্বয়ং দক্ষিণারঞ্জন। ‘বিচিত্র’ পত্রিকার পাতায় ‘অলক্ষিত চিত্রাদি’ বেশ মনে রাখার মত।

দক্ষিণারঞ্জন যে বিজ্ঞান-মনস্ক ছিলেন, তার পরিচয় ১৯৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’-এর সহসভাপতিত্ব। তিনি ‘পথ’ পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ‘পথ’ ছিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র। তিনি ‘বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি’র কার্যকরী সভাপতি ও পরিভাষা রচয়িতা ছিলেন।

জীবনে বহু সম্মান লাভ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। ঢাকার বান্ধবসমাজ ‘কাব্যানন্দ’, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে দিয়েছে ‘বাণীরঞ্জন’ উপাধি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে শিশু সাহিত্য পরিষদ ‘শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক রূপে তাঁকে ‘ভুবনেশ্বরী’ পদক দেয়। ‘লোক সংস্কৃতি পরিষদ’, ‘সব পেয়েছির আসর’, নন্দন, সাহিত্যতীর্থ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ‘কথাসাহিত্য সম্রাট’ অভিধায় অভিহিত হন। “লোক কাহিনী সংগ্রহ ও বিন্যস্ত ও সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে তাঁকে সাহিত্য পরিষদ প্রভূত উৎসাহ দেন।”[১৩]

দক্ষিণারঞ্জনের পুত্র রবিরঞ্জন এবং কন্যারা হলেন প্রতিমা ও কল্যাণী। তাঁর এক জামাই ছিলেন বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী। পুত্র, এই জামাই ও স্ত্রীর পরপর মৃত্যু বৃদ্ধ দক্ষিণারঞ্জনকে মুমূর্ষু করে তোলে।

রূপকথার সংগ্রাহক, লেখক, গবেষক, শিশু-সাহিত্যিক, গীতিকার, কবি, ব্রতকথার লেখক, প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞান-প্রেমী, রস-সাহিত্যিক, জীবনী লেখক, সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৬-ই চৈত্র (ইং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় আশি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও গিরীশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ঋষি অরবিন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ বহু সাহিত্যিক ও সমালোচক দক্ষিণারঞ্জনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। 'রূপকথার সম্রাট' তথা লোকসাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বাংলার লোকসাহিত্য সংরক্ষণের জন্য সারা জীবন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তার জন্য বাংলা সাহিত্য জগৎ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ''দক্ষিণারঞ্জন বাঙালি শিশু কিশোরকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা আমাদের অভিভূত করে। তবে, এখনকার বাবা মায়েদের কাছে অবসানমুখী কালান্তর পর্বে সব কিছুই অর্থহীন এমনকি শত-শত বছরের লোক কাহিনীও আপাতত ভাঙা টুকরো হয়ে পড়ে আছে। এর পরিবর্তন হওয়া বোধহয় আর সম্ভব নয়।''[১৪]

<u>দক্ষিণারঞ্জন রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা</u> :

উত্থান — ১৯০২

ঠাকুরমা'র ঝুলি — ১৯০৭

মা বা আহুতি — ১৯০৮ (স্বদেশপ্রেম মূলক গীতিমঞ্জুষা)

ঠাকুরদাদার ঝুলি — ১৯০৮

ঠা'নদিদির থলে — ১৯০৯ (বাংলার ব্রতকথার অমূল্য সংগ্রহ)

খোকাখুকুর খেলা — ১৯০৯

আর্যনারী (১ম ও ২য় ভাগ) — ১৯০৮ ও ১৯১০ (ভারতীয় নারীচরিত্রের মহিমা কীর্তিত ও উচ্চারিত, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত)

সরল চণ্ডী — ১৯১০ (সচিত্র এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মচিন্তা সহজ ভাষায় লিখিত। এটা শিশুমনের উপযোগী)

চারু ও হারু — ১৯১২ (ঢাকার 'তোষণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, অভিনব কিশোর-সাহিত্য)

আমার (আমাল) বই — ১৯১২

দাদামশা'য়ের থলে — ১৯১৩ (হাস্যরসের রূপকথা বা লোককথাধর্মী কাহিনি সঞ্চয়ন)

পূজার কথা — ১৯১৮

ভাদ্র — ১৯২৭

ফার্ষ্টবয় — ১৯২৭

উৎপল ও রবি — ১৯২৮

কিশোরদের মন — ১৯৩৩ (কিশোর উপন্যাস)

কর্মের মূর্তি — ১৯৩৩

বাংলার সোনার ছেলে — ১৯৩৫

সবুজ লেখা — ১৯৩৮ (মৌলিক রূপকথা)

চিরদিনের রূপকথা — ১৯৪৭ (কথাসাহিত্যের রূপকথা বিভাগ)

আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী — ১৯৪৮

দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড) — ১৯৭৯

দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড) — ১৯৮১।

এছাড়াও লিখেছেন—*লাষ্টবয়, আমার দেশ, ক্যাঙ্গারু, কন্যকা কুন্তী, গ্রাম্য-গীতি, প্রথম কথা, একটি চিঠি, পৃথিবীর রূপকথা* (অনুবাদ গ্রন্থ) ইত্যাদি গ্রন্থ।

এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে *উত্থান, মা বা আহুতি, আর্যনারী, সরল চণ্ডী, আমার বই* বা *আমাল্ বই* ('বাংলার কচি কথার দুধের সাগর'), *কর্মের মূর্তি, স্তবমুকুল* ('পবিত্র সুন্দর বই, বাছা বাছা স্তবের মুকুল মালা') — এই গ্রন্থগুলোকে সংগ্রহ করা যায় নি। এই গ্রন্থগুলো আপাতত অ-মুদ্রিত।

সম্পাদিত পত্রিকা :

‘সুধা’	—	১৯০১ থেকে ১৯০৪
‘সারথি’	—	১৯০৮ (বঙ্গ সাহিত্য মন্দির ইত্যাদি স্বদেশ ভাবনাবিষয়ক জাতীয়তাবাদী গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের প্রকাশ)
‘পথ’	—	১৯৩০ থেকে ১৯৩২

<u>দক্ষিণারঞ্জনের বংশ-পরিচয় ও বংশ-তালিকা সংক্রান্ত তথ্য</u> :

১. দক্ষিণারঞ্জন বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা রাজা উদয়নারায়ণের বংশধর।

২. চন্দ্রদ্বীপরাজ রামচন্দ্রের দৌহিত্র-বংশীয়

৩. রমদারঞ্জন মিত্র-মজুমদার ও কুসুমময়ী দেবী

↓

দক্ষিণারঞ্জন

↓

রবিরঞ্জন　　প্রতিমা　　কল্যাণী

৪. ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার দীঘাপাইত গ্রামের জমিদার-গৃহিণী রাজলক্ষ্মী চৌধুরানীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তথ্যসূত্র:

১ তিমির বরণ চক্রবর্তী, *বাঙলা লোক সংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ*, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৭শে মার্চ ২০০২, পৃ. ৮৯

২ বারিদবরণ ঘোষ, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

৩ তদেব

৪ তিমির বরণ চক্রবর্তী, *বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ*, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৭শে মার্চ ২০০২, পৃ. ৮৯

৫ *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, জুন ১৯৮৫, পৃ. ১১৭

৬ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৪৫

৭ বারিদবরণ ঘোষ, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

৮ প্রবীর ঘোষ, 'দক্ষিণারঞ্জন প্রসঙ্গে আরও দুটি কথা', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮

৯ *বাংলা পিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩১১

১০ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২

১১ তদেব, পৃ. ১৫

১২ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৫; পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৩৭

১৩ দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪; দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩, পৃ. ৫৩৯

১৪ রানা চট্টোপাধ্যায়, 'শতবর্ষে ঠাকুরমা'র ঝুলি : একটি প্রতিবেদন (১৯০৭-২০০৭)', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৬১

দ্বিতীয় পর্ব

দক্ষিণারঞ্জনের রচনা : আলোচনা ও মূল্যায়ন

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মৌলিক রচনাকে খুব সূক্ষ্ম বিচারে সৃজনশীল সাহিত্য ও মননশীল সাহিত্য—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সৃজনশীল সাহিত্যের মধ্যে তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, জীবনী ও চিঠি—এই চার ধরনের রচনাকে রাখা যেতে পারে। আর মননশীল রচনা হল প্রবন্ধ।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের এই সৃজনশীল সাহিত্যকে যথাক্রমে ১) বিষয়, ২) চিন্তা, ৩) চরিত্রায়ন, ৪) ভাষা ও ছন্দ, ৫) শৈলী (প্রতীক-চিত্রকল্প ও অলঙ্কার), ৬) রস বা শিল্পগুণ, ৭) মহৎ জীবন ও ইতিহাসবোধ —এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

দক্ষিণারঞ্জনের স্বকীয় রচনাবলীতে কিশোর বয়সোপযোগী চিন্তা-চেতনা-কল্পনার সমাবেশ ঘটেছে। দক্ষিণারঞ্জনের এই কিশোর গ্রন্থাবলী হল 'সোনালী কথার দেশ'। কবিতা, গল্প, জীবনী, চিঠি, প্রবন্ধ — সব ক্ষেত্রেই যেন কিশোর দক্ষিণারঞ্জনকে খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে তাঁকে কিশোর-সাহিত্যিক বলা যেতে পারে। কৈশোরকে তিনি বড় বেশি অনুভব করেছেন। কবিতা, গল্প, জীবনী, চিঠি, প্রবন্ধ — সবেরই পরতে পরতে কিশোর কালের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-চপলতা, ছন্দ, আবেগ স্পষ্ট।

(বিঃ দ্রঃ — সময় চিহ্ন হিসাবে খ্রিস্টাব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিতা

কবিতা হল সৃজনশীল সাহিত্য। এই কবিতা রচনায় দক্ষিণারঞ্জন যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল— *খোকাখুকুর খেলা* (১৯০৯), *ভাদ্র* (১৯২৭), *কন্যকা কুন্তী* । এছাড়াও বেশ কয়েকটা কবিতা তাঁর *বাংলার সোনার ছেলে* (১৯৩৫), *সবুজ লেখা* (১৯৩৮), *গ্রাম্যগীতি* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাগুলোর সংরূপগত আলোচনায় প্রবেশের আগে সংক্ষেপে বিষয়বস্তু বলে নেওয়া দরকার।

খোকাখুকুর খেলা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা হল — 'খোকাখুকুর খেলা', 'ভাইবোন', 'সর্বদমন', 'অন্নপূর্ণা মা', 'টুল! টুল!! টুল!!!', 'মামার বাড়ী', 'দুধবরণ', 'কালকেতু', 'বাণিজ্য', 'বেহুলা সতী', 'বুল্ বুল্ বুল্ বুল্ মামা', 'এক তারা - দুই তারা', 'ছি! ছি! ছি!', 'মজার গল্প', 'কে কি হব খেলা', 'আমাদের গ্রাম', 'বাগান', 'গান'। 'খোকাখুকুর খেলা' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে 'সূয্যি মামা'র কাছে ভাইবোনের 'দুধে ভাতে গঙ্গা-জলে' থাকার প্রার্থনা। 'ভাইবোন' কবিতায় ভাই বড় হয়ে দেশভ্রমণ করতে, ধনী হতে, ছেলেদের বেত্রাঘাত করতে চায়। বিপরীতে বোন ভবিষ্যতে সন্তানকে স্নেহে-আদরে ভরিয়ে রাখতে চায়। 'সর্বদমন' কবিতায় রয়েছে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিক্রমশালী পুত্র 'সর্বদমন' বা ভরতের কথা, যার নাম থেকে আমাদের দেশের নাম ভারত। 'অন্নপূর্ণা মা' কবিতায় পঞ্চপাণ্ডব জননী ভোজরাজকন্যা কুন্তীর অন্নপূর্ণার ভূমিকা গ্রহণ, 'টুল! টুল!! টুল!!!' কবিতায় মায়ের কোলে দুই ভাইবোনের অমরত্ব লাভ, 'মামার বাড়ী' কবিতায় খোকনের মামার বাড়ির ক্ষীর, সর, চাকা চাকা দই, রূপনগরের খই, পুতুল, বাঁশি সহ মজার বাড়ির কথা, 'দুধবরণ' কবিতায় দুধবরণের গায়ে জল না মেশায় গয়লা মেয়ের জব্দ হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। 'কালকেতু' কবিতায় ব্যাধনন্দন, মহা শক্তিধর কালকেতু দেবতার বরে রাজত্ব লাভ করে। 'বাণিজ্য' কবিতায় বোনের ভাই সাত রাজ্যের ধনদৌলত নিয়ে বাণিজ্য থেকে ফিরে বউ, নাকি বোন — কার রান্না করা খাবার খাবে — এই সংশয় প্রকাশিত। 'বেহুলা সতী' কবিতায় বেহুলার সতীত্ব মহিমা কীর্তিত হয়েছে। 'বুল্ বুল্ বুল্ বুল্ মামা' যদি সাত ভাই-বোনকে সাতটা কুল দেয়, তাহলে তারা সেগুলো ঘরে নিয়ে যেতে পারবে। 'এক তারা - দুই তারা' কবিতায় তারারা সাত ভাই-বোন

যেন সাত প্রদীপ। ‘ছি! ছি! ছি!’ কবিতায় বলা হয়েছে কাউকে আঘাত না করলে, সকলের বন্ধু হয়ে থাকলে সবার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। ‘মজার গল্প’ কবিতায় রয়েছে — ছোট্ট হনুমানের সূর্য, ইন্দ্রকে খাদ্যদ্রব্য মনে করে খেতে যাওয়ার মজার কাহিনি। ‘কে কি হব খেলা’ কবিতায় বড় হয়ে কার কি হতে চাওয়ার খেলায় সকল বালককে হারিয়ে দিয়ে তাদের বোন সকলের চোখের জল মুছিয়ে দিতে চেয়ে ‘লক্ষ্মীটি’ হয়ে যায়। ‘আমাদের গ্রাম’ কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, পশু-পাখি-মানুষে সরগরম গ্রামের বর্ণনা, ‘বাগান’ কবিতায় ফুল, ফুলের গাছের সারিতে পাখির কলকাকলিতে, মৌমাছির গুঞ্জনে ভরা অনেক যত্নে তৈরি করা একটা সুন্দর বাগানের বর্ণনা আছে। ‘দেশ’ কবিতা *সবুজ লেখা* গ্রন্থে স্বরলিপি সহকারে গান হিসাবে মুদ্রিত। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব ও পশ্চিমে পর্বত-বেষ্টিত ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্য দেশের তুলনাই চলে না।

‘ভাদ্র’ কবিতায় আষাঢ়-শ্রাবণের অঝোর ধারার শেষে ভাদ্র মাসে সোনা রোদের দেখা মেলে, শরতের আগমনী শোনা যায়।

বাংলার সোনার ছেলে গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা হল ‘রূপগাথা’। এই কবিতায় দুই কমলাসীনা মা — লক্ষ্মী ও সরস্বতীর শিশুর বীণার মধুর সুরে গোটা ভুবন ভরে যায়, তার সুরের ঝর্ণাধারা দেশ মাতৃকাকে ব্যাকুল করে তোলে। এখানে বিশ্বকবির কথা বলেছেন কবি। তিনি ছিলেন একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র।

সবুজ লেখা গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা হল ‘খোকার দেশ’, ‘সবুজ কিশোর’, ‘জন্মদিন’, ‘আম্‌রা’, ‘অচীন পথে’, ‘চিঠি’, ‘পরবি’, ‘রামধনু’, ‘ছোটদের শেষের সুর’, ‘বিদায়’। ‘খোকার দেশ’-এ চাঁদ সবার আগে উঠে হাসে, সূয্যি মামার রাজধানীতে চমক লাগে, দীপের আলোয় মায়ের নয়ন দুটো হেসে ওঠে, রূপালি গানের সুর ভাসে, ময়ূরপঙ্খীর পালে রূপনদীর হাওয়া লাগে, রসিক দাদামশাইয়ের হাসিতে পাক ধরে, রাখাল ছেলের বাঁশি বেজে ওঠে,আরো কত কী। ‘সবুজ কিশোর’-এর ইচ্ছা করে নদীর বাঁকে, পাখির ঝাঁকে, মেঘের পাড়ে, দূরে তারাদের সারিতে ভোর-দুপুর-সন্ধ্যাবেলায় গান গাইতে গাইতে মনের পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে সবার সঙ্গে ছুটতে। ‘জন্মদিন’ কবিতায় একটা ছোট্ট ছেলের পাঁচ বছরের জন্মদিনে তার দশ-পনের বছর পার করে অনেক বড় হয়ে যেতে ইচ্ছা করে। ‘আম্‌রা’ কবিতায় ধুলোবালি, তৃণদল,

কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, অরণ্য-পাহাড়-সাগর সকলের শেষে আমরা মানুষরা এলেও 'আম্‌রা'ই সকলের ওপর প্রভুত্ব করছি। 'অচীন পথে' কবিতায় শিশু-কিশোর, উৎসাহে উচ্ছল বিশ্ব-তরুণের দল অচেনা দেশে অচেনা সুদূর পথ দিয়ে চলেছে। 'চিঠি' কবিতায় এক ডাকহরকরার কথা রয়েছে যাকে সকলের বাড়িতে দেখা গেলেও শুধু তার নিজের বাড়িতেই দেখা যায় না। অফিসে, হোটেলে, আখড়াই, গরীবের কুঁড়ে ঘরে, ধনীর প্রাসাদে — সর্বত্র তার সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে। 'পরবি', 'রামধনু' ও 'শেষের সুর' কবিতাগুলো অভিনয়ধর্মী। এগুলোকে নাটিকাও বলা যেতে পারে। 'পরবি' কবিতায় আটটা চরিত্র আছে — শিশু, শৈশব, বালক, বালিকা, বাল্য, কিশোর, কিশোরী ও কৈশোর। কৈশোর রঙিন, অমল আনন্দে গর্বিত হয়ে জগতে 'পরবি' হিসাবে আসে। 'রামধনু' কবিতায় রামধনুর লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনে, কমলা, ধূসর — এই সাত রং উপস্থিত। তা ছাড়াও কালো ও সাদা রং চরিত্র হিসাবে পৃথক পৃথক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত। 'ছোটদের শেষের সুর' কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছয় দল ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাদের কেউ চঞ্চল, কেউ হাস্যোজ্জ্বল। 'বিদায়' কবিতায় কোথাও রুপোর বাঁশির বেদনা ভরা বিদায়ের সুর, আবার কোথাও জাগরণের সাগরে উজ্জ্বল সুমিষ্ট সোনার বাঁশির ধ্বনি শোনা যায়।

'কন্যকা কুন্তী' প্রথমে একটা গল্প। তারপরে তার সঙ্গে একটা কবিতা যুক্ত হয়েছে। গল্পে আছে যদুবংশের মহিমান্বিত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা শূরসেন তাঁর অপরূপ লাবণ্যময়ী, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত কন্যা পৃথার জন্মের পর বন্ধু কুন্তীভোজের হাতে তাঁকে তুলে দেন। রাজার প্রাসাদে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। কুন্তী জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অন্নপূর্ণার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এর সঙ্গে 'অন্নপূর্ণা মা' কবিতার বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য আছে।

গ্রাম্যগীতি গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা হল 'বেলী', 'মরণান্তে', 'রথযাত্রা', 'ঝঞ্ঝা-শেষে', 'জুলী'। 'বেলী' কবিতায় কবির নির্জন কুটির, চারপাশের সবুজ শোভা, নদীর তীর, পাখিদের কলকাকলি, গোপ-নারীদের জল ভরতে আসা, সর্বোপরি 'বেলী' নামের এক গোপনারীর প্রতি কবির মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। 'মরণান্তে' কবিতায় বলা হয়েছে মৃত্যুর শেষে আমাদের শিক্ষারও শেষ। 'রথযাত্রা' কবিতায় কবি বলেছেন সংকীর্ণ যাত্রাপথে ধর্মের বাধা, মৃত্যুর বাধা, আরও শত শত বাধা রয়েছে। ভগবান যদি কর্মের ডোর ধরেন তবেই কবির জীর্ণ রথ উত্তীর্ণ

হতে পারবে। কবির প্রার্থনা — ঈশ্বর হয় কবির রথযাত্রা শেষ করতে দিন, নয়তো তাঁকে নির্বাণ দিন। ‘ঝঞ্ঝা শেষে’ কবিতায় সব আকাঙ্ক্ষা শেষে কবি তাঁর জীবনের অবসান কামনা করেছেন। আর ‘জুলী’ কবিতায় ‘জুলী’ নামে এক কৃষ্ণবর্ণের মেয়ের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কৃষ্ণকলি’ কবিতায় কৃষ্ণকলির কৃষ্ণবর্ণের সৌন্দর্যের এমন বিবরণই পাওয়া যায়।

<u>**বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণের নিরিখে কবিতাগুলোতে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়**</u>—

১. গার্হস্থ্য সম্পর্ক বা আদর্শ সন্ধান।

পরিবার কেন্দ্রিকতা, নীতিবাচকতা দক্ষিণারঞ্জনের কবিতার গুরুত্বপূর্ণ দিক, ‘রূপগাথা’ কবিতায় যা লক্ষ করা যায়। দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁদের সোনার তুল্য সন্তানকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে গেছেন। সোনার ছেলেকে সরস্বতী বুকে তুলে নিতেই লক্ষ্মী বলেন—

“আমার ছেলে
বীণাপাণি
বুকে নিলেন
ডেকে!”
ধীরে মায়ের ফুট্‌ল হাসি,
কমল নয়ন তুলে’
বীণাপাণির সাথের বাদ
সকল গেলেন
ভুলে’! (‘বাংলার সোনার ছেলে’)

এখানে দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দৈবী মহিমার চেয়েও মাতৃত্বভাবটাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। ছেলেটার মধ্যেও সম্পদের চেয়ে সুরের প্রতি বেশি আকর্ষণ। যেমন—

একদিন, মা
বীণাপাণি,
হেরেন,

সোনার ছেলে
বীণার স্বর শুন্‌ছে তাঁর,
হীরা মাণিক
ফেলে।

কবিতাটাতে দেশাত্মবোধক ভাবনাও কাজ করে যায়—

বাংলাদেশের ফুলবনে যে
কতই বীণা
বাজে
লাখে লাখে ফুটেছে ফুল
সুরের ভাঁজে ভাঁজে!

এই ছেলে বাংলা তথা ভারত মায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। 'সবুজ কিশোর' কবিতায় মায়ের আদর, বোনের ভালোবাসা, ভাইয়ের স্নেহের পরিচয় মেলে—

মায়ের চোকের আদরটি আর বোনের হাসি,
যারেই দেখি তা'রই ভালোবাসার রাশি!
সাথীর সাথে গলাগলি খেলার দেশে,
ভাইয়ের সাথে যুক্তিটি রোজ ঘরে এসে! (*সবুজ লেখা*)

'ভাইবোন' কবিতায় ভাই ও বোনের মিষ্টিমধুর সম্পর্ক বর্তমান। ভাই বোনকে গর্বের সঙ্গে জানায় বোনের পুতুল খেলা তার পছন্দ নয়। বড় হয়ে সে কী করবে বোনকে সে কথা জানায়—

আমরা হ'ব এক একজন খুব
মস্ত মস্ত সব — বড়লোক!
কত, মারবো কাট্‌বো, ধর্‌বো ছিঁচবো, কর্‌বো কত কি!
(*খোকাখুকুর খেলা*)

বোন কিন্তু সেসব কিছু করবে না। তার জগৎ হবে ভালোবাসায় ভরা। সে ভাইকে বলে—

আমরা অত কর্‌বো নাকো
শিষ্ট শান্ত থাকবো দেখো।

আদর স্নেহে বুকটা পুরবো। দুষ্টু হ'ব? ছিঃ! (*খোকাখুকুর খেলা*)

'টুল! টুল!! টুল!!!' কবিতাতেও রয়েছে ভাই-বোনের স্নিগ্ধ সম্পর্ক—

আমরা দুই ভাই বোন গলা—গলি!
টম্—টম্—টমর্!!
আমরা দুই ভাই বোন মার কোলে অমর!

এখানে আবার দেশপ্রেমের আদর্শও উচ্চারিত — 'দেশের মাটি শীতল পাটি,—'। কোথাও আবার বেহুলার সতীত্ব মহিমার আদর্শ প্রচারিত—

তখন আকাশে দেবতার টললো আসন,
"কে আছে এমন সতী তি—ন ভুবন?
এমন সতীর পতির আয়ু নিতে পারে কে?
দ্যাখ্‌লো বেহুলা! তোর পতি জীয়েছে!"

('বেহুলা সতী', *খোকা খুকুর খেলা*)

'ছি! ছি! ছি!' কবিতায় নৈতিক আদর্শের ছবি পাওয়া যায়—

মোদের পথে মোদের গাছে
যা'রা থাকে মোদের কাছে
তাদের মোরা হ'ব বন্ধু থাক্‌বো সাথে সাথ
দেবো না আর কাউকে ব্যথা
শুনবো না আর ছি ছি কথা
পরাণ ভরে' নেব মোরা তাদের আশীর্বাদ। (*খোকাখুকুর খেলা*)

কখনো পাঁচ ভাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাদের কেউ 'ভারি ম–স্ত সওদা–গরী' করবে, কেউ 'রাজ্য-জোড়া দো–কা–ন ঘ–র!' দেবে, কেউ চমৎকার কারখানা করবে, কেউ 'ধানের পাহাড়,/ চা'–লের গোলা!' আর কেউ করবে—

মণি, মাণিক, কড়ি সিকি
মোহর টাকা!

কিন্তু তাদের বোন এসব কিছু করবে না। সে বলে—

আমিও তখন আস্‌বো দাদা, ধীরে ধীরে,

সব্বার বাড়ী, দেখ্‌বো এসে' 'ফিরে' 'ফিরে'!

কা'র চোখে জল এসেছে,

প্রাণ দিয়ে তা' নেবো বেঁটে।

ঘরের মাণিক খোকাখুকু, তা'দের দিব খেতে,

ধূলোর মাণিক কুড়িয়ে তুলবো আঁ–চল পেতে'!

('কে কি হব খেলা', *খোকাখুকুর খেলা*)

'দেশ' কবিতায় আছে দেশের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা—

দেশ দেশ দেশ — ভাই, আমাদের দেশ।

সক্কল দেশের আগে সে কোন্‌ দেশ?

— ভাই, আমার দেশ।।

... ...

এমন্‌ দেশের জল মাটি, এমন্‌ সোনার দেশ,

আমার এমন দেশের ছেলে, স্নেহের না শেষ

— ভাই আমাদের দেশ।।

(*খোকাখুকুর খেলা* ও *সবুজ লেখা*)

'দেশ' গানের ক্ষেত্রে সবই 'আমাদের'। 'আমার' শব্দটা নেই। কবিতাটা পড়তে গেলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কোন্‌ দেশে' কবিতার কথা মনে পড়ে—

কোন দেশেতে তরুলতা

সকল দেশের চাইতে শ্যামল?

কোন্‌ দেশেতে চলতে গেলে—

দল্‌তে হয়রে দূর্বা কোমল?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—

সোনার কমল ফোটে রে?

সে আমাদের বাংলাদেশ,

আমাদেরি বাংলা রে![১] (*বেণু ও বীণা* কাব্যগ্রন্থ)

২. প্রকৃতি চেতনা, গ্রামজীবন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও ইতিবাচক উপাদান সন্ধান।

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় সুস্থ, সহজ, সুন্দর, সুনির্মল গ্রাম্য পরিবেশ, প্রকৃতি সংলগ্নতা, গ্রামজীবনের ছবি চোখে পড়ে। 'সবুজ কিশোর' কবিতায় যেমন—

হাওয়ার দোলা সবুজ মাঠের খোলা বুকে
রোদ আর ছায়ায় ছুটোছুটি তালটি ঠুকে,
গাছের কাঁধে নদীর কোলে ছাদের পিঠে, (*সবুজ লেখা*)

'আমাদের গ্রাম' কবিতার নাম থেকেই বোঝা যায়, এখানে গ্রাম-বাংলার চিরপরিচিত ছবিটা মিলবে।

ছোট্টখাট্টো মোদের গাঁ
নদী–র পাড়ে,
হাজার হাজার গাছ চলেছে
ধা–রে–ধারে। (*খোকাখুকুর খেলা*)

গ্রামটা ছায়ায় ঘেরা, দক্ষিণে সবুজ মাঠ, পূর্বে খাল, দীঘির পাড়ে ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি শুরু হলেই বোসবাড়ির তেঁতুল গাছ থেকে লাখে লাখে বাদুড় উড়ে যায়। তাছাড়া,

বকের বাসা খালের ধারে
বড় গাছটায়,
ও–গায়ের পাখি উড়ে,
আসে এই গাঁয়!

সুপারি গাছের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে বাবুইয়ের বাস।

সেই পথটার পূব দিয়ে
বামুন বাড়ির টোল,
যত পড়ুয়া ''কং'' ''বং''
কেবল করে গোল।

‘তালগেছে পুকুরটির/ উ–তুর পাড়ে’ রায়বাবুদের মস্ত দালান কোঠা, চণ্ডীমণ্ডপওয়ালা বাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপে চামচিকে, নাটমন্দিরে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা থাকে। কাছারি ঘরে থাকেন সরকার মশাই। আগে পাইক সেপাই ছিল, এখন শুধু হরসিং দয়াল আছে। দক্ষিণারঞ্জনের দৃষ্টিতে গ্রামের খুঁটিনাটি কোন বিষয়ই যে উপেক্ষিত নয়, গ্রামের সবিস্তার বর্ণনাই তার প্রমাণ। যেমন—

অতিথ্ খানায় বেশ্, থাকে, নানান্ দেশের লোক,
দুই বেলা খেতে পায় ঠাকুরবাড়ীর ভোগ।।

দীঘির ধারে জেলে, কুমোর, নাপিত, কামারের বাস। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি লক্ষণীয়।—

জোলা তাঁতী অনেক ছিল, এখন তত নাই।
গাঁ–য়ের মোড়ল–বড়–মিয়াজান ভাই।।

রাখাল ছেলের দল গরু চরাতে যায়, চাষী চাষ করে, গয়লা দই নিয়ে হেঁকে যায়। অসুখ করলে রয়েছে কবিরাজ জ্যাঠার পাঁচন বড়ি। সকাল বিকালে গ্রামের কন্যা-বধূরা কলসীতে জল ভরে ফেরে। এছাড়া—

গাঁয়ের মাঝে দুধের বাজার, গাঁয়ের পাশে হাট,
রথ খোলা - দে পথ গিয়েছে ন–দীর ঘাট।
নদীর ঘাটে বুড়া বুড়ী অশ্বত্থ বট
তা’রি কাছে খাড়া আছে চৌধুরানীর মঠ

ওপারে রয়েছে শহর— ইঁট-কাঠ-সিমেন্টের জগৎ আর এপারে রয়েছে শীতল শান্তিপূর্ণ ছোট্ট গ্রাম। ‘বাগান’ কবিতায় পিতা কন্যাকে, প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা বলেন—

গাছ, পাখীরে, ভালবাসি।
তা’দের শোভা তা’দের হাসি
তা’দের ফুল তা’দের ফল
মোদের বাসে ভালো!

‘বেলী’ কবিতায় কবি তাঁর কুটির ও তার পার্শ্বস্থ পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন—

আমার কুটীরখানি হেথা নিরালা,
তল — দিয়ে ব'য়ে যায় আকুল নালা।

চারপাশের সবুজ শোভা, কুররী, কপোত, পানকৌড়ি, শরালী পাখিদের কলকাকলি, মাছরাঙার মাছ ধরা, রাজ হাঁসেদের জলকেলি, চখা, বক, চিলের কলরব দেখা ও শোনা যায়। তাছাড়া—

দূর্ মাঠে গাভী চরে, — ফেন গা'-ভরি
ঢেউয়ে ফুলিয়া কাঁপে যেন সাগর-ই
আমার এ নালা-জলে
কভু আসে দলে - দলে
গাইয়া মধুর গীতি, কাখে গাগরি
গোপ-নাগরিগণ পিয়-পাগরী। *(গ্রাম্যগীতি)*

সর্বোপরি রয়েছে 'বেলী' নামে এক গোপনারীর কথা যে কবির নির্জন কুটিরে এসে রোজ দুধ দিয়ে যায়। গ্রামের মানুষের সহজতা, সম্পর্কের উদারতার পরিচয়ও থেকে যায় কোথাও।

'জুলী' কবিতায় 'জুলী' নামের এক কৃষ্ণবর্ণের মেয়ের রূপ-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই-ই নয়,

সেই সে মোহিনী ধীরে রাখি আমডালা
দয়েল শিশুর শিস্ কহে মধু বালা—
"খেসী যে এসেছে ঘরে, — এই নেন আম,
মা আজ দিয়েছে ব'লে দিলে নিতে দাম।" *(গ্রাম্যগীতি)*

কবি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন সে মেহেরের কন্যা। মুসলিম বলে ঘৃণা না করে কবি তাকে এক কাঠা সোনা মুগ উপহার দেন, আর—

আঁচলে বাধিয়া দিয়া লাড্ডু মুড়ি দুই,
বিদায় দিলাম বলি' আসিতে নিতুই।

'মামার বাড়ী' কবিতায় 'মামার বাড়ি ভারী মজা'র প্রমাণ পাওয়া যায়—

মামার বাড়ীর ক্ষীর সর চাকা চাকা দই,
থালা-ভরা আম-সন্দেশ রূপনগরের খই! ('খোকাখুকুর খেলা')

আবার দুধবরণের গায়ে 'জল মেশে না'। তাই—

গয়লা মেয়ে দুধ যে দেয় জল মিশিয়ে,
দুধবরণ থাকলে হ'বে জব্দ এমন! ('খোকাখুকুর খেলা')

'চিঠি' কবিতায় নবীন নামে এক ডাক-হরকরার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে পথে পথে চিঠি বিলি করে বেড়ায়। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার'-এর যেমন "পিঠেতে টাকার বোঝা,/ তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া"[২]-র ট্র্যাজিক পরিস্থিতি, সেরকম তার জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই যে "সব বাড়ী দেখি তারে, বাড়ীতেই দেখিনি!"

৩. পুরাণ প্রসঙ্গ ও আদর্শ সন্ধান এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার আড়াল-আকাঙ্ক্ষা।

'সর্বদমন' কবিতায় আছে দুষ্মন্ত রাজা ও তাঁর রানী শকুন্তলার সর্বশক্তিমান পুত্র ভরত বা সর্বদমনের কথা—

শকুন্তলা ছিলেন রাণী, সোনার ছেলে কোলে।
সেই রাণীরে বনে রাজা দিলেন মনের ভুলে।।
শকুন্তলা রাণীর ছেলে বলে হ'ল বড়,
তার ভয়ে বনের পশু ভয়ে জড়সড়। ('খোকাখুকুর খেলা')

তেজ ও বিক্রমের জন্য শকুন্তলা-পুত্রের নামকরণ করা হয় সর্বদমন। তার 'ভরত' নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ—

ভারত নামে সেই ছেলে রাজা হ'ল শেষ।
তা'রি নামে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ।।

'মজার গল্প' কবিতা থেকে শিশু হনুমানের সূর্যকে রসগোল্লা এবং ঐরাবতে উপবিষ্ট ইন্দ্রকে আঙুর-সন্দেশ মনে করে ঐরাবতসহ গিলতে যাওয়ার কাহিনি জানা যায়। সূর্য ভয়ে কাঁপেন; আর ভয় পেয়ে—

বজ্র ছুঁড়ে' ফেলে' ইন্দ্র লম্বা দিলেন ছুট্!!
রাহু ছিল পিছনটাতে, —এক্কেবারে হা!!!!
ধুপুস্ করে' সমুদ্রেতে ছেড়ে' দিল গা। ('খোকাখুকুর খেলা')

অথচ ইন্দ্রের অমন মহাশক্তিধর বজ্রের প্রভাবে ছোট্ট হনুমানের মাথাটা একটু ঝিম্ ধরে থাকে। এরপর এই ছোট্ট হনুমানকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হতে থাকে—

তা'র পর দিন—ও বাবা! কে দেখে তা'র দাপ!
দেব্‌তা মানব সবাই চম্‌কে — "বাপরে বাপ্!
এতটুকু এমন হনু জন্মেই এমনটি!
বড় হ'লে না জানি সে করবে যেন কি!!

'কন্যকা কুন্তী' কবিতায় রাজকন্যা কুন্তীর দেখা মেলে যিনি মূলত রাজা শূরসেনের কন্যা। কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজা তাঁর লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত কন্যাকে বন্ধু ভোজরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। কুন্তী ভোজের রন্ধনশালায় রাজকন্যা কুন্তী রন্ধনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সহস্র ব্যঞ্জন বিতরণ করেন নিজের হাতে—

হের হের ভোজপুরে মিলে গেছে আজি মরি! দেবতা দানব!
দ্বিজ অদ্বিজ দীন এক সাথে সুধা খায় দ্বন্দ্বহীন করি' কলরব!
বর্ণের বিচার নাহি, অবিরাম অন্ন বহি' লক্ষ স্বর্ণথালি—
অক্লান্ত মোহিনী আজি মাতৃরূপে সুধাভাণ্ড বিশ্বে দেন ঢালি। ('কন্যকা কুন্তী')

তবে সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সুধাভাণ্ডের অধিকারী ছিল শুধুমাত্র সুরেরা। আধুনিক ব্যাখ্যায় যদি সুর-কে উচ্চবর্ণ ধরা যায়, তাহলে অসুর অর্থাৎ নিম্নবর্ণ সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু প্রগতিশীল কবির চোখে উচ্চ-নীচ সকলেই সমান। তাই পুরাণ বা মহাকাব্য আশ্রয় করলেও তাঁর নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা রয়েই যায়।

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ফিরে লেখা এবং পুরাণ...।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন মঙ্গলকাব্য ও পুরাণ উভয়কেই আশ্রয় করেছেন। কোথাও আবার মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও পুরাণ একাকার হয়ে গেছে। মহাভারতের চরিত্রের মধ্যে কুন্তী তাঁর কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। 'কন্যকা কুন্তী' কবিতার মতই 'অন্নপূর্ণা মা' কবিতাতেও ভোজরাজের পালিতা কন্যা কুন্তীর অন্ন বিতরণকে কেন্দ্র করে তাঁর গুণকীর্তন করা হয়েছে। যেমন—

হেসে’ - খেলে’ আসেন কন্যা, মুখে ফোটে চাঁদ,

আপন হাতের রাঁধা অন্ন বিলিয়ে-বেড়ে’ যান।

সেই অন্ন খেতে খেতে সকল লোকে ভাবে,—

ভাত খাবে, কি, চাঁদের মধু কুড়িয়ে নিয়ে খা’বে। (‘খোকাখুকুর খেলা’)

এই কুন্তীর আরও এক পরিচয় আছে। তিনি হলেন পঞ্চপাণ্ডব জননী—

এমন লক্ষ্মী কন্যা যিনি মায়ের অবতার,

ভীম অর্জুন যুধিষ্ঠির ছেলে তাই তাঁর।

নকু—ল সহদেব ছিল সতীনের ছেলে,

সৎ মায়ের বুকে তাঁরা হারানো মা পেলে!

‘কালকেতু’ কবিতায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের মহাধনুর্ধর বীর কালকেতুকে পাওয়া যায়, যাকে—

জুজুর মতো কর্‌তো ভয় সারা পাড়ার ছেলে—

একটু যদি কালকেতুর সাড়া কেউ পেলে!

তেল-কুচ্‌কুচ্‌ কালো গা আটে, পিটে দড়

সব্বার ’পর জয়ী ছিল সব্বার ’পর বড়! (‘খোকাখুকুর খেলা’)

দেবী চণ্ডী কালকেতুর মাধ্যমে মর্তে নিজের পূজা মাহাত্ম্য প্রচার করেন ও বিনিময়ে কালকেতুকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন।

ধন-রত্ন অনেক পেয়ে, পেয়ে দেবতার বর

হ’ল সেই কালকেতু রাজ্যেশ্বর!!

‘বেহুলা সতী’ কবিতায় আছে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের চাঁদ সদাগর এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলার কথা, বাসরঘরে সর্পদংশনে মৃত পতি লক্ষ্মীন্দরকে বেহুলার পুনর্জীবিত করার চিরাচরিত কাহিনি।

যত দেশের লোক বলেন, — ‘‘ধন্য মেয়ে!

বাসর ঘরের মরা পতি জীয়িয়ে এনেছে!!’’ (‘খোকাখুকুর খেলা’)

‘কন্যকা কুন্তী’ কবিতার শূরসেনের কন্যা পৃথা বা ভোজরাজের পালিতা কন্যা কুন্তীর অন্নবিতরণের কাহিনি পাওয়া যায়—

" জয় অন্নপূর্ণা জয় ! জয় !" — উঠে ধ্বনি ভোজরাজ পুর,

পবনে অমৃত মাখা সেই ধ্বনি গেল ছুটি' হস্তিনা সুদূর।

আবার 'অন্নপূর্ণা মা' কবিতায়ও এই অন্নদার কথা আছে। দুটো কবিতাতেই কুন্তীর অন্নপূর্ণার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের, সর্বোপরি পুরাণের শিব-জায়া অন্নপূর্ণার কাহিনির সঙ্গে খানিকটা একাত্মতা লাভ করে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ডে 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' অংশে দেবী অন্নদা 'দেবঋষি আদিগণ'কে বলেছেন—

এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।

শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও।।

এতবলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।

অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন।।[৩]

দক্ষিণারঞ্জনের 'কন্যকা কুন্তী' কবিতায় ভোজপুরবাসীকে ভোজরাজকন্যা অন্নদান করেন—

হের হের ভোজপুরে মিলে গেছে আজি মরি! দেবতা দানব!

দ্বিজ অদ্বিজ দীন এক সাথে সুধা খায় দ্বন্দ্বহীন করি' কলরব!

বর্ণের বিচার নাহি, অবিরাম অন্ন বহি' লক্ষ স্বর্ণথালি—

অক্লান্ত মোহিনী আজি মাতৃরূপে সুধাভাণ্ড বিশ্বে দেন ঢালি।

৫. শিশুমনের উপযোগী কল্পজগৎ নির্মাণ।

এই কল্পজগৎ রচনায় দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে এক নির্মল সৌন্দর্য ও উদারতা সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ করা যায়, প্রকৃতি চেতনা তো আছেই।

'খোকার দেশ' কবিতায় কবি খেয়ালি কল্পনার জগৎ গড়ে তুলেছেন যেখানে ফুলবোনেরা সব তারা-দাদাদের বই কেড়ে নেয়, যেখানে চাঁদের আঙিনায় অমৃতফল চুরি করার জন্য অন্ধকার তার আঁচল পেতে দেয়। আর—

মেঘের বুকে দত্যিরা সব বিজ্‌লীমালা পরে'

ধিংতা নাচন নেচে পালায় স্বপ্ন পাহাড় ভরে'! *(সবুজ লেখা)*

খোকার দেশে রূপালি গানের সুর ভেসে ওঠে, ময়ূরপঙ্খীর পালে রূপনদীর হাওয়া লাগে। এছাড়া—

ঝিনুকগুলি নদীর জলে জোচ্ছনাতে ভেজে,

ভোরের বেলায় উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি সেজে!

খোকার দেশে এসে এসে

পরীর শিশুগুলি

পড়ার বনে দেয় বুলিয়ে রামধনুকের তুলি

এ এক অনুপম সৌন্দর্যের জগৎ, বলাবাহুল্য উদার ও সুকোমলও। খোকার দেশের রসিক দাদামশাইয়ের রসালো হাসি, তাঁর কথকতা, রাখাল ছেলের মন উদাস করা বাঁশির সুর শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়।

'অচীন পথে' কবিতাও শিশুমনের অনুকূল। এতে রয়েছে শিশু, কিশোর ও তরুণদের কথা। তারা অচেনা দেশে অচেনা পথের মধ্যে দিয়ে, অচেনা রথে চড়ে চলেছে। বিশ্ব শিশুরা সেখানে চলেছে—

যথায় হেসে ঢেউ দিয়েছে

সোনালী পর্বতে

রূপ-সাগরের জল! (*সবুজ লেখা*)

বিশ্ব কিশোরের দল সেখানে চলেছে যেখানে—

চাঁদ সূর্য হঠাৎ সাথী

পথের মধ্য হতে

হাসিতে চঞ্চল!

আর বিশ্ব-তরুণ দল চলেছে সেখানে, যেখানে—

কল্পপরীর পাখায় মাখা

আবিরে কুঙ্কুমে

গল্পে বলা লাল পথেরা

কোথায় জ্বলো...জ্বল্।

বিশ্বের শিশু, কিশোর ও তরুণেরা অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। তার অর্থই হল সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে, বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে, ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে জীবনের গতি সঞ্চয়। তাদের মধ্যে হৃদয়ের দুকূল ভাসিয়ে দেওয়া, উদার মনের পাল তুলে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

'সবুজ লেখা' গ্রন্থের 'পরবি', 'রামধনু' ও 'শেষের সুর' কবিতাগুলো নাট্যগুণ সম্পন্ন হওয়ায় এগুলোকে নাটিকাও বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও শিশু মনোরঞ্জনের দিকটা উপেক্ষিত নয়, বরং যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। 'পরবি' কবিতায় আছে শিশু, শৈশব; বালক, বালিকা, বাল্য; কিশোর, কিশোরী, কৈশোর—নানা ধরনের চরিত্রের ভিড় যেখানে শিশু শৈশবের কাছে প্রশ্ন রাখে সে কোথা থেকে আসছে? সেই কি সন্ধে থেকে ডাক দিয়ে যায়, সেই কি 'ঘুমের শেষে রাত পোহানোর ছবি?/ ফুলের দেশের আলোর রাশি।' শৈশব উত্তরে জানায় সে হল 'সকল স্বপন, ভাঙা, রাঙা দিনেরি পরবি!' আবার বালক-বালিকার প্রশ্ন বাল্যকালের কাছে সেই কি ছয় 'ঋতুতে' বছরটাকে সাজিয়ে দেয়? বছরগুলোকে 'হাসির স্রোতে' ভাসিয়ে দেয়? বাল্য উত্তরে জানায়, সে হল— 'বুকের বাঁশীর, বাজিয়ে দিয়ে, আলোরি পরবি।'

কিশোরের প্রশ্ন কৈশোরের কাছে সেই কি 'আলোর পাড়ে' বিশ্বনিখিলকে 'সবুজে', 'নীলে' রঙে রঙে 'একাকার' করে দেয়? কৈশোর বলে সে— 'রঙ্ সাগরে গহন পাড়ি—মনেরি পরবি!'

কিশোর কিশোরী কৈশোরের কাছে জানতে চায় কোথায়, কোন্ দেশে সদাই অফুরন্ত 'মহোৎসব' চলে? কৈশোর বলে জগতে সে অমল আনন্দপূর্ণ পরবি হয়ে আসে। সে 'পরবি' অর্থাৎ পরব বা উৎসবের নির্মল ঝলমলে আনন্দের বাতাবরণ তৈরি করে।

'রামধনু' কবিতায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনে, কমলা, ধূসর—এই সাতটা রং ছাড়াও কালো ও সাদা রং ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে উপস্থিত। কালো রং 'গহন সাগর পারে... রাতের অন্ধকারে' লুকিয়ে থাকে। লাল রং সব ব্যথা-বেদনা মুছে, উদয়গিরির শিখর দিয়ে আমাদের ঘুমের শেষে এসে উঁকি দেয়। নীল 'নিশান হাতে' উদাস মনে 'মালার লহর ছিঁড়ে, খুলে খুলে ছড়িয়ে দেয়।' পাছে আমরা পাঠক-পাঠিকারা রাগ করি, তাই হলুদ রং নদীর তীরে নীরবে

ঘুমিয়ে থাকে। সবুজ রং যেন কমবয়সী, স্বাস্থ্যবান, উচ্ছল বালক। বেগুনে রং হেসে হেসে 'মুকুল বনের দেশে' রঙের হাওয়া ছোটায়। কমলা আশ্বাস ও নির্দেশ দেয়—

পথ কেটে সাফ্ কর্ছে যে চার ধার-ই
পূব, উত্তরে, দখিণ পচিম,
চলো বীরের সারি!

কারও মলিন মুখ দেখলে ধূসর বর্ণ কষ্ট পায়, সে 'আলো তুলে' ধরে' অনেক দূরের পথ দেখায়। সাদা রং জানায় তার চলে যাবার 'সময় হ'ল', এরপর 'খুব আস্তে আস্তে নানা রঙের মেঘের যবনিকা পড়ে'।

'শেষের সুর' কবিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ — এই ছয় দলের প্রত্যেকের বয়স আলাদা। প্রথম দলের আগমনে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বয়সে একটু বড় দ্বিতীয় দল বলে— তারাই 'অফুরণ' ও 'নতুন'-এর 'সর্দার'। তাদের চেয়ে বয়সে বড় তৃতীয় দল চির আনন্দময় অসীমের রাজ্য গড়ে তোলে। তিন দলের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ চতুর্থ দল হল 'তচ্‌নচে তন্ময় কচি কাঁচা বীরদল'। তার চেয়ে সামান্য কম বয়সের পঞ্চম দল—''সব চেয়ে ছোট বলে' সব চেয়ে হাসিমুখ!" সব দলের মধ্যে বয়সে বড় ষষ্ঠ দল উজ্জ্বল, অমৃতের পুত্রদের ডাক দেয়।

আপাতভাবে কবিতাগুলোকে শিশুসুলভ মনে হলেও আসলে সুগভীর অর্থবাহী, সেই সঙ্গে অন্তর্নিহিত রয়েছে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও উদার দৃষ্টি। 'পরবি' কবিতার শৈশব, বাল্য ও কৈশোর — এই তিন বয়সকালের মধ্যে কৈশোরই সবচেয়ে পরিণত। কারণ এই সময় থেকে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচারক্ষমতা ধীরে ধীরে অনেক স্বচ্ছ হতে থাকে। ফলে কৈশোর নির্মল আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। 'রামধনু' কবিতায় রামধনুর সাত রং এবং সাদা ও কালো রঙের চরিত্র হিসাবে সপ্রতিভ উপস্থিতি শিশুদের মনে কাল্পনিক জগৎ রচনা করলেও প্রতিটা রঙের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে কবিতার প্রতি পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের কবি মন, শিল্পী সত্তা, সৌন্দর্য চেতনা। প্রতিটা বর্ণ যদি এক-একটা চরিত্র হয়, তাহলে প্রত্যেক চরিত্রেরই রয়েছে একধরনের সংবেদনশীল মন, সংকীর্ণতামুক্ত ঔদার্য। 'শেষের সুর' কবিতায়ও বিভিন্ন বয়সের স্বভাবধর্ম দেখা যায়। কোন বয়স উচ্ছল, কোন বয়স

নবীন, কোন বয়স হাস্যোজ্জ্বল, কেউ আনন্দে পরিপূর্ণ, কোন বয়স আবার অমৃতের সন্তানদের আহ্বায়ক। তিনটে কবিতার মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রয়েছে। প্রত্যেক চরিত্রই নিজের নিজের স্বভাব-চাপল্য, গুরুত্ব, উদারতা, মহত্ব নিয়ে উজ্জ্বল। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে প্রত্যেকের সৌন্দর্য সচেতনতা।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় কবিতার গঠন।

কবিতার গঠন।

এই গঠন বা সংরূপগত আলোচনার কয়েকটা দিক রয়েছে। প্রথমে রয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ, তাদের ব্যঞ্জনা, উৎস, ধ্বনি-অভিঘাত।

১. শব্দ

শব্দ ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জনের নিজস্বতা লক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ হল 'অফুর্'। এছাড়া তিনি অন্ত্যমিলের জন্য বেশ কিছু শব্দ নিজের মত করে ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'থালা'র সঙ্গে মিলিয়ে করেছেন 'আলা', 'ঝরা'। 'দোল' শব্দের সঙ্গে মেলানোর জন্য 'বিভোর' না করে করেছেন 'বিভোল' করেছেন। এমনই তাঁর নিজের মতো করে ব্যবহৃত শব্দ— টে, টানায়, তয়ের, দেই, দাদামশা, পান্‌তো, ম'রপঙ্খী, রূপলী ইত্যাদি। তাঁর শব্দ ব্যবহারে স্বরলোপ, ব্যঞ্জনলোপ বা অঘোষীভবন বেশি করে চোখে পড়ে। যেমন—

অতিথ < অতিথি (স্বরলোপ)

অশথ < অশত্থ (ব্যঞ্জনলোপ)

আস্‌চি < আসছি (অঘোষীভবন)

আঁড় < আড়ালে

কাচারী < কাছারী (অঘোষীভবন)

খেলচ < খেলছ (ঐ)

চোক < চোখ

জ্যোছনা < জ্যোৎস্না

নিতুই < নিত্য (ব্যঞ্জনালোপ ও স্বরাগম)

পচিম < পশ্চিম (ব্যঞ্জনলোপ)

পহর <প্রহর (র-লোপ)

পান্‌তো < পান্‌তুয়া

পিদিম < প্রদীপ

বোশেখ < বৈশাখ

মুক < মুখ (অঘোষীভবন)

যতন < যত্ন (স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ)

র'ল < রইল

সাঁজ < সাঁঝ (অঘোষীভবন)

সোঁত < স্রোত (নাসিক্যভবন)

দখিণ < দক্ষিণ

নেগেছে < লেগেছে (বিষমীভবন)

আবার সাধুভাষাকে কবিতার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। যেমন—

জুটি’ < জুটিয়া   নেহারি < নিহারন   ফুটি’ < ফুটিয়া ভরি < ভরিয়া   হ’তে < হইতে ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতার বিশেষত্ব একেবারেই তাঁর নিজস্ব শব্দ প্রয়োগ। যেমন—

অথির (অস্থির)	উদল (খোলা)	টুপটুপিয়ে (টুপটুপ করে)	নিতল (তলহীন)
অফুরণ (অফুরন্ত)	কাকাতু’ (কাকাতুয়া)	তচ্‌নচে (চন্‌মনে)	নিবো (নেব)
অযুত (যুক্ত নয়)	গুছা’য়ে (গুছিয়ে)	তাখেকে (তার থেকে)	বিভল (বিভোর)
উছল (উচ্ছল)	গুলোদে (গুলো দিয়ে)	থাল (থালা)	
উতুর (উত্তর)	ঘুমালী (ঘুমের)	ধীরি (ধীরে)	
উতল (উতলা)	টে’ (টিয়া)	নিগুম (নিশ্চুপ)	

বিদেশি শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন—ফাগ (আরবি), Box (ই,), ম্যাজিস্টর < ম্যাজিস্ট্রেট (ই,), মাস্টার (ই,), মিয়াজান (আরবি), seal (ই,), ইত্যাদি।

শব্দ প্রয়োগে পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবও লক্ষণীয়। যেমন—

এঞ্জিন < ইঞ্জিন	কিনা < কিনে	চা’বি < চাইবি
এ্যারোপ্লেন < এরোপ্লেন	চামচিকা < চামচিকে	দিব < দেব

শব্দের উৎস

দক্ষিণারঞ্জন দেশি, বিদেশি, তৎসম—সব ধরনের শব্দই ব্যবহার করেছেন। যেমন—

অবনী—তৎসম	চাঁদ—তদ্ভব	ফাগ—বিদেশি (আরবি)	সাঁজ—তদ্ভব
আকাশ—তৎসম	চারা—দেশি	Box—বিদেশি (ই,)	সমীরণ—তৎসম
কব্‌রেজ—অর্ধতৎসম	ছুটি—দেশি	বাগান—বিদেশি (ফারসি)	সূয্যি—অর্ধতৎসম
খোকাখুকু—দেশি	তেঁতুল—দেশি	Seal—বিদেশি (ই,)	লিচু—বিদেশি (চিনা)

ব্যঞ্জনা

"যে বৃত্তির বলে শব্দ নূতন অর্থের দ্যোতনা করে, সেই বৃত্তির নাম ব্যঞ্জনা।" (৪)

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতাতেও শব্দ 'নূতন অর্থে' দ্যোতিত হয়েছে। যেমন—

ঝরা পাতায় নিঃশ্বাসের চিঠিখানি রেখে,
শেষ কথাটি চোকের পাতার তুলির রঙে এঁকে,
... ...
লাল মেঘেরা ছড়িয়ে গেল বিদায় পথের গান,
আঁধারেরা বাজায় দূরে বাদল-শিঙা খান ('বিদায়', সবুজ লেখা)

'নিঃশ্বাসের চিঠি', 'চোকের পাতার তুলির রঙে' আঁকা বা 'আঁধারের বাদল-শিঙা' বাজানো—এসবই শব্দের বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে গেছে, প্রতিটা শব্দগুচ্ছ বিদায় নেওয়ার অনুষঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

অথবা,

ছড়িয়ে দিয়ে হাসির সাগর
—জীবন নদীর পাতে পাতে
কোথাও পাঁজর পিঁজে দেওয়ার ঘায়ের সুরের দীপটি জ্বলে ('ভাদ্র', ভাদ্র)

কবিতাগুলোতে কবির ভাবনার গভীরতা প্রকাশিত। 'হাসির সাগর', 'জীবন নদী', 'পাঁজর পিঁজে দেওয়া' এসব শব্দ তো গভীরতর তাৎপর্যে অভিব্যক্ত। একদিকে শব্দের অভিধা, লক্ষণাকে উপচে দিয়ে শরতের আগমনী চিত্র। অন্যদিকে জীবনের রোদ-বৃষ্টি-ঝড়কে উপেক্ষা করে, বৃষ্টিভেজা দিনের স্মৃতিকে মলিন করে 'অমল ধবল পালে' হৃদয়কে বেয়ে নিয়ে যাওয়ার আবাহন। এই ব্যঞ্জনার প্রয়োগ অসামান্য ও অনবদ্য।

ধ্বনি-অভিঘাত

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতার অভিনবত্ব তাঁর শব্দ ব্যবহার ও তার অভিঘাতে। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেইমত শব্দগুলো নিজের মত করে ব্যবহার করেছেন। ফলে শব্দের প্রভাব বা ধ্বনি-অভিঘাত অসাধারণ হয়েছে। যেমন—

মাথা জোড়া পাগড়ি, পায়ে আঁটা নাগ্‌রা,
খটাখট্ চলে আসে — এঞ্জিন নির্ধূম!

কাঁধে ঝোলা ব্যাগ যেন সাগরের কাঁকড়া!

চলে যায় চটাপট্, দুপ্‌দাপ্, দ্রুমদুম্! ('চিঠি', সবুজ লেখা)

বর্ণনা পড়ে ডাক-হরকরার রূপ চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

মামার বাড়ীর ক্ষীরসর চাকা চাকা দই,

থালা-ভরা আম-সন্দেশ রূপনগরের খই!

রূপনগরের খৈ রে সোনা! দুধের ফেণা,

আম-কাঁঠাল খেয়ে ফেল্‌লাম চার ডালা! ('মামার বাড়ী', খোকাখুকুর খেলা)

অসাধারণ ধ্বনি-মাধুর্য! এ যেন সেই ছোটবেলায় পড়া 'মামার বাড়ী ভারি মজা/ কিল চড় নাই'-এর সেই চিরকালীন মজা-আদরে ভরা সুখের রাজ্যের কথা মনে পড়ে যায়। এখানেই দক্ষিণারঞ্জনের শব্দ ব্যবহারের জাদু।

২. **বাক্য**

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় ব্যবহৃত বাক্যের আলোচনার তিনটে দিক রয়েছে— প্রবাদ, প্রবচন বা বাগ্‌ধারা, যতি/ছেদ, আবেগ সঞ্চারের চেষ্টা।

প্রথম আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত প্রবাদ, প্রবচন বা বাগ্‌ধারা।

বাগ্‌ধারা

অমৃতের পুত্র	পক্ষিরাজ	শ্মশানের ধূলি
আকাশের চাঁদ	পোষা'টে'	সাগরের কাঁকড়া
গঙ্গা-জল	মামার বাড়ী	সোনার কাঠি
দুধে-ভাতে	মায়ার সাগর	স্বরগের সিঁড়ি

প্রবাদ সোনার থালে সোনায় ছাঁকা ঘি

বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ সবই দেশি। বাগ্‌ধারা বা প্রবাদের প্রয়োগ খুব বেশি চোখে পড়ে না।

যতি/ছেদ— দক্ষিণারঞ্জন তাঁর কবিতায় খুব সচেতনভাবেই যতিচিহ্নের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

স্বপ্নে মোদের মনটি আজো মাখা!

খুঁজি কি যে কোথায় আছে ঢাকা!

সব শেষে যে সবার ছোটো ভাই,

সবার খেলা মোদের সাথে তাই!

যার যা হবার সাধ, বলে তা, মোদের কাছে সেই!

তাই হতেছে সবখানে কাজ, মোদের কথাতেই। ('আম্‌রা', সবুজ লেখা)

হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে বিস্ময়চিহ্ন, বাক্যের ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে স্বল্পবিরতির জন্য কমা বা পাদচ্ছেদ, বাক্যের শেষে পূর্ণবিরতি এবং ভাবের পূর্ণতা আনার জন্য দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার করেছেন।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ও খোকন্! ও খোকন্!—কেঁদো নি!

খোকন বুঝি মামার বাড়ী দেখিস্ নি?

মামার বাড়ী দেখ্‌বে খোকন, মামার বাড়ী যা'বে,

চোখের জল মুছে খোকন, ক্ষীর সব খা'বে!

ওই খোকন ও—ই দ্যাখ্—

মামার বাড়ীর তা—ল গাছ!! ('মামার বাড়ী', *খোকাখুকুর খেলা*)

এখানে আবার সম্বোধন করা ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্নের ব্যবহার তো হয়েছেই। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ড্যাশচিহ্নের ব্যবহার। সাধারণত বক্তব্যের প্রবহমানতা রক্ষা বা ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে ড্যাশচিহ্নের ব্যবহার হয়। কিন্তু কবি এখানে ড্যাশচিহ্নের প্রয়োগ এমনভাবে করেছেন যাতে মামার বাড়ির তালগাছের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শিশু মনস্তত্ত্বের দিকটা তাঁর কাছে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি যতি/ছেদ চিহ্নের ব্যবহার পূর্ণ ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।

প্রথম উদাহরণে পূর্ণ যতির ব্যবহার হয়েছে বেশি, পরের উদাহরণে অর্ধ যতি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে দুটো উদাহরণেই দেখা যায় ভাব ও ধ্বনির প্রবাহ পূর্ণ যতির বাধা মেনেছে অর্থাৎ পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি স্থাপন আবশ্যিক বলে মানা হয়েছে।

আবেগ সঞ্চারের চেষ্টা

বাক্যে আবেগ সঞ্চারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে যতি/ছেদ, পূর্ণ যতি, অর্ধ যতি। কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় সচেতন শিল্পীর মতই এই যতি/ছেদ চিহ্নের প্রয়োগ করেছেন, যার মাধ্যমে কবি-মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

ছি ছি ছি! ওকি! ওকি!
ও মনো! কর্‌ছিস্ কি!
ওদেরে ভাই কখ্‌খনো
অমন করতে নাই (‘ছি! ছি! ছি!’, খোকাখুকুর খেলা)

এখানে কবির মানবিক রূপ প্রকাশিত। কবি দক্ষিণারঞ্জনের রচিত বিভিন্ন কবিতায় কখনো ভাই-বোনের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক, ভবিষ্যতের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, গ্রামের পরিবেশের নিষ্কলুষতা, কৈশোর কালের উন্মাদনা, কখনো জীবন-পথ পরিক্রমার শেষে নিরাসক্তি — ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব ও আবেগ সঞ্চারের মনোভাব ফুটে উঠেছে। নারীর সম্পর্কেও বিশেষ আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। কবিগুরুর ‘পসারিনী’ সম্পর্কে অনুভূতি—

কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা—
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।।[৫] (বিচিত্রিতা)

এই ধরনের ব্যাপ্তি না থাকলেও দক্ষিণারঞ্জনের ‘জুলী’ কবিতায় বিকিকিনির ঊর্দ্ধে কবির হৃদয়াবেগ ধরা পড়েছে—

মাথাটি করিয়া নীচু বালা দিল সায়,
আমার পরাণ আরো বাঁধিল মায়ায়!
... ...
জুলীর নয়ন সম নভে জাগে তারা
তারে চাহি’ বসি’ আছি আপনায় হারা।—

৩. স্তবক নির্মাণ

স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যে ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধরন এনেছেন। যেমন—

আবার মোরে পাগল ক'রে ক

দিবে কে! খ

হৃদয় যেন পাষাণ হেন গ

বিরাগ-ভরা বিবেকে। ঘ [৬] ('শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা')

এই স্তবক নির্মাণের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের কবিতার সাদৃশ্য আছে। যেমন—

ছোট্টটি থেকে বাবার সাথে ক

হাতে হাতে ধরি খ

বাগানে মোদের কত শেখেছি গ

কত না যতন করি! ('বাগান', খোকাখুকুর খেলা)

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছেন, গভীর ভাবনা-চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'রূপগাথা' কবিতাটা শুরু হয়েছে এভাবে—

লক্ষ্মী মায়ের সোনার ঘরে

হীরা মণির মাঝে,

খেল্‌ছিল সে সোনার শিশু

সকাল দুপুর সাঁজে।

পরে আবার স্তবক নির্মাণ হয়েছে এভাবে—

বীণাপানির ঘরখানি

ওই

মোদের সোনার দেশে,

তারি পাশে, হাস্‌ছিল,

ঠিক

পদ্মফুলের বেশে!

এরপর প্রথম স্তবকের মত।

তারপর স্তবক রচিত হয়েছে এভাবে—

একদিন, মা
বীণাপাণি,
হেরেন,
সোনার ছেলে
বীণার স্বর শুন্‌ছে তাঁর,
হীরা মানিক
ফেলে।

একটাই কবিতার মধ্যে স্তবকনির্মাণের নানা ধরন দেখা যায়। যেমন—

করে আকুল
ফুলের বনের
গন্ধ ভাসি' আসি;
যশ ছোটে সেই গন্ধ নিয়ে
ফেলে' মানিক রাশি।
মা লক্ষ্মী ভাবেন মনে — তাই ত এ কি হল?
মণি মাণিক মুক্তাহীরা
সবি পড়ে' র'ল!

তারপরে নির্মিত হয়েছে—

সকল জগৎ ভাবলে
'—এ কি!—'
ভাব্‌লে সবে
—মনে,
কোথায় এমন
ফুট্‌ল
ফুল
এ
কোন্ সে ফুলের
বনে?

সৌরভ তার
এতই,
ওরে,
এমন
পাগল করা— ('বাংলার সোনার ছেলে')

অভিনব এই স্তবক নির্মাণ।

'খোকার দেশ' কবিতার স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায়—

'খোকার দেশে কেবল হেসে ক
চাঁদটি উঠে আগে খ
সূর্য্যি মামার রাজধানীতে বেজায় চমক লাগে! খ
তারা দাদার বই কেড়ে নেয় ফুলবোনেরা জুটি;' গ
দীপের আলোয় হেসে উঠে মায়ের আঁখি দু'টি; গ
খোকার দেশে হেসে হেসে ক
আঁধার আঁচল পাতে ঘ ('সবুজ লেখা')

'জন্মদিন' কবিতায় দেখা যায়—

পাঁচের বছরে পা-টি দিলে ভাই, ক
ইচ্ছে করে যে, বড় হয়ে যাই, ক
দশটি বছর! খ
বই হয়ে যাক্ পড়া গাদা গাদা, গ
ভাই-বোনেদের আমি বড় দাদা! গ
আমি রাখি ঠিক কে ভালো, কে গাধা গ
বেজায় নজর! খ ('সবুজ লেখা')

'আমরা' কবিতায় দেখা যায়—

পাহাড়চূড়া ঠেক্‌ছে কোথায় মেঘে! ক
বিশাল নদী ছুট্‌ছে বিষম বেগে! ক
অরণ্য, বন, মাঠ ছাড়ায়ে মাঠ! খ
দুল্‌ছে সাগর অসীম ও বিরাট! খ
আমরা এদের সবার ছোট, তবু মজা এই, গ
সবখানেতে হচ্ছে যে কাজ, মোদের কথাতেই! গ ('সবুজ লেখা')

কবি দক্ষিণারঞ্জন যে স্তবক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতার বিভিন্ন ধরনের স্তবক নির্মাণ থেকে তা বোঝা যায়।

অচিন দেশে যাচ্ছি মোরা ক
যাচ্ছি অচিন পথে খ
বিশ্ব-শিশুর দল, গ
যথায় হেসে ঢেউ দিয়েছে ঘ
সোনালী পর্বতে ঘ
রূপ-সাগরের জল! গ ('অচীন পথে', সবুজ লেখা)

'চিঠি' কবিতা রচিত হয়েছে এভাবে—

মাথা জোড়া পাগড়ি, পায়ে আঁটা নাগ্‌রা, ক
খটাখট্ চলে আসে—এঞ্জিন নির্ধূম! ঘ
কাঁধে ঝোলা ব্যাগ যেন সাগরের কাঁকড়া! ক
চলে যায় চটাপট্, দুপ্‌দাপ্, দ্রুম্‌দুম্! ঘ ('সবুজ লেখা')

দেশ দেশ দেশ—ভাই, আমাদের দেশ! ক
সক্কল দেশের আগে সে কোন্ দেশ? ক
—ভাই, আমাদের দেশ।। ক
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর, ঘ
পূবে পশ্চিমে, ভাই, পাহাড় মনোহর, ঘ
('দেশ', 'খোকাখুকুর খেলা' এবং 'সবুজ লেখা')

ওই ক
যে খ
রূপোর বাঁশীর গ
বাজ্‌ল বিদায়-সুর গ
''আমি এখন এবার আসি''র গ
সজল ব্যথাতুর! গ
ঝরা পাতায় নিঃশ্বাসের চিঠিখানি রেখে, ঘ
শেষ কথাটি চোকের পাতার তুলির রঙে এঁকে ঘ ('বিদায়', সবুজ লেখা)

সুতরাং লক্ষ করা যায়, দক্ষিণারঞ্জন তাঁর কবিতার স্তবক নির্মাণ যেমন তেমন ভাবে করেননি, গতানুগতিক ধাঁচেও ঢালেন নি। প্রতিনিয়ত নতুনত্ব আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আর বলাই বাহুল্য এ ব্যাপারে তিনি সফল।

৪. **ধরন**

কবিতা নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— ওড জাতীয়/ গাথা, এককোক্তিমূলক, কথোপকথনধর্মী, বর্ণনাধর্মী/ গল্পধর্মী, আবেগাত্মক/ গীতিধর্মী।

- এককোক্তিমূলক কবিতা হল ‘বেলী’, যেমন—

আমার কুটীরখানি হেথা নিরালা,
তল দিয়ে ব’য়ে যায় আকুল নালা।
... ...
পলে-পলে নে’চে যায় নয় ’পরে,—
আমার পরাণ হাসে নিরালা ঘরে।
... ...
সে বুলায় মাথে হাত, খায় মধু চুম্,
পীয়ে দুধ নিরালায় আমি দেই ঘুম।

পুরো কবিতাটা উত্তম পুরুষ ও এককোক্তি সহকারে রচিত। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কথোপকথন এখানে অনুপস্থিত।

- কথোপকথনধর্মী কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই কথোপকথন থাকে। দক্ষিণারঞ্জন বেশ কয়েকটা কথোপকথনধর্মী কবিতা লিখেছেন। যেমন— ‘পরবি’, ‘ভাইবোন’, ‘কে কি হব খেলা’ ইত্যাদি।

‘পরবি’ কবিতার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়—

শিশু

কোথা থেকে আসচ্ তুমি—
আস্‌চ কোথা থেকে?

সন্ধে হ'তে আস্তে তুমি

তুমি কি যাও ডেকে?

....

শৈশব

আস্‌চি আমি, আস্‌চি আমি, তোমাদেরি রবি!

....

বালক-বালিকা

খেলচ্‌ তুমি মোদের সাথে

দিন রজনীভরা, ('পরবি', সবুজলেখা)

এইভাবে শিশু, শৈশব; বালক, বালিকা, বাল্য; কিশোর, কিশোরী, কৈশোরের মধ্যে কথোপকথন চলে।

ভাই।— দ্যাখ্‌ সুকু! তোর ছাই

এসব খেলা, মোর ভাই মনে ধরেনা

....

বোন।— তোমার মত লাফালাফি

দিনরাত হাঁকাহাঁকি ভাল লাগে না! ('ভাইবোন', *খোকা খুকুর খেলা*)

দুই ভাইবোনের কথোপকথন চলতে থাকে।

"কে কি হব খেলা" কবিতাটিতেও এই কথোপকথন আছে—

প্রথম বালক।— জানিস্‌!—

আমি যখন বড় হ'ব, আমি হ'ব কি?

আমি কর্‌বো ভারি ম—স্ত সওদা—গরী

....

দ্বিতীয় বালক।— হ্যাঁ,—

তুই হোস্‌ খুব মস্ত সওদা—গর।

....

তৃতীয় বালক।— হ্যাঁ,—

তুই হোস্‌ মস্ত বড়,

দো—কা—ন্‌ দার। ('কে কি হব খেলা', *খোকাখুকুর খেলা*)

এইভাবে কবিতাটাতে একে একে যথাক্রমে প্রথম বালক, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বালক, সকলে, বালিকা, সকল বালকের কথোপকথন রয়েছে।

- বর্ণনাধর্মী/ গল্পধর্মী কবিতায় কোন বিষয় বর্ণনা করার বা গল্প বলার একটা চেষ্টা থাকে। যেমন—

লক্ষ্মীমায়ের সোনার ঘরে
হীরা মণির মাঝে,
খেল্‌ছিল সে সোনার শিশু
সকল দুপুর সাঁজে। (‘রূপগাথা’, *বাংলার সোনার ছেলে*)

এখানে দক্ষিণারঞ্জন গল্পের ছলে লক্ষ্মী মা, বীণাপাণি মা ও তাঁদের সোনার ছেলে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছেন।

ভোজ রাজার রাজকন্যা মেঘবরণ কেশ
কুঁচবরণ গা খানি, সোনার বরণ বেশ। (‘অন্নপূর্ণা মা’, *খোকা খুকুর খেলা*)

এতো একেবারেই রূপকথার গল্প বলার ভঙ্গিতে পাণ্ডব জননী কুন্তীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

- কালকেতু ছিল ব্যাধের ছেলে, গায়ে মহাবল।
  হাত দু’খানা ছিল তা’র লোহার সাবল! (‘কালকেতু’)

- মোদের দেশে ছিলেন রে ভাই, চাঁদ সওদাগর।
  ধনেজনে ছিলেন চাঁদ লক্ষেশ্বর।।
  তাঁ’র পুত্র লক্ষ্মীন্দর অতুল রতন।
  সেই ছেলেরে বিয়ে করা’তে চাঁদের হ’ল মন।।
  বেছে’ বেছে’ আন্‌লেন চাঁদ কন্যা ‘অনুপাম’।
  রূপে-গুণে আলো কন্যা বেহুলা নাম।। (‘বেহুলা সতী’)

- ‘হনু’ বল্‌লে রাগ করে এমন ছেলে কে?
  হনুর ছিল কেমন বিক্রম, শোন এসে’!
  ছোট্ট যখন ছিল হনু, করেছিল কি,—
  সেই মজার কথাটুকুন্ বল্‌তে এসেছি! (‘মজার গল্প’)

- ছোট্ট খাট্টো মোদের গাঁ

  নদী—র পাড়ে,

  হাজার হাজার গাছ চলেছে

  ধা—রে—ধারে। ('আমাদের গ্রাম')

- খোকার দেশে কেবল হেসে

  চাঁদটি উঠে আগে

  সূর্য্যি মামার রাজধানীতে বেজায় চমক লাগে! ('খোকার দেশ')

- মাথাজোড়া পাগড়ি, পায়ে আঁটা নাগ্‌রা,

  খটাখট্ চলে আসে — এঞ্জিন নির্ধূম! ('চিঠি')

উপরে উক্ত কবিতাগুলোতও যথাক্রমে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বীর কালকেতু, 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ সতী বেহুলা, মহাবীর হনুমানের কথা, গ্রামের বর্ণনা, খোকার দেশের বর্ণনা সমস্ত একেবারেই গল্প বলার ভঙ্গিতে পাওয়া গেছে।

- <u>আবেগাত্মক/ গীতিধর্মী</u> কবিতায় কবি-মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশ পেয়ে থাকে। 'দেশ' এই ধরনের কবিতা। এ-কবিতায় দক্ষিণারঞ্জনের স্বদেশপ্রেমের আবেগ উচ্চারিত।

  দেশ দেশ দেশ — ভাই, আমাদের দেশ।

  সক্কল দেশের আগে সে কোন্ দেশ?

  — ভাই, আমার দেশ।।

  এ শুধু কবিতা নয়, গানও। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ গানের সুরস্রষ্টা। এই কবিতাটা *খোকা খুকুর খেলা, সবুজ লেখা* দুটো গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

- <u>ওড জাতীয়/ গাথা</u> ''প্রায়শই ছন্দোবদ্ধ এক ধরনের গীতিকবিতা যা কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত। বিষয়, অনুভূতি ও প্রকাশ ভঙ্গিতে একটা মহৎ কিছু বা উচ্ছ্বাস বর্তমান থাকে এরকম কবিতায়।''[৭] দক্ষিণারঞ্জনের 'কন্যকা কুন্তী' কবিতা কুন্তীকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে। যেমন—

  এইরূপে কন্যা পৃথা বাড়িলা সুন্দর,

  চন্দ্রমার আলো দিয়া ভোজরাজ্য আলোকিয়া

আলোকিয়া নৃপতির আনন্দ সায়র।

সে কি রূপ! অনন্ত উচ্ছ্বাস স্নেহ — অমৃতের ক্ষীরসর ননী!

"কুন্তী" নামে ভোজগৃহে শিশু লক্ষ্মী আইলা আপনি!

এই কবিতায় কুন্তীর স্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে ।

ভোজ রাজার রাজকন্যা মেঘবরণ কেশ

কুঁচবরণ গা খানি, সোনার বরণ বেশ।

রুণু রুণু নূপুর বাজে রাঙা রাঙা পায়

ভোর আলো করে' কন্যা নাইতে যায়। ('অন্নপূর্ণা মা')

'অন্নপূর্ণা মা' কবিতায়ও দেবী কুন্তীর অন্নপূর্ণা রূপের মহত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

৫. রীতি

কবিতার রীতি বা শৈলী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে কবিতার ছন্দ, ইমেজ তথা ভাষার ব্যবহার। আর এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কবির সাফল্য নজরে আসে। বিষয়টা আলোচনা করে দেখা যাক্—

ছন্দ

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর কবিতায় ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

লক্ খি মা এর্/ সো নার্ ঘ রে। হী রা ম নির্/ মা ঝে ৪+৪+৪+২

খেল্ ছি ল সে। সো নার্ শি শু। স কাল্ দু পুর্। সাঁ জে ৪+৪+৪+২ ('রূপগাথা')

খো কার্ দে শে। কে বল্ হে সে/ চাঁদ্ টি উ ঠে। আ গে ৪+৪+৪+২

সূর্ যি মা মার্। রাজ্ ধা নী তে। বে জায় চ মক্। লা গে ৪+৪+৪+২

আবার তাঁর কবিতায় সরল কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়—

পাঁ চের্ ব ছ রে। পা টি দি লে ভাই। ৬+৬

ইচ্ ছে ক রে যে। ব ড় হ য়ে যাই। ৬+৬

‖ | | ‖
দশ্ টি ব ছর্। ৬ (‘জন্মদিন’)

| | | | | | | | |
উ ড়ি য়ে দি য়ে। রো দের্ দো লা। ৫+৫

| | | | | | | |
ছা য়া বি ধুর্। উ দল্ প্রা তে। ৫+৫ (‘ভাদ্র’)

এই কবিতায় কলাবৃত্ত দ্বিপদীর ব্যবহার লক্ষণীয়। আবার ‘দেশ’ কবিতায় কবি মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন—

‖ ‖ ‖ ‖ | | ‖ ‖
দেশ্ দেশ্ দেশ্ ভাই। আ মা দের্ দেশ্। ৮+৬

| ‖ | ‖ | | ‖ ‖ ‖
সক্ কল্ দে শের্ আ গে। সে কোন্ দেশ্ ৮+৬

ছন্দের ক্ষেত্রে কবি শুধু দলবৃত্তই নয়, কলাবৃত্ত ছন্দেরও বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

শৈলীগত চিত্রণে ইমেজ বা চিত্রকল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘‘একটি ইমেজ সমগ্রের চিন্তা অনুভব সামর্থ ও জটিলতা বিষয়েও আমাদের উৎসুক করে তোলে।’’[৮] কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত করার লক্ষ্যে চিত্রকল্পের জন্ম দিয়ে থাকেন। ‘খোকার দেশে ভেসে ভেসে/ রূপলী গান-গাওয়া’, ‘ঝিনুকগুলি নদীর জলে জোচ্ছনাতে ভেজে’ বা ‘পড়ার বনে দেয় বুলিয়ে রামধনুকের তুলি’ (‘খোকার দেশ’)— ইত্যাদি নানা চিত্রকল্পের সমাবেশ ঘটিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। ‘রূপলীগান’ অর্থাৎ খোকার রঙিন, স্বপ্নমাখা দেশে স্বপ্নের রঙে রাঙানো উচ্ছলতার গান গাওয়া হয়। ঝিনুকের দল নদীর জলে জ্যোৎস্নার আলোয় স্নাত হয়। এও সেই স্বপ্নের দেশেরই সামিল হওয়া। রামধনু তুলির টানে তার সাত রঙ দিয়ে পড়ার নীরস জগৎকে সরস করে তোলে। ‘কাঁধে ঝোলা ব্যাগ যেন সাগরের কাঁকড়া!’ (‘চিঠি’)। ডাকহরকরাকে সাগরের কাঁকড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাগরের কাঁকড়া যেমন খুব দ্রুত গতিতে ছুটে চলে, ছুট্টে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে, ডাকহরকরাও তেমনি দ্রুত গতিতে তার গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে। সাগরের কাঁকড়ার পিঠের দিকটা চওড়া যার সঙ্গে ডাকহরকরার কাঁধের ঝোলা ব্যাগের সাদৃশ্য। ‘দেশের মাটি শীতল পাটি’ (‘টুল! টুল!! টুল!!!’)— শীতল পাটি যেমন বসার স্থান, গ্রীষ্মের দিনে

শান্তির আশ্রয় দেশের মাটিও তেমনি মানুষের সুশীতল শান্তিময় আশ্রয়স্থল। 'বিবস নীলের উদাস চাওয়া' ('ভাদ্র') — নীল একদিকে যেমন স্বপ্নের রঙ অন্যদিকে অসীমতা, শূন্যতারও প্রতীক। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর'। এমনই ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষায় রাধার 'মন্দির' শূন্য মনে হয়েছিল। বর্ষা একদিকে যেমন মানুষের মনকে রোম্যান্টিক করে তোলে, এই বর্ষাই আবার বিরহী মনকে উদাসীনও করে তোলে। 'শ্রাবণ পারের/ নিঃসরিনী' ('ভাদ্র') স্রোতস্বিনীর মত অঝোর ধারায় 'জগতের আজ প্রিয়প্রিয়া'কে 'সংগোপনে' কাঁদিয়ে দেয়। কবি দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় ব্যবহৃত এই ধরনের বিচিত্র চিত্রকল্পের ব্যবহার কবির গভীর জীবন বীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বোধ, পরিশীলিত মননের পরিচয়বাহী।

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের শ্রুতি-মাধুর্য, ব্যঞ্জনার প্রয়োগ, সর্বোপরি শব্দ ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গেছে। আবার ছন্দের ব্যবহার, চিত্রকল্পের গঠনে অনন্যতার আস্বাদ মিলল। এ সবই কবির ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে অনবদ্যতার সাক্ষ্য দেয়।

৬. চরিত্রায়ন

চরিত্রগঠনেও দক্ষিণারঞ্জনের সযত্ন প্রয়াস চোখে পড়ে।

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায় বেশ কিছু মহৎ চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। সেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দৈবী মহিমা কম, মাতৃত্ব বেশি প্রকাশিত। আর তাঁদের সন্তান গান পাগল, নির্লোভ এক শিশু ('রূপগাথা')। 'সবুজ কিশোর', 'জন্মদিন' কবিতাগুলোতে শিশুমনের অনেক রঙিন স্বপ্নের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আম্‌রা' কবিতায় মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। 'চিঠি' কবিতার ডাকহরকরা নিজ সংসারে উদাসীন অথচ বিশ্বসংসারের খবরের বাহক। 'অচীন পথে', 'পরবি', 'রামধনু', 'শেষের সুর' কবিতাগুলোতে রয়েছে শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যের উচ্ছলতা, নানা রঙের বিশেষত্ব। 'ভাদ্র' মাস আগমনীর আহ্বায়ক। 'খোকাখুকুর খেলা'র খোকা খুকু নির্লোভ দুই শিশু। 'ভাইবোন' কবিতার বোন ভাবীকালের স্নেহময়ী জননীর প্রতিভূ। 'সর্বদমন' কবিতার শকুন্তলা-নন্দন ভরত তেজস্বী

বীর। 'অন্নপূর্ণা মা' বা 'কন্যকা কুন্তী' দেবী অন্নপূর্ণার ভূমিকায় অবতীর্ণা। 'কালকেতু' মহাবীর, 'বেহুলা সতী' সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'বাণিজ্য' কবিতায় সন্তানের দ্বারা পিতা-মাতার দুঃখ নিরশন, 'মজার গল্প' কবিতায় ছোট্ট হনুমানের বীরত্ব, ''কে কি হব খেলা'' কবিতায় লক্ষ্মী বোনের আদর্শ জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, 'ছি! ছি! ছি!' কবিতায় ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশের কথা রয়েছে। ''কে কি হব খেলা'' কবিতায় দক্ষিণারঞ্জনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে : ''তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকেরা, অর্থাৎ সদ্বংশজাত ভদ্র-সন্তানেরা, ধনে-মানে ভরে উঠুক, তুচ্ছ চাকরির মায়ায় না মজে বাড়িয়ে নিক আকাঙ্ক্ষার পরিধি, দোকান-কারখানা-খামার বানিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে দেশের অর্থনীতির হাল ধরুক।''[৯] আর যারা নিরক্ষর, খেটে খাওয়া মানুষের সন্তানেরা খেটেই খাক। অন্যদিকে এই কবিতার 'লক্ষ্মী' বালিকা ও 'ভাইবোন' কবিতার 'লক্ষ্মী' বোনের পরিণতি 'সুশীলা' হওয়া। ''গোপাল নানারকমের হওয়া যায়, কিন্তু 'সুশীলা' একক — গৃহকর্ম ও শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করা ছাড়া তার করণীয় কিছু নেই। 'সুশীলারা' কেবল, সতী-সাবিত্রী-সীতা-বেহুলা, 'হিন্দু' সমাজের 'অচল মহিমার' 'অচঞ্চল প্রতিমাদের' অনুসরণ করে চলুক, তাহলেই হবে।''[১০] 'আমাদের গ্রাম' কবিতায় গ্রামের রূপমুগ্ধ বর্ণনা, 'বাগান' কবিতায় গাছপালার প্রতি সহমর্মিতা, 'দেশ' কবিতায় দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশিত। 'মরণান্তে', 'রথযাত্রা', 'ঝঞ্ঝাশেষে' কবিতায় ঈশ্বরমুখী, সংসারে উদাসীন কবির খোঁজ পাওয়া যায়।

<u>কবি দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে অন্য কবিদের তুলনা</u>:

রবীন্দ্রানুসারী কবিবৃন্দ, যেমন— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ কবির পুরাণ-চেতনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক, দক্ষিণারঞ্জনের লেখাতেও এই প্রকৃতি প্রেম ধরা পড়েছে। যেমন—

হেথা গাছের ফাঁকে টুকরা আকাশ,
মউল শালের সবুজ ভিড়

উঠছে দূরে মাঠের কোণে
ময়ূর-কণ্ঠ ‘ত্রিকূট’ শির;
পটে-আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচকিরি
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ
লাখো পাখীর গিটকিরি (‘দেওঘরে’)

দক্ষিণারঞ্জন লিখেছেন—

ছোট্টখাট্টো মোদের গাঁ
নদী—র পাড়ে,
হাজার হাজার গাছ চলেছে
ধা—রে—ধারে।
ছল্ ছল্ ছল্ নদীর জল,
সোঁ—ত বেজায়,
কোথাকার জল এসে'
কোথায় চলে' যায়! (‘আমাদের গ্রাম’)

“বাঙালি-জীবনের ... হর্ষ, চাঞ্চল্য ... আবেগের প্রাবল্য, এই সবই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।”[১১] যেমন—

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী। (‘তাতারসির গান’)

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায়ও বাংলা, বাঙালির প্রতি এই আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পিত হয়েছে—

কোন্‌খানেতে হাসিটি তাঁর
পড়ল গিয়ে

ঠিক?

গঙ্গানদীর মোহানাতে

বাংলা দেশের দিক!

সাগর তীরে যেখানেতে

নিতুই বীণা বাজে

বাংলা মায়ের

আঁচল ভরা

ফুলের বনের

মাঝে! ('বাংলার সোনার ছেলে')

কবি এখানে বাঙালি, বিশেষত শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় লঘু তরল কল্পনার ছোঁয়া, শব্দচিত্রের প্রাধান্য রয়েছে—

ঘুরে ঘুরে ঘুমতী চলে, ঠুমরী তালে ঢেউ তোলে!

বেল চামেলীর চুমকি চুলে, ফুলের হাওয়ায় চোখ ঢোলে!

কুড়ুক পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,

ক্ষীর্‌রি—দোয়েল-শালিক-শ্যামা-বুলবুলিদের কনসার্টে! ('ঘুম্‌তী নদী')

দক্ষিণারঞ্জনের লেখাতেও এই তরলতা, চপলতার ছোঁয়া রয়ে গেছে—

টুল! টুল!! টুল!!!

আমরা দুই ভাই বোন টগর ফুল!

টল্‌! টল্‌!! টল্‌!!

আমরা দুই ভাই বোন হীরের ফল!

টলি! টলি!! টলি!!!

আমরা দুই ভাই বোন গলা—গলি!

টম্‌ — টম্‌ — টমর্‌!!!

আমরা দুই ভাই বোন মার কোলে অমর!

দেশের মাটি শীতল পাটি,—

আমরা দুই ভাই বোন লো—হার কাটী!! ('টুল! টুল!! টুল!!!')

কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখেছিলেন গ্রামের কথা—

রূপটি তাহার ত্রিশটি বছর তিয়াসা মেটেনি দেখে,
শান্ত সজল শ্যামল সুষমা চক্ষে রয়েছে লেগে।...
অশথের নব পল্লবোদ্গমে মনে পড়ে ফাল্গুনে,
গৃহ কপোতের মঞ্জু কূজন, শ্রান্ত হ'ত না শুনে।... ('একটি গ্রাম')

''এই পল্লী বাংলার প্রতি প্রীতির আর-এক রূপ, বাঙালি জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি প্রেম। এই প্রেমের পরিচয় 'বাঙালী' কবিতাটি''[১২]—

শ্রী গৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নবচেতনার করিয়াছে উন্মেষ।
বাঙালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন,
রণমুখী নয় হরিমুখী করি মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী,
সারা ধরনীর গুরুপদে তার দাবী। ('বাঙালী')

দক্ষিণারঞ্জন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'মনসামঙ্গল' কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগরকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন—

মোদের দেশে ছিলেন রে ভাই, চাঁদ সওদাগর।
ধনে জনে ছিলেন চাঁদ লক্ষেশ্বর।।
তা'র পুত্র লক্ষ্মীন্দর অতুল রতন।
সেই ছেলেরে বিয়ে করা'তে চাঁদের হ'ল মন।
বেছে' বেছে' আন্‌লেন চাঁদ কন্যা 'অনুপাম'।
রূপে-গুণে আলো কন্যা বেহুলা নাম।।
সাত রাজ্যে ধূম ফেলে' বিয়ে আড়ম্বর।
ছেলে বৌ গেলেন দু'য়ে বাসর ঘর।।' ('বেহুলা সতী')

কুমুদরঞ্জন ভারতের মহান গাম্ভীর্যকে মিশিয়ে নিয়েছেন কোমল স্বভাব ও ভক্তি দিয়ে—

অভ্রভেদী তুষারকিরীট, বিশাল হিমালয়,
আপন করা তাকে বড় সহজ কথা নয়।

দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার,
অন্ত না পাই তাহার রূপের, তাহার মহিমার। ('আমাদের ভারত')

দক্ষিণারঞ্জনের রচনাতেও এই দেশভক্তি প্রকাশ পেয়েছে—

দেশ দেশ দেশ — ভাই, আমাদের দেশ!
সক্কল দেশের আগে সে কোন্ দেশ?
—ভাই, আমাদের দেশ।।
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর,
পূবে পশ্চিমে, ভাই, পাহাড় মনোহর,
— ভাই, পাহাড় মনোহর,
তার মধ্যে মায়ের আঁচল সোনা-ঢালা বেশ্
গাছ-গাছালী ক্ষীরের নদী, সোনা-ধানের ক্ষেত,
—ভাই আমাদের দেশ। ('দেশ')

কালিদাস রায়ও ছিলেন বাংলার কবি, বাংলাদেশের কবি। যথা—

আমি বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গালার আশা-তৃষা, স্মৃতি স্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি। ('বৈকালী')

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতায়ও বাঙালির প্রতি, বাংলাদেশের প্রতি মুগ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায়—

জগৎ ভরি'
গানে
উঠ্‌লে বেজে
ফুলের বীণা
পদ্মপাতায় ছায়ে
কর্‌ল প্রণাম
সোনার ছেলে
দুটি মায়ের
পায়ে—

যেখানেতে গঙ্গানদী

সাগরে দেয় দোল

বাংলার দেশের গানে

যেথা

ভুবন

বিভোল! ('বাংলার সোনার ছেলে')

কালিদাস রায়ের কবি-মানসিকতার সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের ভাবধারার সাদৃশ্য পাওয়া যায়—

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যুঁই এর বনে

বিদায় নিল সজল চোখে নও - বসতের ক'নে।

বিদায় নিল কাঁচপোকা টিপ, নয়নে কাজল,

নাকটি হ'তে নোলক মোতি, চরণ হ'তে মল।

বিদায় নিল লালপেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর

সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর। ('কবির বিদায়')

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতাতেও এই ধরনের শিশু মনের উপযোগী বর্ণনা মেলে—

খোকার দেশে কেবল হেসে

চাঁদটি উঠে আগে

সূর্য্যিমামার রাজধানীতে বেজায় চমক লাগে!

তারাদাদার বই কেড়ে নেয় ফুলবোনেরা জুটি',

দীপের আলোয় হেসে উঠে মায়ের আঁখি দু'টি! ('খোকার দেশ')

বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার দক্ষিণারঞ্জনের পূর্বসূরী (১৮৬৬-১৯৩৭)। দুজনের রচনাশৈলীর মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে। আর বিষয় ভাবনাতেও রয়েছে মিল। দুজনের লেখাই শিশু-কিশোরকে ঘিরে। শৈশব-সারল্য, মান-অভিমান, কল্পনাপ্রবণতা যোগীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন রয়েছে, দক্ষিণারঞ্জনেও তেমনই আছে।

হাসি-খুসি মুখ দুখানি,

সদাই হাসি ভরা;

ভাইবোনেতে হেসে হেসে

মাতিয়ে তোলে ধরা!

হাসির ছটা, হাসির ঘটা,

উঠ্‌ছে হাসির ঢেউ;

জন্মে কভু এমন হাসি

দেখেনি কো কেউ![১৩] (‘হাসি’, *হাসিখুশি*)

ভাইবোনের এমন সুমধুর সম্পর্ক ‘খোকাখুকুর খেলা’-তেও আছে—

টুল! টুল! টুল!!

আমরা দুই ভাই বোন টগর ফুল!

টল! টল! টল!!

আমরা দুই ভাই বোন হীরের ফল!

টলি! টলি! টলি!!

আমরা দুই ভাই বোন গলা—গলি! (‘টুল! টুল!! টুল!!!)

শিশুদের কল্প-জগৎ রচিত হয়েছে যোগীন্দ্রনাথের কবিতায়—

পরীর দেশে মনের সুখে থাক্‌ত ছেলে-মেয়ে,

হাসির ছটায় মুখ দু’খানি থাক্‌ত সদা ছেয়ে!

ফুলের মত কচি মুখে তারার মত আঁখি,

খেলার সাথী ছিল তাদের বনের যত পাখী![১৪] (‘ছেলে-মেয়ে’)

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতাতেও এই কাল্পনিক-চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

খোকার দেশে কেবল হেসে

চাঁদটি উঠে আগে

সূর্য্যিমামার রাজধানীতে বেজায় চমক লাগে!

তারাদাদার বই কেড়ে নেয় ফুলবোনেরা জুটি; (‘খোকার দেশ’, *সবুজ লেখা*)

দক্ষিণারঞ্জন (১৮৭৭-১৯৫৭) ছিলেন অগ্রজ আর জসীমউদ্দিন (১৯০৪-১৯৭৬) অনুজ কবি। অগ্রজ কবি হলেও দক্ষিণারঞ্জন হয়ত অনুজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার উল্টোটাও হতে পারে। কারণ দক্ষিণারঞ্জন ও জসীমউদ্দিনের রচনার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জসীমউদ্দিনের কবিতায় গ্রামজীবন, তার সরল সৌন্দর্যের বর্ণনা ‘বালুচর’ কাব্যে পাওয়া যায়—

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া
চলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া
তেমন করে’
... ...
ফোটা সরিষার পাঁপড়ির ভরে,
চোরো মাঠখানি কাঁপি থরে থরে,
সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে— (‘বাঁশরী আমার’)

—‘‘এই কবিতায় পল্লী প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি চিত্তের একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ করা যায়।’’[১৫]

দক্ষিণারঞ্জন লিখেছেন—

বকুলতলার বাঁধা শানে
ফুল ঝুর্ ঝুর্;—
ঝাপ্ড়া ঝাপ্ড়া গাছ কাঁপিয়ে
বাতাস ফুর্ ফুর্!
ফুর্ ফুর্ বাতাসে কাঁপে — তালগাছের পাতা,
তা’ই দেখতে হ্যালে দোলে — সুপারী গাছের মাথা।
ঝোলা ঝোলা বাবুইর বাসা — বাবুই ঝাঁকে ঝাঁক,
একবার যায় একবার আসে, — কেবল পাড়ে ডাক! (‘আমাদের গ্রাম’)

জসীমউদ্দিনের কবিতায় অনুরাগ মথিত পল্লীকিশোর ও কিশোরীর পরস্পরের জীবন থেকে বিদায়ের কারুণ্যই ফুটে উঠেছে—

আমি চেয়ে রব তব মুখপানে তুমি মোর মুখপানে
মাঝে অনন্ত কথার সাগর কথা কবে কানে কানে’; (‘বিদায়’)

দক্ষিণারঞ্জন ‘জুলী’ নামে এক পল্লী কিশোরীর কথা লিখেছেন—

জুলীর নয়ন সম নভে জাগে তারা
তারে চাহি’ বসি’ আছি আপনায় হারা।— (‘জুলী’)

জসীমউদ্দিনের কবিতায় ধর্মের ক্ষেত্রে উদার, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দেখা যায়—

চাষীদের ওই দুইটি মেয়ে ঈদের দুটি চাঁদ;
যেই দেখেছি পেরিয়ে গেল নয়ন পুরীর ফাঁদ। ('কৃষাণী দুই মেয়ে')

দক্ষিণারঞ্জনের কবিতাতেও দেখা যায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা, জাতপাতের ভেদাভেদহীনতা—

কাতারে কাতারে বাড়ী দী—ঘির ধার,—
জেলে পাড়া, কুমোর পাড়া, নাপিত কামার।
জোলা তাঁতী অনেক ছিল, এখন তত নাই।
গাঁ—য়ের মোড়ল — বড় — মিয়াজান ভাই।। ('আমাদের গ্রাম')

কবি হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন কতটা সার্থক তাই সেকথা বিচার করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে তিনি হলেন আবেগপ্রবণ কবি, আর এই আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট পারঙ্গম। নীতি, গার্হস্থ্য-বন্ধন, মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তি, স্বদেশের প্রতি অনুরক্তি, প্রকৃতি প্রেম, মানব-শৃঙ্খল রচনা, পৌরাণিক আদর্শ অনুসন্ধান, পল্লী-প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা, লোকসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা, শিশুমনের অনুকূল কাল্পনিক পরিবেশ, সৌন্দর্য সৃষ্টি, দার্শনিক মনন, সর্বোপরি এক উদার অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা — এসবই তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। তাই কবিতাগুলো খুব উচ্চমানের না হলেও সৌন্দর্যপ্রেমিক ও আবেগমথিত হৃদয়ের প্রকাশে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা সফল। সর্বোপরি কিশোর-বয়সোপযোগী ও শিশুসুলভ। দক্ষিণারঞ্জনের লোকসাহিত্যে শিশু-মনের চাহিদা, উপযোগিতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর রচিত কবিতার ক্ষেত্রেও সেই শিশু-কিশোরেরই প্রাধান্য। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতা বা কাব্যগ্রন্থকে বিষয়বস্তুর নিরিখে একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত বলা যায়।

তথ্যসূত্র ::

১. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী*, ১ম খণ্ড, বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪৪

২. সুকান্ত ভট্টাচার্য, *ছাড়পত্র*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; চতুর্থ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৭

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ১ম ভাগ, অন্নদামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৩

৪. শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*, কৃতাঞ্জলি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৪০

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচিত্রিতা', *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪০-৬৪১

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানসী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১০ই পৌষ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০

৭. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪

৮. রবিন পাল, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প*, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. চ

৯. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস/ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯১; কারিগর দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৩৩

১০. তদেব, পৃ. ২৩৪

১১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ*, প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ৪৪

১২. তদেব, পৃ. ১১৩

১৩. যোগীন্দ্রনাথ সরকার, *হাসিখুশি*, ২য় ভাগ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৭; প্রথম সংগ্রাহক-সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫

১৪. তদেব

১৫. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীমউদ্দিন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৭

৩. তৃতীয় অধ্যায়

গল্প

দক্ষিণারঞ্জন কিশোর-সাহিত্যিক হিসাবে যে সার্থকতা লাভ করেছিলেন তাঁর লিখিত গল্পগুলো তারই সাক্ষ্য দেয়। কিশোর মনের নানা ওঠাপড়া, টানাপোড়েন, আবেগ, যন্ত্রণা, আনন্দ, মহানুভবতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক এইসব গল্পে ধরা পড়েছে। গল্পগুলো যেন কিশোর মনের প্রতিচ্ছবি।

দক্ষিণারঞ্জন বেশ কিছু গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন— *কিশোরদের মন* (১৯৩৩), *আমার দেশ*, *চারু ও হারু* (১৯১২), *উৎপল ও রবি* (১৯২৮), *ক্যাঙ্গারু*, *ফার্ষ্ট্বয়* (১৯২৭), *লাষ্ট্বয়*, *সবুজ লেখা* (১৯৩৮)। এই গ্রন্থগুলোর অন্তর্গত গল্প যথাক্রমে *কিশোরদের মন*, *আমার দেশ* গ্রন্থের ‘সপ্তডিঙা’, ‘দাদুর দেশ’, ‘অপরূপ সোনার কাটি’, ‘কঙ্কালের জাগরণ’, ‘কলরব’, ‘চারু ও হারু’, ‘উৎপল ও রবি’, ‘ক্যাঙ্গারু’, ‘ফার্ষ্ট্বয়’, ‘লাষ্ট্বয়’, *সবুজ লেখা* গ্রন্থের ‘কাজল জল’, ‘ঙ’, ‘দরদী’, ‘তুলির লেখা’।

গল্পগুলোর বিষয়বস্তু

‘ফার্ষ্ট্বয়’ গল্পের বিষয় হল অমল লেখাপড়ায় আর অজয় বীরত্বে প্রথম। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলে পুরস্কার হিসাবে অমলের বন্দুক পেতে চাওয়ায় অবাক হয় দিদি অণিমা। সে মনে মনে কামনা করে অমল পরীক্ষাতে প্রথম হোক, আবার বাড়িতে যাতে বন্দুকও না আসে। অমলের শ্রেণিতে নতুন ভর্তি হওয়া তিনটে ছেলের মধ্যে অমিয় দরিদ্র অথচ মেধাবী। বার্ষিক পরীক্ষায় চার নম্বর বেশি পেয়ে যদি সে ‘ফার্ষ্ট্’ হয় তাহলে ‘Freeship’ পাবে। অমল নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে অমিয়কে জিতিয়ে দেয়। অজয়, অমলের ‘ফার্ষ্ট্বয়’ নামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে।

‘লাষ্ট্বয়’ গল্পে আছে শ্রেণির ‘লাষ্ট্বয়’ শ্রেণির ভালো ছাত্র যোগেশের সমান নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে ফার্স্ট্ হয়। তার বৌদি তাকে এক থালা খাবার পুরস্কার দেয়। এই গল্পের বিশেষত্ব হল ‘Last boy’-এর ‘L’ উল্টে ‘First boy’-এর ‘F’ হয়েছে।

সবুজ লেখা গ্রন্থের 'কাজল জল' গল্পের রাখাল বাঁশি বাজায়। তার বাঁশি শুনে মানুষ পশু-প্রাণী নিজেদের কাজ ভুলে যায়। রাখাল একদিন লক্ষ করে কোন এক ভয়ানক বিষধর সাপ তার কপিলা গাইয়ের দুধ খেয়ে যায়। রাখাল রাজদরবারে গিয়ে সেকথা জানায়। রাজা সৈন্যসামন্ত-রাজকটকসহ কপিলাকে পাহারা দিতে এলে সেই সাপ সৈন্যসামন্তসহ রাজাকে গিলে ফেলে। কোটাল সুযোগ বুঝে রাজসিংহাসনে বসে, ফলে রাজ্য শ্রীহীন হয়। এদিকে ধবল পাহাড়ের পুরীতে বসে রাজকন্যা কোনও খবর পান না। রাখাল একদিন রাজকন্যার খোঁজে আসে। রাখালের বাঁশি শুনে রাজকন্যারও সব কাজে ভুল হয়ে যায়। শেষে রাজকন্যা নিরাভরণ হয়ে পায়ে হেঁটে রাজ্যে ফিরে আসেন।

'ঙ' গল্পে মলিনা নামে এক দরিদ্র ছাত্রীর গায়ের কালো রং আর কুঁজো পিঠের কারণে নাম 'ঙ'। তার নাকের আঁচিলের জন্য নাম বড়শী। সে সকলের অবহেলার পাত্রী। অথচ মলিনার শ্রেণিরই হিমানী যখন পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলে, তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মলিনা তার বিদ্যালয়ের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে হিমানীর আঙুলে বেঁধে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দেয়।

'দরদী' গল্পে আছে মেথরের ছেলে মুন্টাকে জমিদারের বুলডগ কামড়ে দেয় আর জমিদারের ফক্স টেরিয়ার, ল্যাপ্‌ডগ তখন ঘেউ ঘেউ সহযোগে মুন্টাকে আক্রমণ করতে যায়। মুন্টার বন্ধু দেশি কুকুর জয় কুকুরগুলোকে আঁচড়ে কামড়ে মুন্টাকে তাদের থেকে আড়াল করে। সেই সময় জমিদারের সিপাই বন্দুক চালায়, ফলে জয়ের পায়ের আঙুল উড়ে যায়। 'দরদী' জমিদার আহত মুন্টা ও জয়ের দায়িত্ব নেন।

'তুলির লেখা' গল্পের অতুল পড়াশোনায় ভালো। তার বন্ধু অজিত অঙ্কে কাঁচা অথচ তার আঁকার হাত পাকা। পড়াশোনার কারণে অজিত তার বড়দির ভাশুর রামলাল বাবুর কাছে ধমক খায়, কারণ অজিত পাশ করলে তিনি তার চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। অবশেষে অনেক চেষ্টায় অজিত অঙ্কসহ তিন বিষয়ে লেটার পায়। অন্যদিকে অজিতের আঁকা ছবি 'Indian Exhibition Art Section'-এ বেরোয়, সে পদক ও 'Special Certificate' পায়। দারুণ খুশি রামলালবাবু বলেন অজিতের 'তুলির লেখা' সব লেখাকে হারিয়ে দিয়েছে।

‘কিশোরদের মন’ গল্পের বিষয়বস্তু হল ইংরাজি ভাষাকে কেন্দ্র করে জজের ছেলে সুবিনয় আর দরিদ্র বিমলের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্বে একসময় ভাঙন ধরে। আবার শেষ পর্যন্ত দুজনে ‘বিজয়ার আলিঙ্গনে বাঁধা’ পড়ে।

আমার দেশ গ্রন্থের ‘অপরূপ সোনার কাটি’ গল্পের মাতৃহীন দীপু তার বড় মেসোমশায়ের বাড়িতে বিপুল বৈভবের মধ্যে থাকে আর বছর বছর ফেল করে। তারপর দীপু তার ছোট মাসিমার দেশে যায়, সেখানে গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সে গ্রামকে ভালোবেসে ফেলে এবং মাসতুতো ভাই অতুলের সঙ্গে ‘গ্রাম আর সহর’ মিলিয়ে একটা সুন্দর দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে।

‘কলরব’ গল্পের অহীন্দ্র আর অনিতা দুই ভাই-বোন তাদের বাবা আর মামার সব সম্পত্তি দিয়ে এক অন্নসত্র খোলে। গ্রামে গ্রামে কামার-কুমোর-ছুতোরদের কাজের ব্যবস্থা করে, দেশকে শস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করে, হাসপাতাল তৈরি করে, ছেলেদের আর মেয়েদের বিদ্যাভবন গড়ে তোলে।

‘কঙ্কালের জাগরণ’ গল্পের অজিত মাটির নীচ থেকে বিভিন্ন কঙ্কাল সংগ্রহ করে বাংলার জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়। এইসব কঙ্কাল ‘মানুষের ঘরের কঙ্কাল, মনের কঙ্কাল, কাজের কঙ্কাল, শরীরের কঙ্কাল; দেশের ইতিহাসের কঙ্কাল’, দেশের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী। ‘ক্ষুদে বাল্মীকি’ অজিত সোনাতে লেখা তামার এক পুথি খুঁজে পেয়েছে যার মাধ্যমে বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব জানা যাবে।

‘সপ্তডিঙা’ গল্পে আছে সাত ভাই সওদাগর পুত্র আর সাত ভাই কাঞ্চনের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনি। পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশের লোকের সঙ্গে তাদের মিতালি হয়, সবুজ বাংলাদেশে তারাও আসতে চায়। শরৎ পূর্ণিমায় তাদের দেশে ফেরার কথা। কিন্তু বহু পূর্ণিমা পার হয়ে যায়, সপ্তডিঙাকে কেউ ছাড়ে না। হঠাৎ একদিন তারা উপলব্ধি করে দ্বীপে দেশে বাংলার সওদাগরের পায়ের ছাপ, কিন্তু বাংলার ডিঙায় সে ছাপ শূন্য। দেশে ফিরতে চেয়ে পথ খুঁজে পায় না তারা। ‘সপ্তডিঙার বহর সাত সাগরের মোহনায় উতল পাগল জলে’ ডুবে যায়। এরপর আর কোনও খোঁজ মেলে না। কেবল শরৎ পূর্ণিমার রাতে বাংলার সওদাগরের পুরীর ইঁট-পাথরের স্তুপের নীচ থেকে ‘যজ্ঞের ধোঁয়ার মতো সুগন্ধ ধোঁয়া’ ওঠে। শুধু ভীষণ ঝড়ের রাতে বাংলাব সাগরের জোর হাওয়ায় যেন কিশোর সওদাগর আর কাঞ্চনের বাঁশির সুর শোনা

যায়। যেন সে বলে, ‘আমরা ফিরব, ফিরব, ফিরব, যে বাঙালি, খুঁজতে আসবে আবার সপ্তডিঙা, ফিরব তারি সঙ্গে’।

‘দাদুর দেশ’ গল্পের বিষয় হল দাদুর দেশে কিশোর-কিশোরীদের কাজ করতে হবে। এই দেশে থাকবে না কোন দরিদ্র, মূর্খ, রুগ্ন, দুঃখী। পরীর ছেলেরা গুণী হয়ে, সকল দেশের মানুষের বন্ধু হয়ে, বন্ধু করে দেখাবে। ‘‘তারা বাংলাভাষাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে — জানাবে বাংলাভাষা ভোরের সূর্যের মতো সোনালী, দুপুরের সূর্যের মতো দীপ্ত, আর রাত্রির চাঁদের মতো অমৃতে মাখা!’’

‘চারু ও হারু’ গল্পের বিষয় হল জমিদারপুত্র চারু স্বভাবে বেয়াড়া, পড়াশোনায় অমনোযোগী। আর ‘দুঃখীর ছেলে’ হারু খুব ভদ্র, শান্ত, পরোপকারী। সে লেখাপড়াতেও ভালো। সকলের উপদ্রব সে মুখ বুজে সহ্য করে। সে সকলের প্রিয় পাত্র। পরীক্ষায় বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম হওয়ায় হারু বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের কাছ থেকে প্রথম বৃত্তি আর প্রথম পুরস্কার পায়। সভার মধ্যে কেউ হারুর নামও উচ্চারণ করে না।

‘উৎপল ও রবি’ গল্পে গ্রামের জমিদার পুত্র উৎপল ও দরিদ্র বিধবা মায়ের পুত্র রবির খুব বন্ধুত্ব। কিন্তু উৎপলের পরিবারের কাছে তাদের এই অসমবন্ধুত্ব বিসদৃশ ঠেকায় উৎপলকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যাওয়ার সময় দুজনকে বাক্যালাপ তো দূরের কথা, মুখোমুখি সাক্ষাতের শেষ সুযোগটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না।

‘ক্যাঙ্গারু’ গল্পে রয়েছে - লাফিয়ে চলার ভঙ্গির কারণে করালী কিঙ্করের মামা তার নাম দিয়েছিল ক্যাঙ্গারু। কিন্তু এক পায়ের উপর দাঁড়িয়েই এ.আর.পি. অফিসের ওয়ার্ডেন ক্যাঙ্গারু বোমারু বিমানের ফেলে যাওয়া বোমা দুহাতে তুলে মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সত্যিকারের ওয়ার্ডেনের কাজ করে। এই গল্পটা ‘রংমশাল’ পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।

গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনার নিরিখে কয়েকটা প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। যেমন— গল্পগুলোর ধরন (genre), রীতি, চরিত্রায়ন ইত্যাদি।

১. **<u>ধরন</u>** (genre)

গল্পের ধরন নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন— ছোট গল্প, বড় গল্প, উপকাহিনি যুক্ত গল্প, কিস্‌সা/ আখ্যান, রূপকথাধর্মী, প্রভৃতি।

ছোটগল্প

‘‘ছোট গল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।’’[১]

ছোট গল্প শুধু ছোট গল্প নয়, এর নানান লক্ষণ আছে। ছোটগল্পের লক্ষণ সম্পর্কে বলা যায়—

> ছোটগল্প লঘুপক্ষ প্রজাপতি, তার পাখায় পাখায় দ্রুতলয়ের ছন্দ — সে ভারমুক্ত, লঘুছন্দ, অনাবশ্যকের বোঝা তার নেই।... ছোট গল্পের একটি ঘটনায়, একটি চরিত্রের বিশেষ অংশে, একটি মানসিকতায় বিদ্যুদ্দীপ্তির যে চকিত উদ্ভাস ঘটে, তারই আলোয় জীবনেরই একটি গভীর সত্য ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য কথা বিস্তারে, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য কথা-সংহতিতে; উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য কথা সংহতিতে; উপন্যাসের আস্বাদনে কথারস পিপাসুর পরিতৃপ্তি, আর ছোটগল্পের আস্বাদনে থাকে অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্ত পিপাসা।’[২]

এই ছোটগল্পের উপসংহারে অতৃপ্তি থাকবে, শিল্পী-ব্যক্তির নিবিড় ভাব-তন্ময়তা থাকবে। দক্ষিণারঞ্জনের লেখা গল্পগুলোর মধ্যে ‘ঙ’, ‘দরদী’, ‘উৎপল ও রবি’, ‘ক্যাঙ্গারু’, ‘কলরব’, ‘অপরূপ সোনার কাটি’ — এগুলো ছোটগল্প। এই ছোট গল্পের সূচনা দুরকম হয়ে থাকে। ‘‘Initial Incident বা চমকিত সূচনার গল্প এবং Preliminary Situation বা পূর্ব ঘটনা সূচক আরম্ভ’’[৩]। ‘উৎপল ও রবি’, ‘ক্যাঙ্গারু’, ‘কলরব’, ‘অপরূপ সোনার কাটি’ — এগুলো ‘চমকিত সূচনা’ মূলক আর ‘ঙ’, ‘দরদী’ হল ‘পূর্ব সূচনা’মূলক। যেমন—

১) ‘‘কেমন, হেরে গেলি তো?’’

‘‘গে-ছি ভাই!’’ (‘উৎপল ও রবি’)

২) ক্যাঙ্গারুকে নিশ্চয় চেন তোমরা? ('ক্যাঙ্গারু')

৩) নরেনের সঙ্গেই আমার ঝগড়াটা হত বেশি। ('কলরব')

৪) নামটা শুনেই মনে হচ্ছে যে এ গল্প কি শোনা গল্প? ('অপরূপ সোনার কাটি')

এক্ষেত্রে গল্পের সূচনা হঠাৎ করে হয়ে থাকে। এই গল্পগুলোর বিষয় সম্পর্কে শুরুতে ধারণা মাত্র দেওয়া হয়েছে। এতে পাঠকের মন মূলগল্পে প্রবেশের জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

আবার পূর্ব সূচনার গল্পে পাঠক প্রথম থেকেই সরাসরি গল্পে প্রবেশ করে। যেমন—

১) নাম মেয়েটির, মলিনা। ('ঙ')

২) আমাদের বাড়ীটা একটা বড় গলির মুখে। ('দরদী')

ছোট গল্পের উপসংহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।[৪] ('বর্ষাযাপন', *সোনার তরী*)

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর ছোটগল্পগুলোর সমাপ্তি কীভাবে করেছেন সেটা আগে দেখে নেওয়া যাক।

১) দূর স্টেশনের আলো নিভে যাচ্ছে। রবির কৌটো মাঝখানে জলে পড়ে' নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে। ('উৎপল ও রবি')

২) তাতে কেনই টাকার কথা? ও সব, মামা, তুমি পারো গিয়ে — ভাবো। ('ক্যাঙ্গারু')

৩) প্রায় পাঁচশত গ্রামের লোক চলল সাথে সাথে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মতো দুই ভাই বোনকে নিয়ে, মহা কলরবের মধ্যে কোন্ তাদের অমৃত মধুর রাজ্যে। ('কলরব')

৪) —ভোম্বল-দার চুলোটি, বড় মেসোমশায়ের বাড়ির ওষুধের শিশি, আর দারোয়ানের হাঁক, প্রতুল-দার উড়ে-যাওয়া-পায়রা আর চিঠির জবাব না দেওয়া, ছোট মাসিমার মুখ, মেসোমশায়ের হাসি, অতুলের 'দাদা' ডাক, বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত আমার মনের জেগে ওঠা ইচ্ছে, না, আমার —

দেশ?

('অপরূপ সোনার কাটি')

৫) বইয়ের পাতার মধ্যে Slip খানাকে রেখে, মিস্ট্রেস্ জিজ্ঞেস করছেন, — "মানুষ হতে হলে মানুষ হতে হবে— এর ইংরেজী কি?" ('ঙ')

৬) জয়ও এ হাসি শুনছিল কি না, জানিনে, ওর ঘরের ভিতর থেকে, শিকলের আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে, ও সেই সময় জোরে জোরেই বলছিল— ‘‘ঘোউ।” ‘‘ঘোউ!” (‘দরদী’)

প্রত্যেক গল্পের উপসংহারেই ‘অতৃপ্তি’ রয়ে যায় পাঠকের মনে, কৌতূহলের নিরশন যেন হতে চায় না। পাঠক তার কল্পনা রাজ্যে নিজের মত করে ডানা মেলতে পারে। দক্ষিণারঞ্জন এক্ষেত্রে তাঁর পাঠকের ‘অন্তহীন জিজ্ঞাসা’র জন্য একটা বৃহৎ পরিসর রেখে দিয়েছেন। ‘‘জীবনের মাঝখান থেকে তাকে ধরা— মাঝখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া, আর সেই খণ্ডটুকুর ভেতরেই পাঠক লাভ করবেন সমগ্রতার ইঙ্গিত।”[৫]

ছোটগল্পের একমুখিনতা, স্বল্প পরিধি, ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, বিষয় অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাধারণ ঘটনার প্রকাশ— গল্পগুলোতে সবকিছু বৈশিষ্ট্যেরই দেখা মেলে। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে যত যন্ত্রণাই পাক সে আবারও ভালোবাসবে। যেমন— উৎপল ও রবি। এই গল্পগুলোর মধ্যে ‘দরদী’ গল্পটা আবার মনুষ্যেতর প্রাণী বিষয়ক। কিশোর সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জনের বেশিরভাগ ছোটগল্পেরই বিষয় কিশোর মনের নানান ওঠাপড়া, দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ মনের টানাপোড়েন, মান-অভিমান-কষ্ট-যন্ত্রণা বিক্ষত মনের প্রকাশ। আদর্শে বিশ্বাস বা প্রতীতি বেশিরভাগ গল্পেরই মূল কথা। ‘‘ঘটনা, চরিত্র, বিষয়— অবলম্বন যা-ই হোক, তাকে একটি নিজস্ব জীবন-বোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত-ভাবলোকে পৌঁছে দেওয়াই ছোটগল্পের কাজ।”[৬]

ছোটগল্পের ‘‘প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী— ক) Story of Incident বা ঘটনামুখ্য গল্প, খ) Story of Character বা চরিত্রমুখ্য গল্প এবং গ) Story of Impression বা প্রতীতিমুখ্য গল্প।”[৭] এই শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ‘ঙ’, ‘দরদী’, ‘উৎপল ও রবি’, ‘ক্যাঙ্গারু’— এই গল্পগুলো চরিত্রপ্রধান। আবার ‘অপরূপ সোনার কাটি’ গল্পে আদর্শ বা প্রতীতিই মুখ্য। গ্রাম আর শহর দুইয়ের মিলিত প্রচেষ্টাই যে একটা দেশের উন্নতির চাবিকাঠি, ‘দেশ’ কথার অর্থ গ্রাম-শহরের যোগফল— এই বিশ্বাসই এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে। ‘কলরব’ গল্পটা আপাতভাবে চরিত্র-নির্ভর মনে হলেও অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান, সাক্ষরতা প্রসার, সর্বোপরি খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা— এই আদর্শই গল্পটার মুখ্য অবলম্বন।

বড় গল্প

বড় গল্পের পরিধি ছোট গল্পের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই বেশি হয়ে থাকে। বড়গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ‘‘এই শ্রেণীর শিল্প-কৃতি উপন্যাসের সগোত্র। বড়গল্প ছোট আকারের উপন্যাস;— উপন্যাসের মতই ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং জটিলতার বিবৃতি (narration) বড় গল্পেরও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, উপন্যাসের তুলনায় বড় গল্পের কাহিনীর (plot) আকৃতিই মাত্র সংক্ষিপ্ত।’’[৮] ‘ফার্ষ্ট্ বয়’, ‘লাষ্ট্ বয়’, ‘তুলির লেখা’, ‘কিশোরদের মন’, ‘কঙ্কালের জাগরণ’, ‘চারু ও হারু’— এই ধরনের বড় গল্প। বড় গল্প হল উপন্যাসের সংহত রূপ। এই গল্পগুলোর সবই বর্ণনামূলক, এতে ‘ঘটনার ঘনঘটা’ আছে, ‘কথাবিস্তার’ আছে। সবচেয়ে বড় কথা উপসংহারে প্রধানত গল্পকারের সিদ্ধান্তই শেষ কথা, পাঠকের অতৃপ্তি-উৎকণ্ঠার অবসান হয়ে যায়। যেমন—

১) অজয় অমলকে গলা জড়িয়ে ধরে’ চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে— ‘‘আজ বুঝলুম রে অমল, তুই কেন First boy…”
(‘ফার্ষ্ট্‌বয়’)

২) পারি তো, আমিও মেজ্‌দার সঙ্গে রাঁচিতে যাওয়ার পথে, সে সময় তোমাদের ওখানে ডাইনিং রুম্‌টে হয়ে যাব! (‘লাষ্ট্ বয়’)

৩) রামলালবাবু হেসে বললেন— ‘‘যা, যা! সবার লেখার উপর টেক্কা দিয়েছে তোর তুলির লেখা।”
(‘তুলির লেখা’)

৪) বিমল বল্‌লে— ‘‘সেই জামাটা, মাকে দিয়ে সারিয়ে নিয়েছি, পিছনে একটা পকেট করে’। আজ ইস্তিরি করে পরেছি তোদের ওখানে যাব বলে!” (‘কিশোরদের মন’)

৫) দুষ্টগুলি আর কি করিবে? এ উহার কানে, ও উহার কানে, চিমটি কাটিতে — লাগিল! (‘চারু ও হারু’)

একটা কবিতা দিয়ে ‘কঙ্কালের জাগরণ’ গল্পের সমাপ্তি হয়েছে।

গল্পগুলো ঘটনাবহুল হলেও ঘটনার মোচড় নেই। চরম মুহূর্তের ‘আবেগের উৎসার’ সেভাবে থাকে না। তবে প্রত্যেক গল্পেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আদর্শের প্রতি আস্থা অথবা কর্তব্যনিষ্ঠা। যেমন— ‘ফার্ষ্ট্‌বয়’ গল্পের মূল বক্তব্য ফার্ষ্ট্‌বয় অমল পড়াশোনায় শুধু নয় সহানুভুতিশীলতা, মানবিকতার দিক থেকেও এগিয়ে। তাই সে ইচ্ছা করে দরিদ্র অমিয়কে

জিতিয়ে দিতে পারে। 'লাষ্টবয়' শুধু তার একাগ্রতা আর অধ্যবসায়ের জোরে প্রথম হতে পারে। 'তুলির লেখা' গল্পের অজিতের ছবি আঁকার প্রতি একাগ্রচিত্ততা, ভালোবাসা ছিল বলেই তার ছবি পুরস্কৃত হয়েছে। ধনীর সন্তান সুবিনয় আর দরিদ্র বিমলের গাঢ় বন্ধুত্বে চিড় ধরলেও শেষ পর্যন্ত এই 'কিশোরদের মন'-এর সব অভিমান ধুয়ে মুছে যায়। 'ক্ষুদে বাল্মীকি' অজিত 'কঙ্কালের জাগরণ' ঘটিয়ে দেশের অতীত ইতিহাসের প্রামাণিকতা সংগ্রহে সহায়তা করে। 'চারু ও হারু' গল্পে রয়েছে দুই বিপরীতধর্মী কিশোরের কথা। শুধু দুই কিশোরের গল্পই নয়, এখানে সমাজ-ভাবনাও কাজ করেছে। ''গল্পের শেষে হারু সোনার পদক পেলেও, চারুকে গাধার টুপি পরানো হলেও সামাজিক বিন্যাস অটুট থাকে, স্থিতাবস্থার কোনো হানি হয় না। হারু রায়তের ছেলে হলেও সুশীল-সুবোধ ভদ্রসন্তানবৎ; চাষির ঘরে জন্মেও কালক্রমে সে যে ভদ্রলোক সমাজে পরিগণ্য হবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।''[৯]

দক্ষিণারঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনা করতে গিয়ে এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন— ''ঢাকার 'তোষণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি মৌলিক শিশু সাহিত্যের অনুপম সৃষ্টি হিসাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আমাদের মনে পড়ে যায় Day রচিত '*Sandford and Merton*' গ্রন্থের কথা। সাদৃশ্যে এবং সমগ্রতায় দুটি গ্রন্থ পরস্পর তুলনীয়। অথচ সব নিজস্ব। কোথাও বিন্দুমাত্র অনুকৃতি নাই।''[১০] এটা 'কিশোর-উপন্যাস' হিসাবে উল্লেখিত। ''ইংরেজি ভাষায় যাকে 'Parable' বলা হয়েছে, বাংলা 'রূপকথা' নামটি হয়ত তাদের পক্ষেই সুব্যবহার্য। Parable রূপক গল্প, সে গল্পে একটি রূপের আধারে নূতনতর আদর্শবোধকেই রূপকাবৃত করে রাখা হয়।''[১১] দক্ষিণারঞ্জন রচিত 'কাজল জল' আর 'সপ্তডিঙা' রূপকথাধর্মী গল্প। 'দাদুর দেশ' গল্পও কিছুটা রূপকথাধর্মী। ''গল্প বলায় এবং গল্প শোনায় মানুষের ঔৎসুক্য চিরন্তন। শ্রোতার মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখাই গল্প রচনার সাফল্য।''[১২] এই গল্পগুলোতেও গল্প বলা ও শোনানোর প্রবণতা কাজ করে যায়। রূপকথার সবটাই কল্পনার ঠাসা বুনটে গাঁথা। নীতির আতিশয্যে কাহিনি বিন্যাসের স্বাধীনতা এখানে খর্ব হয়নি। ''রূপকথার জগৎ একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোক''।[১৩] বিশ্বের আদিমতম কাহিনি-উৎসের ধারা রূপকথার বাধা-বন্ধনহীন কল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে। 'কাজল জল' গল্পে যেমন মানুষের বহুদূর প্রসারিত কল্পনা রাখালের সঙ্গে ধবল পাহাড়ের নীচে ধবল সমুদ্দুরে পৌঁছে যায়। রাজা,

রাজত্ব, ঘাট, হাট, পথ চলার বাট কিছুই নেই, একমাত্র রাজকন্যা রয়েছেন ধবল পাহাড়ের পুরীতে। সেখানে রাখালের বাঁশির মন কেমন করা সুরে রাজকন্যার মন উদাস হয়ে যায়। 'সোনালী ডোরায় ডোরায় সাপ লাখো কমল হয়ে ফুটে' থাকে 'ধবল সমুদ্দুরের দুধজলে!' কাজল নদীর জলে বছরে একদিন রাজকন্যার ভাসানো সুগন্ধী 'অচিন্ ফুলের মালা' রাখাল হাতে পায়।

রূপকথার আড়ালে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত একটা রূপজগৎ আছে। বাস্তবে দৈনন্দিন সংঘাত বিক্ষুব্ধ পরিবেশে, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে যে যে স্বপ্ন মানুষের অধরা থেকে যায় রূপকথার জগতে সে সেই ইচ্ছাপূরণ করতে চায়। 'সপ্তডিঙা' গল্পে যেমন নদীর মোহনা ছাড়িয়ে সাত সওদাগর পুত্রের ডিঙা সমুদ্রে পাড়ি দেয়। এদেশ, ওদেশ, সে-দেশ, বিদেশের হাওয়ায় পাল দুলিয়ে মানুষের মনও চির-অনায়ত্ত সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে পাড়ি দেয়। রূপকথাধর্মী গল্পগুলো ''আমাদের বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক সত্যকেই রূপকের আবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে''[১৪] থাকে। ''ধবল ডিঙায় ধন, সোনালী ডিঙায় সোনা, রূপালি ডিঙায় রূপা, লাল ডিঙায় বণিজ, নীল ডিঙায় খনিজ, পীত ডিঙায় মণি-মাণিক আর সবুজ ডিঙায় ফসল— বাংলা দেশের উপচে-পড়া বেসাত — ঝরো ঝরো হাসিতে, এগিয়ে এসে, ঢেউ ভেঙে চলে ভেসে।'' মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন রূপকথার গল্পে তো রয়েছেই। তাই এই উচ্ছ্বাস চিরস্থায়ী হয় না। প্রবল ঝড়ে 'সাত সাগরের মুখ উথলে' 'সপ্তডিঙার বহর' ডুবে যায়। তবু বাংলাদেশ, তার সওদাগরেরা রয়ে যায়।

'দাদুর দেশ' গল্পে রাক্ষসের দল, সোনালী পর্বত, রূপসাগরের জল, মণি-মাণিক, আশ্চর্য সুন্দর পরীদের দেশ, সবুজ শাড়ি-পরা রানীর মত দেবী, পদ্ম সরোবর— এসব আসলে যথাক্রমে—

১) 'পাখাওয়ালা হাতীর মতো মশার দল', 'অক্টোপাশের মতো' মাকড়সা, 'বিশাল এরোপ্লেনের বহরের মতো' আরশোলার ঝাঁক।

২) বাংলার পাহাড়-পর্বত বিশেষত সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা।

৩) সমুদ্র তথা নদীমাতৃক বাংলাদেশ।

৪) প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বাংলার শিশু কিশোরের দল।

৫) 'সকল দেশের সেরা' বাংলাদেশ।

৬) 'সবুজ বাংলা মা'।

৭) শিশু-কিশোরের 'বাড়ির দীঘি'।

এছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশের 'ঝিঁঝির তান, পাখীর গান, সাঁঝ-হাওয়ার মধুর বাঁশি', ''ভোরের সূর্যের মতো সোনালী, দুপুরের সূর্যের মতো দীপ্ত, আর রাত্রির চাঁদের মতো অমৃতে মাখা'' বাংলাভাষা। রূপকথা যে আসলে রূপকও 'দাদুর দেশ' গল্পটা একেবারে সরাসরি সেকথা বুঝিয়ে দেয়। রূপকথার মধ্যে রচয়িতার কল্পনার ঐশ্বর্য যেমন অসীম তেমনি অন্তর্নিহিত বক্তব্যও বিবিধ। শুধু শিশু মনের উপযোগী ক'রে তোলার জন্য এই বক্তব্যকে রাক্ষস-খোক্কস, রাজা-রানী, দৈত্য-দানব, সোনার কাঠি-রূপোর কাঠির মোড়কে হাজির করা হয়েছে। ''আশা-আশঙ্কা মিশ্রিত শিশুমনের বিচিত্র স্পন্দিত ভাবাবেগের সঙ্গে এই ভঙ্গীটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে''।[১৫]

২. <u>গল্পরচনার রীতি</u>

রীতি আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে গল্পের ভাষা, ইমেজ, সূচনা/ সমাপ্তির কৌশল, বৈশিষ্ট্য।

ভাষা

দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর নিজস্বতা। এত সহজ সরল সাবলীল ভাষায় গল্প রচনা করেছেন যে মনে হয় গল্প পড়ছি না— যেন শুনছি। প্রত্যেক গল্পেই যেহেতু কিশোর-বালকই গল্পের মুখ্য চরিত্র তাই তিনি ঠিক তাদের পড়া ও বোঝার উপযোগী করেই গল্প লিখেছেন। সামগ্রিক বিচারে তাঁর ভাষা ব্যবহারের কিছু বিশেষত্ব আছে।

১) তিনি যথেচ্ছ পরিমাণে 'হসন্ত' (্)-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন— উঠ্ল, কর্লেন, খেলব্না, জিজ্ঞেস্, জান্ত, নিঝ্ঝুম, পেন্সিল্, পূর্বার, ফির্তি ইত্যাদি।

২) বেশ কিছু শব্দ তাঁর নিজের উদ্ভাবন। যেমন— অফুরণ, আখর, আভ্, উঁচো, কানুটি, ঘাট্‌লা, চৌছত্রি, চাঁপন, চিরুণ, চুলোটি, চল্-খল্, টুব্‌টুব, ঠি ঠি, তেউন, তয়ের, বোঠকখানা, বণিজ, সবুজিমা, সোঁত ইত্যাদি।

৩) আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন—

অশথ	চোক	পরীক্ষে	সমুদ্দুর
অষুদ	চাচ্ছিল	পহর	
আগুন	চোম্‌ড়াচ্ছে	পান্‌তো	
আঁধিয়ার	ছাত্তর্	পারলেনা	
উছল	তয়ের	পূর্‌বার	
কচ্ছ	তা'পর	পেন্‌সিল্‌টে	
কবিতে	দিলুম	পেলেম	
খেল্‌তেম	দেই নাই বইটে		
গে	দেখ্‌লেম যেতেম		
ঘুমুচ্ছ	নাইব না সবি		

৪) হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেছেন দক্ষিণারঞ্জন। যেমন—

- বিমল সুবিনয়ের বাড়িতে গেলে বেয়ারারা বলে— ''বাবুজী, পের্‌ণাম; বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে!'' ('কিশোরদের মন')
- মণিমাণিকরা জিজ্ঞাসা করল— ''ফোঁটাতে কী হোবে দাদু?... ফোটা কৌন চীজ আছে দাদু?'' ('দাদুর দেশ')
- দারোয়ান রবিকে হেঁকে বলে— ''খো-খা-বা-বু-কা 'অ-সু-খ' হুয়া! কাহেকে ওয়াস্তে বিমার হোগা? সমঝ্‌তে যো তোম্‌কো সাথ মে ঔর ঘুড্ডি ওয়ানে যায়গা?—'' ('উৎপল ও রবি')
- ''ছোড়্ ধীন্! বাবুলোক বকে গা!...'' ('দরদী')

ওপরের উদাহরণগুলো লেখকের হিন্দি ভাষা চর্চার সাক্ষ্য দেয়। হিন্দি ভাষা প্রয়োগে চরিত্রগুলোও অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবোচিত হয়েছে।

৫) বাক্য গঠনে নিজস্বতা লক্ষণীয়। যেমন—

- পড়াশুনোয় ইংরেজিটা সে খুব ভালো জান্‌ত। ('কিশোরদের মন')

- ডঙ্কার ঘায়ে ঘায়ে নদীর দু'পাড়, ডগমগ ডগমগ ডগমগ ডগমগ। দুধারে লোকজন জীবজন্তুর কাতার। পাখীর কলরব। হাওয়া গম্‌গম্‌।...

  ধবল ডিঙায় ধন, সোনালি ডিঙায় সোনা, রূপালি ডিঙায় রূপা, লাল ডিঙায় বণিজ, নীল ডিঙায় খনিজ, পীত ডিঙায় মণি-মাণিক আর সবুজ ডিঙায় ফসল— ('সপ্তডিঙা')

- —সে ডান পা চেপেই দাঁড়ায়, সে... পা-টাকে ঘুরোতে গিয়ে, পৃথিবীতেই উল্টোলো আগে। ('ক্যাঙ্গারু')

- আর, অজয় আর অমল প্রমোশন পেয়েছে বয়েজ ইস্কুলে, ফোর্থ ক্লাসে, অমল— সবার ফার্ষ্ট্‌ হয়ে।...

- "কি আজ হয়েছে, অণু?— মা?" ('ফার্ষ্ট্‌ বয়')

- "তাতেও কোন্‌, না চলে যাবে?" ('তুলির লেখা')

৬) মিশ্র শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

কেউ Hungry (হাংরি), কারো ভুখ্‌, কারো নিদ্‌, Mamma (মামা), hurry up, hurry up, hurry up (হারি আপ্‌, হারি আপ্‌)!...

- কোনটা বোঁ বোঁ বন্‌ বন্‌, কোনটার নাম লজেন্স, কোনটা বিস্কুট, কোনটা নন্সেন্স। একজন দিলে কেক, কিক, আর একজন দিলে বুলেট, চকোলেট, একজন বের করলে কোট, মোট, লোড, ভোট, এই সব পোশাক। ('দাদুর দেশ')

৭) দক্ষিণারঞ্জন যে হাস্যরসিক ছিলেন তাঁর রচিত গল্পগুলো তার প্রমাণ। তাঁর গল্পে হাস্যরসের বিস্তর উদাহরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি রীতিমত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

ক) Wit বা বুদ্ধির তরবারি চালনার নিদর্শন—

- সুবিনয় ছিল ক্লাসে বিখ্যাত দাতা ছেলে। ছুরিটে, পেন্‌সিল্‌টে, বইটে, খেলার কি পিক্‌নিকের চাঁদা, এ তার কাছে একবার চাইলেই হ'ত। এই জন্যে ছেলেরা তার 'কামধেনু' বা ক্লাসের Cow নাম দিয়েছিল।

  ...বিমলের ছিল এক অদ্ভুত বেশ। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায় দিয়েই প্রায় আস্‌ত। পাঞ্জাবিটার পিঠের মাঝখানে, India-র ম্যাপের মত খানিকটে জায়গা কি করে' উড়ে গিয়েছিল। এই জন্যে হরেন্‌ তাকে ডাক্‌ত— 'দেশী জিওগ্রাফি'। ('কিশোরদের মন')

খ) হিউমারও প্রচুর। যেমন—

- টিকিদের ফর্‌ ফর্‌ আর তর্জন, দুই-ই, বিসর্জন হয়ে গেছে। ঝুলে দুলছে গোঁফেরাও, কেউ তালপাতার ঝাঁকের মতো, কেউ বাবুইয়ের বাসার মতো। আর দাড়ির রাজ্য যেন পদ্মার সোঁতের মতো, এই শীতে চিতিয়ে নেতিয়ে চলেছে কোন্‌দিকে! ('দাদুর দেশ')

- সে বলে, পেটের তিনটে কুঠুরির কিছু দূর ভরতে পারো। একটা একেবারে খালি রাখতে হবেই। আমরা উঠি হেসে। বলে ফেলি যে, তাই তোমরা মাঝে মাঝে চারটেই খালি রেখে, ওষুধের বড়িকে পাঠাও সেখানে দেশভ্রমণে। ('কলরব')

- এরি মধ্যে দেখা গেল, সারা কলকাতাও প্রায় ক্যাঙ্গারুর দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। বোমা না আসতেই বাসে-ট্রামে ঝুলছে লোক। স্টেশনগুলোতে, পথে-ঘাটে, কারু পা আর মাটিতে নেই। ক্যাঙ্গারুর মতই, প্রিয় জিনিষগুলোকে থলের ভিতর পূরে, লোক নিরুদ্দেশ হতে চাইছে।" ('ক্যাঙ্গারু')

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সমকালের গুরুগম্ভীর বিষয়কেও বেশ সহজভাবে হাস্যরসের মোড়কে পরিবেশন করেছেন। এরকম আর একটা উদাহরণ হল—

- কিন্তু ঠুণ-ঠুণওয়ালা ঝুন-ঝুনওয়ালা কেউ কোথাও নেই যে সঙ্গে সুর বাজিয়ে চলবে। যুদ্ধের বাজার থেকেই ঠুণ ঠুণ ঝুন ঝুন নেই। ছিল সব গুম্‌ গুম্‌-এর ব্যাপার।" ('দাদুর দেশ')

- নিউটন নাকি জেদ্‌ করে' 'নিউটন' হয়েছিলেন; মেজ্‌দার কথাটা আমার মনে ছিল। আমিও ভাব্‌লেম, আমিও আমার মনটাকে সত্যি সত্যি 'নিউ টোন্‌ (New Tone) দেবো!' ('লাষ্ট্‌বয়')

৮) দক্ষিণারঞ্জন শব্দ নিয়ে খেলা করতেন, সেইসঙ্গে তাঁর নিজস্ব শব্দ ব্যবহার তো রয়েছেই। এর দ্বারা গল্প পাঠের সময় দৃশ্যগত প্রত্যক্ষতা তৈরি হয়। যেমন—

- ডঙ্কার ঘায়ে ঘায়ে নদীর দু'পাড় ডগমগ ডগমগ ডগমগ ডগমগ। ...হাওয়া গম্ গম্। ...ঢালী-লাঠিয়াল মাল্লামাঝির হল হল্, কলকল্। ('সপ্তডিঙা')
- শুধু হাওয়া হুস হুস করতে লাগল। ('দাদুর দেশ')
- পরীক্ষা-টরীক্ষা ভুলিয়া গিয়া ধিড়িং ধিড়িং নাচ!! ('চারু ও হারু')
- দেখলে কতক্ষণ রাখাল, গন্ধে 'ম' হয়ে, দেখলে 'থ' হয়ে। ...রাখালের গাই চরে গন্ধ ছম্ ছম্ মাঠে। ...রোদে ধব্ ধব্, ছায়ায় চল্-খল্। ('কাজলজল')

এই গল্পে এইধরনের শব্দ ব্যবহারের নিদর্শন অনেক।

- কিসের চিরুণ দাঁতের দাগ।
- মা বৌয়েরা ফির্তি সুরের চাঁপন বাঁশী আবার শুনল বিলের পাড়ে।
- দু'সারে বর্শা, শূল, ঢাল, খড়্গ ঝগ্-ঝগ্ করছে।
- পিছে দু'সারে মশাল, ঝিক্-ঝিক্ ঝিলিক্-মিলিক্!

অথবা

- দাঁত করে কড়্মড়্, গা করে গস্-গস্।
- গাছে নেই পাতার পোম্ ('কাজল জল')

—এই ধরনের ভাষা ব্যবহার একেবারেই স্বতন্ত্র। একে দক্ষিণারঞ্জনী ভাষা বলা যেতে পারে। বোঝা যায় ভাষার ক্ষেত্রেও দক্ষিণারঞ্জন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যেমন-তেমনভাবে বা ভাবনা-চিন্তা না করে শুধু লিখতে হবে বলেই লেখেননি। তাঁর রীতিমত গবেষণার প্রয়াস সর্বত্র।

ইমেজ

কবিতার তুলনায় দক্ষিণারঞ্জনের গল্পে ইমেজ বা চিত্রকল্পের ব্যবহার কম। ইমেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুনরায় লেখক দক্ষিণারঞ্জনের গভীর জীবন-দর্শন, সংযত বাক্-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিশোরদের মন' গল্পে—

- ''বিমল দেখছিল 'উঠোনের ঝল্‌ক দেওয়া রৌদ্রের সমুদ্রের শ্বেত পদ্মফুলের মত তার মাকে।''
- লম্বা ট্রেনটা ''কেবল ভোর হচ্ছে না দেখে মোষের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে'' মাঠ মাটি সব রাগে গুঁতিয়ে শুধু গর্জাচ্ছে।
- বিমল ''ছুট্‌ল আম কাঁঠাল বট কদম পাকুড়ের ছায়া ঢাকা পথ ধরে' যেন দু'সারি সৈন্যের ভিতর দিয়ে সেনাপতি রাজবাড়ীতে চলেছে।''
- সুবিনয়ের চিঠির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ''কতক্ষণ পরে পকেট থেকে একখানা খাম— আর তার ভিতর থেকে কাগজ, দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতই, একটার পর একটা,—''
- ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ''ছুটির ক'দিনই বা আর? সে কটা দিন যেন ঠিক ছেঁড়া কাগজের নিশানের মত খসে' খসে' পড়্‌তে লাগল। রং ফ্যাকাসে হয়ে।''

তবে অনেকটা যেন স্পষ্ট এই ইমেজ ব্যবহার। 'দাদুর দেশ' গল্পেও বেশ কিছু ইমেজ চোখে পড়ে। যেমন—

- খাবারের ঝুড়ি ফাঁকা হয়ে ''সব গিয়ে ঢুকেছে উড়ে টুড়ে সেই সব ক্যাঙ্গারু-পকেটে আর ফানুসী-পকেটে!''
- এই গল্পে মশা, মাকড়সা, তেলাপোকা ইত্যাদি কীট-পতঙ্গের তুলনা দেওয়া হয়েছে এভাবে: ''ভোঁ ভঁ - ভন্ করে ঘুড়ে পাখাওয়ালা হাতীর মতো মশার দল আসছে তাদের আগে আগে, সঙ্গীনের মতো শুঁড় তাগ করে। দু'পাশে অক্টোপাশের মতো মাকড়, আর, তেলাপোকার ঝাঁক বিশাল এরোপ্লেনের বহরের মতো পিছনে। বোমার মতো ফেটে হিল্ হিল্ হিল্ করে ছুটেছে হাওয়া ... বাতাস পাগল করে সব উড়ুক্কু সাপ।''

- ‘সবুজ বাংলা মা’-কে বলা হয়েছে ‘সবুজ শাড়ি-পরা রাণীর মতো এক দেবী’। তিনি ‘‘বাংলার অফুরণ সবুজিমা, উথলিয়ে দিলে জলের অথৈ ঢেউয়ের নাচন।’’

- ‘‘অমল আর অণিমার পড়ার ঘরখানি ছিল যেন বিদ্যার পদ্মবন। ঠিক, দুই ভাই বোন্ যেন সেই পদ্মবনে, দুটি ছোট্ট রাজহাঁসের মত, বিদ্যার সরোবরে সাঁতার কাট্‌তে নেমেছে।’’

(‘ফার্ষ্ট্ বয়’)

- ‘‘হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বেতগাছা, যেন ইস্পাতের তরোয়ালের মত দুটো বেঞ্চকে, একেবারে আলাদা করেই রাখ্‌ল! যোগেশ দিনের পর দিন, তার পড়ার নৌকাখানি, বেয়ে ছুটিয়ে চল্‌ল, আর আমি, সেই ক্লাসেই, শুক্‌নো বাঁশের মাস্তুলের মত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটালেম।’’

- লাষ্ট্ বয়ের ব্যাট ছিল ‘‘উটেরি কাছে ঘোড়াগুলোরই মত।’’

- আর পড়াশোনাকে ভালোবাসতে শেখার পর ‘‘বইয়ের আলমারিটা যেন আমার কাছে, আমার ব্যাটখানারি মত হয়ে গেল! ডিউস্ বলের মত শক্ত পড়াটাকে, হীট্ করে’ উড়িয়ে দিয়ে, আমার রাণ্ এবার সুরু হল!’’ (‘লাষ্ট্‌বয়’)

- ‘‘কিন্তু বোর্ডখানা যেন নীল আকাশের মত কোল পেতে সাদা বকের পাখার মত আমার ঘড়ির আঁকগুলো নিয়ে একেবারে খুশিতে হেসে উঠ্‌ল! ...সবগুলি চোখ যেন শুধুই ঝিলের পদ্মফুলের মত ফুটে রইল! শুধু হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের, চোকের পাতা দুটি নদীর ধারের ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় দোলানো গাছের পাতার মত কাঁপছিল।’’ (‘লাষ্ট্‌বয়’)

‘কাজল জল’ গল্পে আছে রাখালের বাঁশীর কথা, ‘‘নদীর পাড়ে বটপাকুড়ের ছায়া বাঁশীর সুরের মৌচাক হয়ে থাকে।’’ এই গল্পে চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। যেমন—

- ‘‘খৈ-ফোটা ঢেউ সোনায় সোনায় সোনালী হয়ে গেছে সেই ফুলের পাপড়িতে ঢেউয়ের দোলা নাচিয়ে, রোদের ঝলক হাসিয়ে মালা এসে ঠেক্‌ল বালির চড়ায়, যেন বালির দেশে কোন্ গন্ধ পাখীর সোনার ঝাঁক এসে বসল!’’

অথবা

- ‘রাখালের গাই চরে গন্ধ ছম্ ছম্ মাঠে’।

কিংবা ‘অপরূপ সোনার কাটি’— যা ঘুমন্ত মনকেও জাগিয়ে দেয়। এ সবই অসামান্য চিত্রকল্প। সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কিশোর-বালক-শিশুদের বয়সোপযোগী চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, শিশু-কিশোরের দল যাতে সহজেই বোধের আয়ত্তে আনতে পারে।

সূচনা সমাপ্তির কৌশল, বৈশিষ্ট্য

গল্পের ধরন অংশে আলোচিত হয়েছে ছোটগল্পের চমকিত সূচনা এবং পূর্বঘটনা সূচক আরম্ভের কথা। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ‘উৎপল ও রবি’, ‘ক্যাঙ্গারু’, ‘কলরব’, ‘অপরূপ সোনার কাটি’ চমকিত সূচনা এবং ‘ঙ’, ‘দরদী’ পূর্ব সূচনার ছোটগল্প। আর ছোটগল্পের উপসংহারের ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’ বৈশিষ্ট্য উপরে উক্ত সব ছোটগল্পেই বর্তমান।

বড়গল্প যেহেতু বর্ণনামূলক তাই ‘ফার্স্ট্‌বয়’, ‘লাষ্ট্‌বয়’, ‘তুলির লেখা’, ‘কিশোরদের মন’, ‘কঙ্কালের জাগরণ’, ‘চারু ও হারু’ গল্পগুলোর সূচনাও বর্ণনাধর্মী। যেমন—

- পড়াশুনোয় ফার্স্ট্ অমল আর বীরত্বে ফার্স্ট্ অজয় এক ক্লাসে দুজনে পড়ে। দুজনেই খুব বড় জমিদারের ছেলে। খুড়্তুত জেঠতুত ভাই; পাশাপাশি তাদের বাড়ী। (‘ফার্স্ট্ বয়’)
- বড়দিনের ছুটি হয়ে গেল। অতুল, মামার সঙ্গে মধুপুরে যাবে তার আয়োজন হচ্ছে! (‘তুলির লেখা’)
- রূপনাথপুর— কৃষ্ণরায় জমীদার চৌধুরী ঠাকুর। ঐশ্বর্যের তাঁহার সীমা নাই। (‘চারু ও হারু’)

আর উপসংহারে কৌতুহলের নিরসন— এই বৈশিষ্ট্য গল্পগুলোতে বজায় রয়েছে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

‘কাজল জল’, ‘সপ্তডিঙা’ রূপকথাধর্মী। ‘দাদুর দেশ’-ও আংশিক রূপকথাধর্মী। রূপকথার গল্পের শুরুতে থাকে যে ‘এক যে ছিল’ ভঙ্গি, সেভাবেই শুরু হয়েছে ‘কাজল জল’। যেমন— ‘সে, এক রাখাল। রাখালী করে মাঠে।’ তবে ‘সপ্তডিঙা’র সূচনা এরকম— ‘‘বাঁশির সুর। দু’টি বাঁশি। নদীর ঢেউয়ে আর বাতাসের ঢেউয়ে কেঁপে কেঁপে... কেঁপে কেঁপে দুই সুর মালা গেঁথে চলে।’’ ছোটগল্পের ‘চমকিত সূচনা’র মত। শুধু তাই নয়, অনেকটা যেন ব্যঞ্জনাধর্মী। ‘দাদুর

দেশ' গল্পের শুরুটা— ''একদিন, সূর্য কেবল উঠে বসেছে। এই সময়ে দেখলেম, তোমাদের আমন্ত্রণ, গেল এসে।'' এও তো রূপকথার গল্প বলারই ধরন।

'কাজল জল' গল্পের শেষ— ''আলোর সোনায় মাটী হাসে, কন্যা আসেন; বাতাস ছেয়ে যায় রাখালের মোহন বাঁশীতে আর ঢেউয়ে নেচে কাজল-জল নদীর তর্‌তর্‌ কালো কাজল জল, ধেয়ে চলে উধাও ছুটে'— রোদ পহরের ঝলক লুটে'— যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে নীলা কপিলা ধবলী গাই, কখন্‌ রাখালের বাঁশি শুন্‌বে বলে'!'' রাজকন্যার আগমনে মাটি, বাতাস সহ চারপাশের প্রকৃতি জেগে ওঠে। একটা সমাধানের পথ খুলে গেছে এখানে। 'সপ্তডিঙা' গল্পের সমাপ্তি— ''কেবল, দারুণ ঝড়ের রাতে— বাংলা-সাগরের জোর হাওয়ায় শোনা যায় বাঁশির সুর, কোন্‌ সে দিনের যেন কিশোর সওদাগর আর কাঞ্চনের! যেন সে গান বলছে, আমরা ফিরব, ফিরব, ফিরব, যে বাঙালী, খুঁজতে আসবে আবার সপ্তডিঙা, ফিরব তারি সঙ্গে।'' প্রতীকী উপসংহার। এখানে বাংলাদেশের কিশোর সওদাগর, কাঞ্চন তথা বাংলা, বাঙালীর চিরজীবী হওয়ার কামনা, আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে।

'দাদুর দেশ' গল্পের শেষাংশে বাংলার ছেলেমেয়েরা 'বন্দেমাতরম্‌' গেয়ে উঠেছে। আর সমাপ্তি অংশে আর একটা গান রয়েছে—

বাংলা আমার! বাংলা সোনার!
জন্মভূমি
... ...
বাংলা আমার! বাংলা সোনার
অমৃতভূমি!

দুটো গানেই বাংলা মায়ের স্তুতি উচ্চারিত।

শুধু এই গল্পেই নয় দক্ষিণারঞ্জনের বেশ কয়েকটা গল্পের শুরুতে, মাঝখানে অথবা শেষাংশে গান বা কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'সপ্তডিঙা' গল্পের মাঝে 'সমুদ্রে সমুদ্রে' শোনা যায় 'বাংলার সুর'—

শুকতারা আর চাঁদ, সূরয,
দিকপবন— সাথী!

... ...

জাগর গানের ডাক দিয়ে যায়

সপ্তডিঙার সুর!

শুকতারা, চাঁদ, সূর্য, দিক্‌পবনকে সঙ্গে নিয়ে সাত সমুদ্রে বাংলার বাণিজ্য চলে। সেখানে 'মেঘমালা' শঙ্খ, 'বাউল জল' ডঙ্কা বাজায়। লক্ষ্মী উজাড় করে ধনসম্পদ দেন। সাত সমুদ্রের তীরে ঘুমের রাজ্যে 'সপ্ত ডিঙার সুর' জাগরণী গান শোনায়।

'দাদুর দেশ' গল্পের শেষ ছাড়া মাঝখানেও গান শোনা গেছে পরীর ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে—

—অচিন দেশে যাচ্ছি মোরা

যাচ্ছি অচিন পথে বিশ্বশিশুর দল

....

নচীন নদীর স্বপন নূপুর বাজছে কলোকল!

এই গান/ কবিতা দক্ষিণারঞ্জনের '*সবুজ লেখা* ' গ্রন্থে 'অচীন পথে' নামাঙ্কিত কবিতা। এর বক্তব্য বিষয় শিশু, কিশোর, তরুণ দলের জীবনের চলমানতা, ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ না থেকে 'অচিন দেশে' পাড়ি দেওয়া।

'অপরূপ সোনার কাটি' গল্পের শেষের দিকের কবিতাংশ—

দেশের প্রদীপ তুমি,

আকাশ, বাতাস, ভূমি—

....

—ঘুচাও অন্ধকার!

এই কবিতাংশের অর্থ শুধু নিজের জন্য নয়— দেশের জন্য, সবার জন্য 'সত্যি-মানুষ' হতে হবে। 'কলরব' গল্পের মাঝে এবং শেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ছত্র ব্যবহৃত হয়েছে—

না। এবং না। এখন থামো।

আর একটু খাও কম।

দুবেলা যা হজম করো

তারো কিছু, / (অনেক)

ছেড়ে দাও... বরং।।

খাদ্যের অপচয় করা উচিত নয়। পরিমিত আহার করে বাকি আহার বা খাদ্যদ্রব্য দেশের বুভুক্ষু মানুষকে দান করলে সকলেই উপকৃত হবে। দেশের কোন মানুষ খাদ্যবস্তু নষ্ট না করলে দেশের কোন মানুষও অনাহারের কারণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে না।

'কঙ্কালের জাগরণ' গল্পের মাঝখানে অজিতের লেখা কবিতার দু'ছত্র মাত্র পাওয়া যায়—

হীরের আংটি, শাল দোশালা নিলে জোড়া জোড়া।

সোনার পিদিম, চৌছত্রি, উড়ন্ত ঘোড়া।।

তার বন্ধুরা এর সঙ্গে জুড়ে দেয়—

সেই ছত্র মাথায় আর সেই ঘোড়াটায় চেপে,

উষ্ট্রগড়ের দেশে গিয়ে কবি গেলেন ক্ষেপে।

বন্ধুরা রসিকতা করে ছত্র দুটো লিখলেও পরে অজিতের ক্ষেত্রে ছত্র দুটো সত্যি হয়ে যায়। সে উষ্ট্রগড়ে নয়, বিষ্ণুপুর সহ বাংলার বিভিন্ন রাজার গড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

অজিতের অপর এক বন্ধু লিখেছিল—

শাখে শাখে পাখীগণ

....

দোর দিলে খুলি!

এও নিছক রঙ্গ নয়, অজিত পরবর্তীকালে বিজ্ঞান তথা নৃতত্ত্ববিদ্যার মনোযোগী শিক্ষার্থী হিসাবে সাফল্য পায়। শেষে অজিতের লেখা কবিতা সুপ্রিয় ছন্দিত করে সাজিয়েছে—

অতুল গঙ্গা,

উথল পদ্মা,

হে দামোদর! জাগো হেসে!

....

....

জননী আমার!

তোমারি নামের

সুপ্রভাত।

বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান অজিত শুধু বাংলা নয়, ভারতমাতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহিমা কীর্তিত করেছে।

'চারু ও হারু' গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রায় প্রথম থেকে সপ্তম অংশের প্রায় শেষ পর্যন্ত চারু ও হারুর বিপরীতধর্মী পরিবেশে বেড়ে ওঠা, বিপরীত স্বভাব-ধর্মকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক ছত্র ব্যবহৃত। যেমন—

একমাত্র পুত্র— 'চারু' খোকন্ সোনামণি

আদরে তাহার পদ ছোঁয় না ধরনী।

অন্যদিকে 'পরাণ ডাকে', — "হারু!"

তা'র

একটি মাত্র ছেলে 'হারু' আর কেহ নাই।

পরাণ যায় হালে; সাথে হারু রাখে গাই।

এভাবে যতদিন চারুর শিশুসুলভ মন ছিল ততদিনই দুজনকে নিয়ে নানান ছত্র লেখা হয়েছে।

'লাষ্ট্‌বয়' গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশে 'লাষ্ট্‌বয়'-এর লেখা কবিতা—

মানুষ হবে মানুষ!

....

থাকবে বুকে

ব্লাড্ এণ্ড ফ্লেশ্;

....

—নেইক ক্লেশ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রায় শেষাংশে 'লাষ্ট্‌বয়' 'ফার্ষ্ট্' হয়ে লিখেছে—

'ব্লাড এণ্ড ফ্লেশ্

চাই তো বটেই,

মনকেও চাই

উঁচোয় তোলা;

....

মানুষ হবেই!

....

বুঝেছি, চাচ্ছ!

এই কবিতার তাৎপর্য হ'ল শুধু রক্তমাংসে গড়া মানুষ হলেই হবে না, মনকেও উদার করতে হবে। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালাতে হবে। এর জন্য শরীর ও মন দুয়েরই সহযোগিতা চাই।

দক্ষিণারঞ্জনের গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর একটা কথা বলা যেতে পারে। দক্ষিণারঞ্জন কখনো কখনো কথকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেই ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলে ফেলেন— ''অন্যায় করিয়া হারুকে মারিয়া আজ তাহাই লইয়া ঠাট্টা করে, নিজেরা যে চুরি করিতে গিয়া কালিমাখা-মুখে সং সাজিয়াছিল দুষ্টগুলা দু'দিনেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। হায়। উহাদের কি লজ্জা আছে?" চারু এবং তার বন্ধুদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে পরে আবার বলেছেন—

> পাখীর ছানাগুলি আনিয়া তাহাদের ডানায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া নেয়, কোনটির পায় সূতা বাঁধিয়া উড়াইয়া দিয়া মজা দেখে। উহারা চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আর যখন পারে না, মরিয়া যাইবার মতন হয়, তখন সেগুলিকে নিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ায়। ছি, ছি, কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! ('চারু ও হারু')।

মলিনার বিবরণ দিতে গিয়ে গল্পকার গল্পের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বলেছেন— ''আরও এক দোষ। পরে সে কি রকম মেটে রঙের শাড়ী। ওমা, তাই পরেই ইস্কুলেও আসে। দেখা যায় যেন ঠিক একটা ঝির মেয়ের মতই" ('ঙ')। এখানে তিনি সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

৩. <u>চরিত্রায়ন</u>:

দক্ষিণারঞ্জন রচিত গল্পের চরিত্রায়ন বা চরিত্র নির্মাণের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, যা পূর্বেও উক্ত হয়েছে তা হল কৈশোর বয়স বা বাল্যকাল কেন্দ্রিকতা। অধিকাংশ গল্পেই ''বালক-বালিকা আর কিশোর চরিত্রগুলির মনের সংঘাত বেধেছে তাদের পারিপার্শ্বিক ও বড়দের সমাজের সঙ্গে। তাদের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত বলেই তারা আঘাত পায়, যন্ত্রণা পায়, আর সেই ব্যথার গল্প হয়ে ওঠে আধুনিক অর্থে ছোটগল্প।"[১৬] গল্পগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই

এসে পড়েছে বয়সসুলভ মান, অভিমান, ভালোবাসা, আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়তা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ইত্যাদি। 'কিশোরদের মন', 'সপ্তডিঙা', 'দাদুর দেশ', 'অপরূপ সোনার কাটি', 'কলরব', 'কঙ্কালের জাগরণ', 'চারু ও হারু', 'উৎপল ও রবি', 'ক্যাঙ্গারু', 'ফার্স্টবয়', 'লাস্টবয়', 'কাজল জল', 'ঙ', 'দরদী', 'তুলির লেখা'— এ সবই কৈশোর বা বালসুলভ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। অনেক গল্পেই দুটো বিপরীত বা সমধর্মী চরিত্রের পাশাপাশি অবস্থান। যেমন— সুবিনয় ও বিমল ('কিশোরদের মন'), দীপু ও অতুল ('অপরূপ সোনার কাটি'), উৎপল ও রবি ('উৎপল ও রবি'), অজয় ও অমল ('ফার্স্টবয়') — সমমনোভাবাপন্ন হওয়ার কারণে এদের বন্ধুত্ব । আবার বিপরীত স্বভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত চরিত্র চারু ও হারু ('চারু ও হারু')। জমিদার তনয় চারু পড়াশোনায় অমনোযোগী। বন্ধুদের সঙ্গে সে খেলে বেড়ায়, পশু-পাখীকে নিপীড়ন করে, অন্ধ ভিক্ষুককে হেনস্থা করে। অন্যদিকে দরিদ্র পিতার সন্তান হারু লেখাপড়াসহ সবক্ষেত্রেই পারঙ্গম, পরোপকারী। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর প্রণীত '*বর্ণপরিচয়* ' গ্রন্থের গোপাল ও রাখালের কথা মনে পড়ে যায়। সুবোধ ছেলে গোপালের সব বৈশিষ্ট্যই হারুর মধ্যে বর্তমান। অন্যদিকে চারু যেন ঐ রাখালের মতই অবোধ বালক। ''এটি একটি স্কুল টেল— গরিবের প্রতি দরদ এবং সততা ও পরিশ্রমের মূল্য এতে প্রকাশ পেয়েছে।'' তবে সব গল্পই কোন না কোন আদর্শের কথা বলে, কোন না কোন ঐতিহ্যের উত্তরসূরী। সুবিনয় ও বিমলের বন্ধুত্বে অর্থ, প্রতিপত্তি, পারিবারিক মর্যাদা কোন বাধাই নয়। আবার বড় মেসোমশায়ের বাড়িতে প্রচুর বিলাসিতা, বৈভবের মধ্যে মানিয়ে নিতে পারে না দীপু। গ্রামের সহজ সরল মাটির গন্ধমাখা পরিবেশেই তার মুক্তি। সে গ্রাম আর শহরকে মিলিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে, উপলব্ধি করে এ দুইয়ে মিলেই দেশের পরিপূর্ণতা, অনুভব করে প্রকৃত 'মানুষ' হওয়ার তাৎপর্য। জমিদারপুত্র উৎপলের সঙ্গে দরিদ্র বিধবার সন্তান রবির বন্ধুত্ব ভালো চোখে দেখেনি উৎপলের পরিবার। বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে উৎপলকে শহরে পাঠিয়ে দিলেও উভয়ের মনের মধ্যে প্রাচীর তুলতে পারে না। অমল তার উদার মনের পরিচয় দিয়ে দরিদ্র বন্ধু অমিয়র শিক্ষাকে অবৈতনিক করানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষা খারাপ দেয়। এখানে সত্যিই সে ফার্স্টবয়। এই যে বন্ধুত্বে অচল অটল অমল থাকা— এও তো এক ধরনের আদর্শ। 'লাস্টবয়' অনেক অধ্যবসায়, যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় ফার্স্টবয় হয়ে যায়। 'সপ্তডিঙা' বাংলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব, বাঙালির চিরন্তন গৌরবের প্রতীক। 'দাদুর

দেশ’ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মানবিকতাসহ বিভিন্ন স্বপ্নপূরণের দেশ, মধু মাখা বাংলা ভাষার সাহায্যে সে স্বপ্নের জাল বোনা যায়। ‘কলরব’ গল্পের অহীন্দ্র আর অনিতা দুটি বালক-বালিকা দেশের মূল সমস্যা— দারিদ্র্য, অন্নাভাব, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদির সমাধানের প্রচেষ্টা করে। ক্ষুদ্র হলেও মহৎ এই প্রচেষ্টা। তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’র অহীন্দ্রকে এ প্রসঙ্গে মনে পড়তেই পারে। সেও তো গ্রাম পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিল। ‘কঙ্কালের জাগরণ’ ঘটিয়ে অজিত বাংলা তথা ভারতের অতীত ইতিহাসের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালায়। করালীকিঙ্কর ওরফে ক্যাঙ্গারু বোমারু বিমানের ফেলে যাওয়া বোমা দুহাতে তুলে মাঠের বাইরে ফেলে যথার্থ বীরের কাজ করে। দরিদ্র মলিনা ‘মানুষ’ হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে হিমানীর প্রতি তার মানবিক মুখটা বাড়িয়ে দেয়। অজিত প্রমাণ করে দেয় শুধু লেখাপড়া নয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ‘তুলির লেখা’ও মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে জমিদার, দরিদ্র মুণ্টা ও তার কুকুরের দায়িত্ব নিয়ে উদারতার পরিচয় দেন। ‘কাজল জল’ রূপকথাধর্মী গল্প হলেও এর মধ্যে একটা আদর্শ রয়েছে। রাখালের বাঁশিতে আত্মহারা রাজকন্যা নিরাভরণ হয়ে রাজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি এখানে তুচ্ছ।

গল্পগুলোর নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘কিশোরদের মন’ কৈশোরকালের মানসিক আবেগ, ঝঞ্ঝা, নির্মল বন্ধুত্বকেই তুলে ধরেছে। ‘অপরূপ সোনার কাটি’ গল্পে দীপু আর অতুল তাদের মনের মধ্যে থাকা ‘অপরূপ সোনার কাটি’র সাহায্যে আদর্শ দেশ গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। ‘তুলির লেখা’য় দেখা যায় বিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরে কিছু বিষয় থাকে যার মাধ্যমেও বড় হওয়া যায়। অজিতের ‘তুলির লেখা’ অর্থাৎ ছবি তার সেই বড় হওয়ার সোপান। ‘কঙ্কালের জাগরণ’-এর অজিত মানুষ বা কোন প্রাণীর কঙ্কাল নয়, ভারতের ইতিহাস অর্থাৎ অতীতের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান নিদর্শনের জাগরণ ঘটিয়েছে। ‘কলরব’ শুধুই কোলাহল নয়, দেশকে উন্নত করে গড়ে তোলার উদ্দীপনাও। ‘কাজল জল’-এই রূপকথাধর্মী গল্পে এক ধরনের নিরাসক্তি, দেশে ফেরার টান, বাঁশির সুরে আকুলতা গল্পটাকে রূপকথার নির্মল জগতেই পৌঁছে দেয়। ‘সপ্তডিঙা’ প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্যিক গৌরবের কথা স্মরণ করায়। আবার এই গৌরব যে একদিন

ইতিহাসে পরিণত হবে তার আভাসও দেয়। ‘দাদুর দেশ’ গল্পের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দাদু হচ্ছেন আবদারের পাত্র। তাই তাঁর দেশও মধুর, স্বপ্নময়। ‘দরদী’ গল্পে জমিদারের দরদ, যা সাধারণত বিরল সেটাই চোখে পড়ে। ‘ঙ’ গল্পের মলিনা আর্থিক দিক থেকে মলিন হলেও, মানসিকভাবে অমলিন, ধনী। করালীকিঙ্কর তার ‘ক্যাঙ্গারু’র মত ভঙ্গির কারণে বহু প্রাণকে রক্ষা করে। ‘উৎপল ও রবি’ উভয়ে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বিপ্রতীপে হলেও ‘বন্ধুত্বের মহিমায় সমানভাবে উজ্জ্বল। চারু ও হারুর স্বভাব ও সামাজিক অবস্থান বিপরীত, বৈপরীত্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি। তবে কোন না কোন দিন তাদের এই বৈপরীত্য দূর হবে— এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ‘ফার্ষ্ট্‌বয়’ অমল দরিদ্র অমিয়কে সহযোগিতার কারণে নিজের প্রথম স্থানাধিকার ত্যাগ করলেও মানবিকতার পরীক্ষায় সে-ই ‘ফার্ষ্ট্‌বয়’। অন্যদিকে ‘লাষ্ট্‌বয়’ তার ‘L’-টাকে উল্টে ‘F’ করে দেয়। অধ্যবসায় থাকলে যে কেউ প্রথম হতে পারে তার নিদর্শন হল ‘লাষ্ট্‌বয়’ গল্প। গল্পের নামকরণেও দক্ষিণারঞ্জনের সচেতন মন কাজ করেছে।

বেশিরভাগ চরিত্রই আসলে কোন না কোন আদর্শের পরাকাষ্ঠা। বোঝা যায়, নীতি-আদর্শের গণ্ডিতে আবদ্ধ দক্ষিণারঞ্জন আসলে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। দক্ষিণারঞ্জন বাংলা বাঙালি, তাদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক-পারিবারিক ঐতিহ্য, বাংলা ভাষার মহিমা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, দেশপ্রেম, নীতি, আদর্শ, কর্তব্যবোধ, হাস্যরস ইত্যাদিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে কিশোর মনের অনুকূল ভাষা ব্যবহার তো আছেই। তাই কখনো কখনো গল্পকথক হিসাবে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করে ফেললেও বা ‘ফার্ষ্ট্‌বয়-লাষ্ট্‌বয়’-এর তথাকথিত সীমানা পেরোতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে কিশোর-সাহিত্যিক, গল্পকার দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বিভিন্ন সংস্করণ থেকে দক্ষিণারঞ্জনের এই গ্রন্থগুলোর জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। যেমন— কিশোর উপন্যাস ‘কিশোরদের মন’-এর বিচিত্র সংস্করণ, বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জাতিগঠন বই ‘চারু ও হারু’-র অতুল সংস্করণ, কিশোর উপন্যাস ‘ফার্ষ্ট্‌বয়’-এর উজ্জ্বল সংস্করণ এবং ‘উৎপল ও রবি’-র সবুজ সংস্করণ। দেশ গঠন বই চিরসবুজই ‘সবুজ লেখা’। এই গ্রন্থগুলোকে একত্রে বলা হত দক্ষিণারঞ্জনের দেশগঠন সিরিজ, এই গ্রন্থগুলো দেশের ঘরে ঘরে জাগ্রত দীপশিখা। সব মিলিয়ে গ্রন্থগুলো ‘অতুলন’।

তথ্যসূত্র ::

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৩

২. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি সংস্করণ জুন ১৯৮৮, পৃ. ৮৭-৮৮

৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৮

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩০০ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫

৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *ছোটগল্পের সীমারেখা*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০

৬. তদেব, পৃ. ৪১

৭. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যপ্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০১-২০২

৮. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৫২

৯. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস/ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯১; কারিগর দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ১৮৬

১০. বারিদবরণ ঘোষ, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য', দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬

১১. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৫১

১২. অলোক রায়, *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৬৭, পৃ. ৮৬

১৩. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি সংস্করণ জুন ১৯৮৮, পৃ. ৫

১৪. তদেব, পৃ. ১০

১৫. তদেব, পৃ. ১১

১৬. সুমিতা চক্রবর্তী, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ২৭

১৭. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (সংযোজনসহ) আগস্ট ২০০০; ষষ্ঠ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২, পৃ. সাত

৪. চতুর্থ অধ্যায়

<u>প্রবন্ধ</u>

প্রবন্ধ মননশীল সাহিত্য। প্রবন্ধ হল: "Any brief composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, or persuade us to accept a thesis on any subject whatever."[১] প্রবন্ধ আসলে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। "এই বন্ধন বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের হতে পারে, চিন্তারাশির সুসজ্জাজনিত হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু মোটামুটিভাবে তাতে সংযম, যুক্তি শৃঙ্খলা, সুসজ্জা এবং অবশ্যই রচনা সৌন্দর্য"[২] থাকতে হবে। "'নিবন্ধ' এর প্রায় সমজাতীয় একটি শব্দ, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে এটি বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে"[৩]। একে রম্যরচনা বা লঘুরচনাও বলা যেতে পারে, "যা সুচারু, পরিমার্জিত, সুললিত গদ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনার থেকে স্বাদে-স্বভাবে আলাদা। ... 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'-র সঙ্গে এই লঘু রচনার প্রভেদ নির্দেশ করা সর্বদা সহজসাধ্য নয়। কোনো 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা হালকা 'familiar essay' 'রম্যরচনা'র গোত্রভুক্ত হতেই পারে, যদিও 'রম্যরচনা' ব্যক্তিগত হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"[৪] বোঝাই যাচ্ছে প্রবন্ধের সঙ্গে নিবন্ধের তফাৎ রয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন রচিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান কিনা সেটা তো অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। তবে তার আগে দেখে নিতে হবে তিনি কতগুলো প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছিলেন। *সবুজ লেখা* (১৯৩৮) গ্রন্থের 'পৃথিবীর কথা', 'পৃথিবী', 'ম্যাজিক', 'পুজোর চিঠি', 'আশীর্বাদ'; *পূজার কথা* (১৯৩৮) গ্রন্থের 'পূজার কথা', 'পুরাণ যুগের কথা', 'নূতন যুগের কথা'; *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* (১৯৪৮) গ্রন্থের 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী', 'প্রভাতী তারা', 'শঙ্খ', 'বাঁশীর সুর', 'উৎসবের শুরু', 'পথে', 'উৎসব'; *গ্রাম্য-গীতি* গ্রন্থের 'গান ও ধূয়া', 'প্রথম কথা'; *আমার দেশ* গ্রন্থের 'কথিকা', 'শেষ ফুলদল', 'পদ্ম' দক্ষিণারঞ্জনের লিখিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। তবে কোন্‌টা প্রবন্ধ ও কোন্‌টা নিবন্ধ এই শ্রেণিবিভাগ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা মুশকিল। কারণ "সংরূপ হিসাবে প্রবন্ধ খুবই অনির্দিষ্ট, সান্দ্র। প্রবন্ধ নিবন্ধ রম্যরচনার সীমানা ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট করা কঠিন—প্রায় অনেকখানি অংশই ধূসর মনে হয়— সাদাকালো বর্ণে পৃথক করা যায় না।"[৫]

এই প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলোকে কয়েকটা দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হবে। এগুলো হল বিষয়, প্রকাশভঙ্গি, মৌলিক/ অনুসরণ।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু প্রথমে বলে নেওয়া যাক।

বিষয়বস্তু

'পৃথিবীর কথা' প্রবন্ধে পৃথিবী, তার আগ্নেয়গিরি, নীহারিকা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পরমাণু, লক্ষ লক্ষ তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, ভূগর্ভ মধ্যস্থিত ম্যাগমা, সবশেষে 'বিষম বাস্পে গলানো ও সরে পোরা' 'গোলা' পৃথিবীর কথা রয়েছে।

'পৃথিবী' হল 'পৃথিবীর কথা' প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ। এতে রয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি, চাঁদের সৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র খাতের সৃষ্টি, বৃষ্টি, দিন-রাত্রির কথা, বৃষ্টির জলে সমুদ্র সৃষ্টি, নদ-নদী, ভূমিকম্প, জীবের সৃষ্টি, জীবাণু, কীটের জন্ম, গাছ, প্রলয়, মাটি, আগুন, উভচর জীব, কাঁকড়া, বিছে, মাকড়, ব্যাঙ, নানারকম মাছি, কড়ি, শামুক, শঙ্খ, মাছ, কচ্ছপ, কুমীর, সমুদ্রের সাপ, গোসাপ, গিরগিটি, টিকটিকি, সরীসৃপ, শূকর, গণ্ডার, ম্যামথ্, হাতি, বানর, বনমানুষ, আদি মানুষ, ঘোড়া, হরিণ, মোষ, পাখি, ডাইনোসোরাস, টিটানোথেরিয়াম, 'ট্যারোডাক্টাইল্স্', 'ফসিল্' ইত্যাদির কথা।

'ম্যাজিক' প্রবন্ধে রয়েছে ম্যাজিক বা যাদুর কথা। যাদুকররা মানুষকে ভুলিয়ে দেন। যাদু বা ম্যাজিক আসলে 'ফাঁকি', শুধুই হাতের কৌশল। যাদুকররা 'হাতের' বা 'অভ্যাস'-এর কৌশলে এবং 'বৈজ্ঞানিক কায়দায়' যাদুর খেলা দেখিয়ে থাকেন।

'পুজোর চিঠি' নিবন্ধে দেশের সব বাড়িতে চিঠির, পুজোর নেমন্তন্ন করতে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু তার ব্যাগ খোলা থাকায় চিঠি 'লম্বা লেপাফার মত হয়ে' গেছে। ফলে সব অক্ষরগুলো ঘুমে ঢুলে পড়ায় সব কিছু ওলট পালট হয়েছে। পুজো কিভাবে হবে সেই চিন্তায় চিঠি শিউরে ওঠে।

'আশীর্বাদ' নিবন্ধে শরতের আগমন, তার আশীর্বাদ বর্ষণের কথা আছে। তবে শরতের কাশবনকে খুশিতে হাসতে দেখতে চাইলে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টিতে পৃথিবীকে স্নাত হতে হবে।

‘পূজার কথা’ প্রবন্ধ বেদ-যুগের কথা, প্রথম পূজার কথা, মানুষের জীবনের ‘প্রথম বাসন্তী উৎসব’, ‘মহাশক্তিময়ী’র আবির্ভাব সম্পর্কিত।

এর পরবর্তী প্রবন্ধ ‘পুরাণ যুগের কথা’তেও রয়েছে দেবীর প্রথম আবির্ভাব, সৃষ্টির শুরুতে মহাপ্রলয়, মধু কৈটভ বধের কথা, মধু কৈটভের দেহে মহাসমুদ্রের অনন্ত সলিলে ধরিত্রীর সৃষ্টি কাহিনী, জীবের সৃষ্টি রহস্য।

‘নূতন যুগের কথা’ প্রবন্ধের বিষয় হল দেবী দুর্গার যুগে যুগে শুভাগমন, পুরাণের ইতিহাস, রাজা সুরথ বৈশ্য সমাধি ও মহামুনি মেধসের বৃত্তান্ত, দেবীর দ্বিতীয় আবির্ভাব— দেবতাদের উদ্ধারার্থে ‘জয়া’ রূপে আগমন, মহিষাসুর বধ, দেবীর তৃতীয় আবির্ভাব— দেবতাদের পুনরায় বিপন্মুক্তির জন্য ‘কৌশিকী’ রূপে আবির্ভাব, ফলস্বরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। এরপর দেবীর চতুর্থ আবির্ভাব— রাজা ও বৈশ্যের ‘পূজার্চনায়’ তুষ্ট দেবীর মানব রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে আর্যভূমিতে আগমন।

‘আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী’ নিবন্ধে সবুজের জয়গান গাওয়া হয়েছে। সবুজ, সজীব, উজ্জ্বল কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরাই ‘পৃথিবীর তপস্যার অমৃতফল’। এরা চিরন্তন, শাশ্বত। পৃথিবীর সৌন্দর্য, সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা কোন কিছুকেই এরা ফুরিয়ে যেতে দেবে না। এই সব তরুণ প্রাণশক্তি পৃথিবীর মানুষের সমস্ত স্বপ্নের মশাল জ্বালিয়ে দেবে। এদের প্রাণের ঔজ্জ্বল্য গোটা বিশ্বকেই উজ্জ্বল করে দিক।

‘প্রভাতী তারা’ দেখে যেমন সবাই বুঝতে পারে রাত শেষ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, তেমনই নবীনদলকে দেখে দেশও জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখে। সব জড়তাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে তারা বলে, ‘আমরা এসেছি তোমাদের ভালোবাসার জন্যে!’ সূর্যের আলো যেমন কুঁড়িকে ফুল হয়ে উঠতে দেয়, ‘অমল কিশোরী! অটল কিশোর!’-রাও তেমনি ‘আনন্দের অজস্র পাপড়ি’ মেলে পৃথিবীকে প্রস্ফুটিত করে দেবে। এটাও নিবন্ধ।

‘শঙ্খ’ নিবন্ধে একই শঙ্খ নানা অর্থের দ্যোতক। সে একাধারে তার ধ্বনিতে ঘুমের অবসান ঘোষণা করে, দেশকে জাগিয়ে তোলে, দেশের তরুণ প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে জয়ধ্বনি ঘোষণা করে, খুলে দেয় কিশোর-মনের দ্বার। সে ‘চির-নতুন’-এর বার্তাবাহী, ‘মৃত্যুবিহীন মরণ’-এর প্রতীক, সে ‘চিরসবুজ’-এর বাণী প্রচারক।

‘বাঁশীর সুর’ নিবন্ধের বিষয় হল বাঁশি উৎসবের সুর খোলা দুয়ারে পৌঁছে দেয়, ‘বাতাস নাচিয়ে’, ‘সোনালী সুর’ গেয়ে যায়। কলরবের সুর শুনিয়ে বাঁশি ‘বন্দর ঘাট, প্রান্তর মাঠ, পল্লী সহর!’ সব স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ‘উৎসবের জোর বাঁশী’ শুনলে কোন দেশ পিছিয়ে থাকবে না, প্রত্যেকের ভাষা মর্যাদা পাবে, দুর্বল-মূর্খ-দরিদ্র কেউ কোথাও থাকবে না, ‘যুগ যুগান্তে চির উৎসব’ কখনো শেষ হবে না।

‘উৎসবের শুরু’ নিবন্ধে আছে উৎসবের কথা যে উৎসব জীবনকে ‘অভয় মহোল্লাসে’ ভরিয়ে দেবে, সব অন্ধকার দূর করে দেবে, বাধা-বিপদ উপেক্ষা করে সব পথকেই উৎসবের আনন্দে মুখরিত করে দেবে।

‘পথে’ নিবন্ধের বিষয়বস্তু— প্রকৃত পথ হ’ল মনের পথ। তারপর রয়েছে ‘মাটীর পথ আর কাজের পথ’। মাটির দেশই সত্যিকারের দেশ, যে মাটির বুক ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী। গ্রাম বাঁচলেই সকলে বাঁচবে, জগৎ বাঁচবে।

‘উৎসব’ নিবন্ধে আছে ভারতবর্ষ দেহ, মন, গুণ, কাজ সব ক্ষেত্রেই প্রশংসিত। পৃথিবীকে ‘আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে’ দেওয়ার জন্যই মানুষের আগমন। তাই কেউ রথী, কেউ সারথী হয়ে উৎসব-রথে আরোহন করে মানুষকে ও প্রকৃতিকে সবুজে সজীবতায় ভরিয়ে দেবে।

‘গান ও ধূয়া’ প্রবন্ধের শুরুতে গান বা সঙ্গীতের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। বাংলা, এই গান বা ‘গীতের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার’। গ্রাম্য-গীতি গ্রামীণ কবিরই জন্য। এ গানে আকুলতা, সরলতা বড় বেশি। তাই প্রাবন্ধিক মহোৎসাহে ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রাদেশিক গ্রাম্য গীতিগুলোর গান ও ধুয়া সংগ্রহ করেছিলেন। প্রাচীন পদাবলী, প্রাচীন পুথির কাছে এই দেশীয় সম্পদ যদি না থাকে তাহলে বঙ্গ ভাণ্ডারের সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। গ্রামেই প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য। এই সব গীত নিরক্ষর কৃষক-কবির আবেগ মন্থনেই উত্থিত হয়েছিল; অথচ এইসব কবি সুদূর পল্লীর বুকেই হারিয়ে যায়, কেউ তাদের নামও জানতে পারে না। অন্যদিকে প্রত্যেক ধুয়াতে ‘রচক কবির নাম’, এমনকী ধামও উল্লেখিত থাকে। কারণ ধুয়াগুলোর বিষয় সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক। এক-এক বিষয়ে আবার এক-এক কবি বা ধুয়াকার অধিক পারদর্শী।

‘প্রথম কথা’ নিবন্ধের বিষয় হল মাছ সাঁতার কাটতে বেশ দক্ষ। ‘শঙ্খ-শামুকের দল অবাক হয়ে’ মাছের সাঁতার কাটা দেখে। কুমীর সাঁতারে পটু না হলেও তারা হাঁটতে পারে, মাছ যেটা পারে না।

কোন কোন প্রাণী আবার উড়তেও পারে, মাছ বা কুমীর পারে না। গাছের পাতা, বনের ফুল নেচে ওঠে কিন্তু গান গাইতে পারে না। পাখি গান গায় অপূর্ব সুরে, কিন্তু কথা বলতে জানে না। বানরের দল অর্থহীন 'কিচি মিচি খিচি' করতে পারে, যেটা কথা নয়। একমাত্র মানুষ জন্মের পর 'মা' বলে, সে বলায় অনন্ত মধু মিশ্রিত থাকে। মানুষ বিচিত্র ভাষায় কথা বলে, পাখিদের কথা শেখায়, পশুদের বশ করে 'কথার আদলে', অজস্র বই লেখে। তবু আজও পৃথিবীর সব মানুষ প্রথম কথা বলে, 'মা'। নিবন্ধ লেখক তাই পাঠকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন পৃথিবীর সব দেশের 'মানুষ কি ভাই-বোন?'

'কথিকা' নিবন্ধে রয়েছে খাঁটি মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা, যারা হবে 'জীবন্ত, প্রাণবন্ত'। শুধু বইয়ের পাঠেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, গ্রাম-শহর উভয়কেই প্রকৃতির পাঠ নিতে হবে। তবেই শিক্ষার সফলতা। সবুজ ধ্বংস নয়, বরং প্রকৃতি যেখানে রিক্ত, দূষিত, বন্ধ্যা তাকেই 'আশ্চর্য সুন্দর' করে গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া খেলাধূলা, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, স্বাস্থ্য, কলা, কারিগরি বিদ্যা সব কিছুকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'শেষ ফুলদল' ও 'পদ্ম' নিবন্ধ দুটো 'কথিকা'রই সম্প্রসারণ। 'শেষ ফুলদল'-এ নৌকো, জাহাজে করে পৃথিবীর সব সাগরে-দেশে নতুন পণ্য নিয়ে পাড়ি দেওয়ার কথা রয়েছে। আর পূর্ব বন্দরের পথ দিয়ে এই যাত্রা শুরু হবে।

'পদ্ম'-এর বিষয়বস্তু হল যাত্রাপথে গ্রামের শাঁখ, শহরের শিঙার বিজয়ডঙ্কা বাজবে। ভারতবর্ষের সব ঘাটে, বন্দরে, পাহাড়ে, বনে, সাগরে সে ডঙ্কা, সে সুর ধ্বনিত হবে। ভারতবর্ষ পুনরায় মর্তের 'উদয় পথের অমিয়-স্পর্শ তীর্থভূমি' হয়ে উঠবে।

<u>বিভাগ</u> :

বিষয়গত দিক থেকে প্রবন্ধের আবার চারটে বিভাগ— চিন্তামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও ব্যক্তিগত।

চিন্তাশীল প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধি প্রধান হয়ে ওঠে। অতি সূক্ষ্ম চিন্তন, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, গভীর প্রজ্ঞার দ্বারা লেখকের বিষয়-ভাবনা এখানে উদ্ভাসিত হয়। *সবুজ লেখা*-র 'ম্যাজিক' প্রবন্ধকে চিন্তাশীল প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটাতে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে ম্যাজিকের মত একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই 'ম্যাজিক'-এর প্রতিশব্দ জাদু, মায়া, ভেল্কী, ভোজবাজী — যাই হোক না

কেন, সবগুলোরই অর্থ 'ফাঁকি বা কৌশল'। হাত, বুদ্ধি, অভ্যাস বা যন্ত্রপাতির কৌশলে অথবা কোন দ্রব্যের 'রাসায়নিক' বা স্বাভাবিক গুণের দ্বারা ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখান। তাহলে যাদুকররা আর্ট আর বিজ্ঞান দুটোতেই পারদর্শী। অনেক সময় খুব কঠোর নিয়ম সাধনা থেকে ম্যাজিকের চেয়েও উচ্চমানের প্রদর্শন ঘটে থাকে। যেমন— ভূতসিদ্ধি, হঠ-যোগসিদ্ধি ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে মনের ইচ্ছাশক্তি বা তার কোন নিয়মের দরকার যার সঙ্গে ম্যাজিশিয়ানের অতটা বন্ধুত্ব থাকে না। অভ্যাসের ছোট-বড় কৌশলের গুরুত্ব থাকলেও বুদ্ধির কৌশলই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাজিক নামক বিদ্যা মানুষের উপকারার্থেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের বিচক্ষণতা তথা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রাখর্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে, 'ম্যাজিক' প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তি-হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের বুদ্ধি তথা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সংযোগ ঘটেছে।

তথ্যমূলক প্রবন্ধ হল তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ বা 'বিষয় গৌরবী' প্রবন্ধ। "এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোন সুনির্দ্দিষ্ট, সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তা-প্রধান সৃষ্টি"[৬]। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিককে রীতিমত সংযত ও সচেতন থাকতে হয়, যাতে হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগ সাধন না ঘটে। প্রাবন্ধিক দক্ষিণারঞ্জন রচিত 'পৃথিবীর কথা'কে তথ্যমূলক প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। চুন, নুন, ক্ষার, অম্ল, জল, অঙ্গার, গন্ধক সম্মিলিত 'বিরাট আগুনের গোলা' আমাদের পৃথিবী তার উত্তপ্ত অবস্থা থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে আজকের 'সবুজ ঘাস আর নীল জলে' পূর্ণ গ্রহে পরিণত হল, প্রাবন্ধিক সে বিষয়ে নানান তথ্য প্রদান করেছেন। 'পৃথিবী' প্রবন্ধও তথ্যমূলক। 'পৃথিবীর কথা' প্রবন্ধেরই দ্বিতীয় অংশ এই 'পৃথিবী' নামক প্রবন্ধ। এতে পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতিগত বিভিন্ন পরিবর্তনের ইতিহাস ধরা পড়েছে। পৃথিবী ধীরে ধীরে জীবের বাসযোগ্য হয়েছে, দিন-রাত্রির সৃষ্টি হয়েছে, জীবের আগমন, তার বিবর্তনের ধারা— প্রাবন্ধিক এই সব তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করেছেন। "১৩৩১ সনের ৩য় সংখ্যায় পরিষৎ পত্রিকায় 'গ্রাম্যগীতি' শীর্ষক নিবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) ঢাকা ও ময়মনসিংহের কয়েকটি প্রাদেশিক গ্রাম্যগীতি ও সেগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।"[৭] *গ্রাম্যগীতি* গ্রন্থের 'গান ও ধূয়া' প্রবন্ধে গানের মহিমা ব্যাখ্যানের পর এই গানে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গ্রাম-বাংলার গ্রাম্য ভাষার গীত 'প্রকৃতই পরম শোভন।' সাতটা পল্লী-গীতি কথা, তাদের শব্দার্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব, মাধুর্য ইত্যাদি নানান তথ্য প্রদান করেছেন। এছাড়া

বাচ্‌তালুকের ও নন্দপুরের ধুয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এই প্রবন্ধটাতে বিষয়নিষ্ঠা ও তথ্যনিষ্ঠার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রাখা হয়েছে।

বিশ্লেষণ-মূলক প্রবন্ধে লেখক যেকোন বিষয় তা বৈজ্ঞানিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক — যাই হোক না কেন, বিশ্লেষণী দক্ষতায় তাকে উপস্থাপন করেন। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের কৌশলে সামান্য বিষয়ও বিশেষ হয়ে ওঠে। প্রবন্ধের আলোচনাকালে সামান্যতম বিষয়ের ব্যাখ্যাও প্রাবন্ধিকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'পূজার কথা', 'পুরাণ-যুগের কথা', 'নূতন-যুগের কথা' প্রবন্ধগুলোকে বিশ্লেষণমূলক বলা যেতে পারে। 'পূজার কথা' প্রবন্ধে বিশ্বজুড়ে আয়োজিত আনন্দময়ী মায়ের প্রাত্যহিক পূজার ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে। 'গাছের মাথার পাতায় পাতায়, ফুলের রাশিতে, ঝরণার ঝুরু ঝুরু জলে', বরফ-ঢাকা পাহাড়, পাখির কাকলিতে, মৌমাছির গুন্‌ গুন্‌ সুরে আকুলিত তপোবনের এক সুন্দর প্রভাতে ঋষিদের 'প্রাণে প্রাণে আনন্দ-অশ্রুতে!' সমস্ত কিছু সজীব হয়ে অব্যক্ত কথা বলতে চাইছিল। তাঁদের সমস্ত সুপ্ত গুপ্ত কথার 'গানের পুথিখানি' যেন হঠাৎ খুলে গেছে। এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় তাঁদের পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রকাশহীন নানান প্রশ্নের উত্তর 'অমৃত ভোরে, পুণ্য ভারতের পবিত্র চরিত আর্য ঋষি'গণ জানতে পেরেছেন। সমগ্র সৃষ্টি, 'অনন্ত সৌন্দর্য ভরা প্রকৃতি' 'এক মহাশক্তিময়ীর শক্তিতে' উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই মহাশক্তি মহাদেবী যেন নিজেই ঋষিদের 'হৃদয় বীণা'য় বেজে উঠে বললেন— ''—অহং/ রুদ্রেভি র্বসুভি / শ্চরা''। অপরিসীম অমৃতের ঝর্ণা ধারায় স্নাত এই নতুন অমৃত গান। জগতে এই উৎসব ও পরম পুণ্যদিন, মানুষের প্রথম পূজা, 'প্রথম বাসন্তী উৎসব' সহ প্রথম 'পূজা'র ইতিহাস আশ্চর্য দক্ষতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'পুরাণ-যুগের কথা' প্রবন্ধে রয়েছে দারুণ মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি কীভাবে হবে তা নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন, সে সময় যোগনিদ্রাবিভোর বিষ্ণুর কানের মল থেকে মধু ও কৈটভ দুই মহাসুর জন্মলাভ করে। মহা হুঙ্কারে তারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে বিপন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন— ''ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। / সুধা ত্ব মক্ষরে! নিত্যে! ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।'' প্রাবন্ধিক দক্ষিণারঞ্জন এই স্তরটারও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এই স্তব যোগনিদ্রা, মহাদেবী, অনাদি যুগের মহাশক্তি মহামায়ার স্তব। ব্রহ্মার স্তবে যোগনিদ্রা মহাশক্তি বিষ্ণুর শরীর ছেড়ে, চতুর্দিক আলো করে জাগ্রত হওয়ায় শ্রীভগবানের জাগরণ ঘটল। মহাপ্রলয়ের মহাসমুদ্রে মহাসুর আর বিষ্ণুর যুদ্ধ চলল। পৃথিবী সৃষ্টির কয়েক হাজার বছর কেটে যাওয়ার পরও যুদ্ধে হার-জিতের মীমাংসা না হওয়ায় শ্রান্ত, আশ্চর্যান্বিত অসুরেরা বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করতে

বলায় বিষ্ণু তাদের বধ করতে চান— এই প্রার্থনা জানান। মধু-কৈটভ বধ হল, তাদের শরীরের দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি হল। ব্রহ্মা অমৃত দিয়ে নতুন ভুবন সৃষ্টি করলেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ধরিত্রী 'জীবময়ী' হয়ে উঠল। 'পৃথিবীর সেই আদিযুগের হাজার বৎসরে-ঘেরা' 'প্রথম শারদোৎসব' অনুষ্ঠিত হল। মানুষ দেবীর পুজোমণ্ডপে অজস্র প্রণাম জানিয়েছে। 'বিচিত্র সৌন্দর্যে আনন্দময়ী ধরণী' তিলে তিলে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত বর্ণনাই বিস্তারিত, বিশ্লেষিত। প্রাবন্ধিক পাঠক-মনে জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের কোন অবকাশই রাখেন নি। তার আগেই কৌতূহলের নিরশন ঘটে গেছে। 'পুরাণ-যুগের কথা' প্রবন্ধে আছে দেবীর প্রথম আবির্ভাবের কথা, আর 'নূতন-যুগের কথা' প্রবন্ধে দেবতাদের পরিত্রাণে মহিষাসুর বধের কারণে 'জয়া'-রূপে দেবীর দ্বিতীয় আবির্ভাবের কথা রয়েছে। দেবী সিংহবাহিনী মহিষাসুর নিধন করলেন। এর পরে আছে দেবগণের বিপদুদ্ধারে 'মহাদানব' শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য 'কৌশিকী' রূপে দেবীর তৃতীয় আবির্ভাবের কথা। চণ্ড-মুণ্ড কর্তৃক দেবীর অসামান্য অতুলনীয় রূপের কথা শুনে তাঁকে রাণী করার উদ্দেশ্যে দূত সুগ্রীবকে পাঠাল শুম্ভ-নিশুম্ভ। দেবী সব শুনে বললেন এর জন্য আগে তাঁকে যুদ্ধে হারাতে হবে। সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠানো হলে দেবীর হুঙ্কারে সৃষ্ট দাবানলে সে ভস্মীভূত হল। এরপর চণ্ড-মুণ্ড দেবীকে আক্রমণ করলে দেবীর ভীষণ ভ্রূকুটির অন্ধকার থেকে মহাভৈরবরূপিণী দেবী চামুণ্ডা আবির্ভূতা হয়ে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। এরপর মহাদেবী কর্তৃক যথাক্রমে রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ নিহত হল। এই সব বৃত্তান্তই মহামুনি মেধসের আশ্রমে রাজ্যহারা ও গৃহহারা রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য অবগত হলেন। মনে প্রাণে তাঁরা দুজনে এক অনির্বচনীয় ভক্তি, শান্তি ও আনন্দধারায় স্নাত হলেন এবং ঋষির উপদেশে মহামঙ্গলময়ী মহামায়ার প্রতিমা তৈরি করলেন। ''সে প্রতিমার একদিকে মানুষের প্রাণের কথার মঙ্গল মূর্তি গণেশ, একদিকে মানুষের বুকের বল আর মনের উৎসাহের চিরযৌবনের মূর্তি কার্তিকেয়, একদিকে মানুষের ধন-ঐশ্বর্য-অন্নের সুধা মূর্তি লক্ষ্মী, একদিকে মানুষের জ্ঞান বিদ্যা গানের পরমানন্দময়ী মূর্তি, সরস্বতী, আর মধ্যখানে মানুষের প্রাণের সকল মহাকল্যাণ-ইচ্ছার দশদিক উজ্জ্বলা—মহাশক্তি মহামায়ার মহামূর্তি।" দেবী দুর্গা, তাঁর সন্তান-সন্ততি — প্রাবন্ধিক প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই মহাপূজার শেষে মানব কল্যাণে আর্যভূমিতে দেবীর চতুর্থ আবির্ভাব ঘটল। সেই সঙ্গে বাসন্তী মহোৎসবও উদ্‌যাপিত হল। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পর্যন্ত দেবীর আবির্ভাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি প্রাবন্ধিক, প্রতিটা বিষয় সুন্দরভাবে বিশ্লেষণও করেছেন।

‘পুজোর চিঠি’, ‘আশীর্বাদ’, ‘আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী’, ‘প্রভাতী তারা’, ‘শঙ্খ’, ‘বাঁশীর সুর’, ‘উৎসবের শুরু’, ‘পথে’, ‘উৎসব’, ‘কথিকা’, ‘শেষ ফুলদল’, ‘পদ্ম’— নিবন্ধগুলোকে ব্যক্তিগত বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তি-চিন্তার চেয়ে ব্যক্তি-হৃদয়ই মুখ্য স্থানাধিকারী। ধরা যাক্, ‘পুজোর চিঠি’ নিবন্ধের কথা। পুজোর চিঠির আগমনে ছেলে-বুড়ো সকলের নাকে পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে যায়। এ যে গোটা বছরের অপেক্ষা, কয়েকদিনের মুক্তি। এই প্রবন্ধে বেশ হাস্যরসের ছোঁয়া মেলে। চিঠি নাকি সারারাত ধরে ঘুমিয়ে থাকায় চিঠির মধ্যেকার অক্ষরগুলো ঘুমে ঢুলে ঢুলে একে অপরের গায়ে পড়ে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। এর ফলে পুজোর ব্যাপারে চিঠি খুবই আশঙ্কায় রয়েছে। নিবন্ধটাতে বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষা ভাষার বুনটের নৈপুণ্যই বেশি করে চোখে পড়ে। ‘আশীর্বাদ’ নিবন্ধে আপাতভাবে পিঁপড়ে ও পাতার বন্ধুত্বের অতিপরিচিত গল্প বলা হয়েছে বলে মনে হলেও এ আসলে তার ভেতরের অন্য গল্প। বৃষ্টি এসে ধূলিধূসরিত পৃথিবীর ধুলো ঝেড়ে, ধুয়ে মুছে সবুজ পাতাকে চিরসবুজ করে দিয়ে যায়। তারপর মেঘের দল ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যায়, শরতের আগমন ঘটে। তার আর্শীবাদ ধরণীতে বর্ষিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন রচিত এই দুটো নিবন্ধকেই সূচীপত্রে ‘বিবিধ’ বলা হয়েছে। কত সহজ সরল ভাষায় জীবনের গভীর সত্যকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে ‘‘বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ গুরুগম্ভীর প্রশ্ন বা জীবন-সমস্যা অবলম্বনে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া মীমাংসার সন্ধান করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধবিদ বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যকে আত্মগত ভাবরসে স্নিগ্ধ করিয়া পাঠকের চারিদিকে সুন্দর, শান্ত ও কান্ত একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রধান, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের অনুভূতি স্নিগ্ধ, সরস, হাস্য-মধুর আত্ম-স্পর্শ প্রধান।’’[৮] *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* গ্রন্থের ‘আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী’, ‘প্রভাতী তারা’ ‘শঙ্খ’, ‘বাঁশীর সুর’, ‘উৎসবের শুরু’, ‘পথে’, ‘উৎসব’— এই নিবন্ধগুলোকে লক্ষ করলে মনে হয় এরা যেন একটা ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে। আবার *আমার দেশ* গ্রন্থের ‘কথিকা’, ‘শেষ ফুলদল’, ‘পদ্ম’— এই নিবন্ধগুলো যেন একই সুতোয় বাঁধা। ‘আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী’-তে রয়েছে ‘চির জীবন্ত, চির অফুরন্ত’, ‘পুণ্য দেশের প্রাণরক্তের সচল মুক্তাফল’ তরুণ দলের চিরন্তন অস্তিত্বের কথা। ‘প্রভাতী তারা’ যেন অজর, অমল, অটল কিশোর-কিশোরীর প্রতীক। ‘শঙ্খ’ ‘সবুজ কিশোরদের অনিবারণ চলা’র উদ্বোধন ও জাগরণ ঘটায়। ‘বাঁশী’ ‘বন্দর ঘাট, প্রান্তর মাঠ, পল্লী সহর’ সবস্থানে চির অসমাপ্ত উৎসবের ‘সুর’ শোনায়। এ ‘বাঁশীর সুর’ দেশ থেকে দুর্বলতা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য দূর করে দেবে। এই ‘উৎসবের শুরু’ হবে ‘‘জগতের ধূলিকণা থেকে বাতাস, বিদ্যুৎ, আলো, সবকিছুকে প্রদীপ আর তরোয়াল করে, যত দুঃখ, দুর্বলতা, দুর্দশা, অস্বাস্থ্য, ভয়, অভাব, বিলাসিতা, সব রাক্ষস-খোক্কসগুলোকে ধ্বংস করে’’। ‘পথে’ নিবন্ধে কর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে, মাতৃশক্তিকে সমাদর জানানোর পর বলা হয়েছে, ‘‘মাটীই দেশ... সত্য দেশ; প্রথম পৃথিবী মাটীর’’। আর সবচেয়ে বড় কথা পল্লীকে বাঁচাতে হবে। বিনিদ্র

ঐক্যবদ্ধ নির্ভয় মহাদীপ্ত কিশোর-কিশোরী ভুবন জুড়ে আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে উৎসব অভিযান চালিয়ে যাবে। 'উৎসব' নিবন্ধে সেই কর্মেরই বিজয় নিশান ওড়ানো হয়েছে। নিজের, দেশের, মানুষের, জগতের তথা বিশ্ব সৃষ্টির কারণে উৎসব পালন করতে হবে। সমুদ্রকে সখা, মেঘকে সাথী করে সবুজ সজীব চিত্তে ঋষির অভয় মন্ত্রে বীরের অস্থি নিয়ে 'অরুণ-পথের যাত্রী' সেই চির জাগরূক কিশোর-কিশোরীই উৎসবের বিজয়-বৈজয়ন্তী ওড়াবে। নিবন্ধগুলো পড়লে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছেলের দল', রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান', 'শঙ্খ' কবিতাগুলোর কথা মনেই পড়ে। এখানেই মনে হয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রভাতী তারা থেকে উৎসব সবই হতে পারে। এ হল সরল ভাষায় গভীর উপলব্ধির কথা। 'প্রথম কথা' নিবন্ধে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রথম কথা 'মা' ডাক, তার মাহাত্ম্য কত সহজ-সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে ব্যক্ত হয়েছে। অতি সাধারণ, অতি পরিচিত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রাবন্ধিক ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাব-কল্পনার জাল বুনে চলেছেন, অকপট-অমলিন-আত্মগত খেয়ালি কল্পনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন, সার্থকও হয়েছেন। এই গ্রন্থ উদিত ভারতের স্বাধীনতার নতুন আলোয় অনুপম পরিচয়ের স্বাক্ষরবাহী, তরুণ ও সুতরুণদের বিজয়াভিযানের উজ্জ্বল অতুল মন্ত্র, গদ্যে ও পদ্যে দীপ্ত বাণী। 'কথিকা'য় মেঘ, কাশফুল, শিউলি, অতসী, অপরাজিতা, জবা, স্থলপদ্মের রূপকে বাংলার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ছেলে-মেয়েদের জন্য 'খেলার পড়ার খাওয়ার আর কাজের নতুন ইস্কুল খোলা হয়েছে'। শিক্ষাগ্রহণের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক দিকের উপযোগিতা দক্ষিণারঞ্জনের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দেশের মাটি, গাছপালা, উৎপাদিত দ্রব্য, দেশীয় ভাষা বিশেষত 'মাতৃভাষা ও পিতৃভূমি'র প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। 'শেষ ফুলদল' ও 'পদ্ম' নিবন্ধেও বাংলা তথা ভারতের জয়গান গাওয়া হয়েছে। ''ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আকাশের তারকা হইতে মাটির প্রদীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং পরম পিতা পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম উপলখণ্ড পর্য্যন্ত ইহার বিষয়ীভূত হইতে পারে।''[৯] দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও এমনটাই লক্ষ করা যায়।

প্রকাশভঙ্গি :

পরবর্তী আলোচ্য প্রবন্ধগুলোর প্রকাশভঙ্গি। এই প্রকাশভঙ্গি আবার নানা ধরনের হতে পারে। যেমন— নিরাবেগ/ যুক্তিনির্ভর, ব্যক্তিগত, উপমা নির্ভর ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু আলোচনার নিরিখেই বলা যেতে পারে এই প্রকাশভঙ্গির কথা। যেমন— যেসব প্রবন্ধ বস্তুগত সে সব প্রবন্ধ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিরাবেগ বা যুক্তিনির্ভর। যেমন— 'পৃথিবীর কথা', 'পৃথিবী', 'গ্রাম্যগীতি'। এদের বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে কোন কোন চিন্তামূলক

প্রবন্ধকেও নিরাবেগ বা যুক্তিনির্ভর বলা যেতে পারে। যেমন— 'ম্যাজিক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহযোগে লেখা। উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো হোক, বা 'ম্যাজিক' সবকটা প্রবন্ধেই কোন আবেগের প্রকাশ ঘটেনি। আবার 'পুজোর চিঠি', 'আশীর্বাদ' — এই ব্যক্তিগত নিবন্ধগুলোর প্রকাশভঙ্গি সহজ, সরল। গল্পচ্ছলে গভীর বক্তব্যকে আকর্ষণীয় কথনশৈলীতে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী', 'প্রভাতী তারা', 'শঙ্খ', 'বাঁশীর সুর', 'উৎসবের শুরু', 'পথে', 'উৎসব', 'প্রথম কথা', 'কথিকা', 'শেষ ফুলদল', 'পদ্ম'— এই নিবন্ধগুলোর প্রকাশভঙ্গি ব্যক্তিগত হওয়ায় কৈশোরকালের দায়িত্ব, বৈশিষ্ট্য, কর্মের গুরুত্ব, 'মা'— এই প্রথম কথার মাধুর্য, দেশভক্তি ইত্যাদি গভীর আদর্শের কথায় প্রাবন্ধিকের যথেষ্ট আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। এগুলো পড়তে গেলে মনে হয় যেন বাড়ির গুরুজন বাড়ির ছোটদের সামনে বসিয়ে গল্প বলার ঢঙে উপদেশ ও আশার বাণী শোনাচ্ছেন, আশার আলো দেখাচ্ছেন। আর 'পূজার কথা', 'পুরাণ-যুগের কথা', 'নূতন-যুগের কথা' প্রবন্ধগুলো বিশ্লেষণমূলক হলেও প্রকাশভঙ্গিকে ব্যক্তিগত বলা যেতে পারে। কারণ প্রবন্ধগুলোতে ভাবাবেগের পর্যাপ্ত প্রকাশ লক্ষিত হয়। যেমন— তপোবনে ঋষিদের প্রাণে-মনে যখন প্রথম পূজার অনুভূতি জাগল তখন ''...''তাঁহাদের আকুল প্রাণের ভিতর হইতে আজ উছলিয়া উঠিতে লাগিল— ''কি দেখিলাম! কি আজ জানিলাম''— ''কি আলো! কি এ সুধারাশি! কি আনন্দ!''...'' ('পূজার কথা')। প্রথম শারদোৎসবের কথা যেদিন মানুষ জানতে পেরেছে ''সেদিন মানুষের প্রাণের উৎসবের কথা কি ভাবিতে ইচ্ছা হয় না?''

সে দিন কি আনন্দের দিন
এই ভারতের আর জগৎ-ভরা মানুষের! (পুরাণ-যুগের কথা)

সম্পূর্ণভাবে উপমা-নির্ভর নিবন্ধ না হলেও *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* গ্রন্থের কোন কোন নিবন্ধে এই উপমা-নির্ভর প্রকাশভঙ্গি লক্ষ করা যায়। যেমন—

অমল কিশোরী! অটল কিশোর! চলো,
প্রভাতের মতো জ্বলমান্,
আকাশে বাতাসে খেলে যাক সাথে—
প্রভাত রোদের কলগান! ('প্রভাতী তারা')

উজ্জ্বল প্রভাতের সঙ্গে নবীন কিশোর-কিশোরীর তুলনা করা হয়েছে।

'উৎসবের শুরু' নিবন্ধে রয়েছে—

শিশিরের মতো কোমল যদিও থাকো,

বুক ভরা থাক্ মহা-নীহারের আলো,

সবুজ বুকেতে   রক্ত লালিমা   রাখো,

মানুষ হওয়ার ঝর্ণাতে তা ঢালো!

যথার্থ মানুষের ধর্ম শিশিরের মতো কোমল হওয়া। তবে এই উপমা-নির্ভরতা *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* গ্রন্থের অন্তর্গত নিবন্ধগুলোর মাঝে মাঝে রচিত বিভিন্ন কবিতা বা ছড়ায় লক্ষ করা যায়।

মৌলিক/ অনুসরণ :

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হল মৌলিক নাকি অনুসরণ। 'পৃথিবীর কথা', 'পৃথিবী' প্রবন্ধ দুটো অনুসরণ। পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, ইতিহাস বিভিন্ন ভৌগোলিক বা ভূ-বিশেষজ্ঞের চোখে তো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। তিনি এক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য প্রদান করলেও এ স্পষ্টতই অনুসরণ। তবে ভাষাগত সরলতা লক্ষণীয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি, 'পথ' পত্রিকার প্রদর্শক-সম্পাদক, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি'র কার্যকরী সভাপতির দুর্লভ বিজ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় মেলে। 'ম্যাজিক' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বলা যায় যিনি বিজ্ঞান মানেন, যুক্তি-বুদ্ধি-পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা কোন বিষয়ে যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তিনি তো এটা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে ম্যাজিক বা জাদু আসলে হাত সাফাই বা নানান কৌশলের সুচারু প্রয়োগ। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন— ম্যাজিকের সঙ্গে সিদ্ধ, সাধনা বা যোগ সাধনার তুলনা, রাক্ষস-দৈত্য-দানবদের ম্যাজিক বিষয়ে পারদর্শিতা, আর্যদের নিয়ে আসা 'রাক্ষস', 'দানব', সভ্যতার প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রাবন্ধিকের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পুজোর চিঠি', 'আশীর্বাদ' দুটো নিবন্ধই মৌলিক। পুজোর চিঠি এলে সকলের কি মানসিক অবস্থা হয়, চিঠির অক্ষরগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকায় কি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বেধে যায় বা পাতা ও পিঁপড়ের গল্পকে কেন্দ্র করে বৃষ্টির গুরুত্ব, শরতের আশীর্বাদ দান— এসব একেবারেই প্রাবন্ধিকের নিজস্ব ভাবনা। এ যেন অনেকটা সহজ সরল মজাদার ভাষায় গভীর জীবন ভাবনার প্রকাশ। 'পূজার কথা' প্রবন্ধটাও মৌলিক। বেদ-যুগে কীভাবে পুজো শুরু হল, ঋষিদের প্রাণের মধ্যে কীভাবে গান উঠল, মহাশক্তি পরমাদেবী কীভাবে ঋষিদের হৃদয় বীণায় বেজে উঠেছিলেন— এসব বৃত্তান্ত কথন বা বর্ণনের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক দক্ষিণারঞ্জনের মৌলিকতা লক্ষণীয়। 'পুরাণ-যুগের কথা' ও 'নূতন-যুগের কথা' প্রবন্ধ দুটো পুরাণ-আশ্রয়ী ও অনুসরণ। *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* গ্রন্থের অন্তর্গত 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী', 'প্রভাতী তারা', 'শঙ্খ', 'বাঁশীর সুর', 'উৎসবের শুরু', 'পথে', 'উৎসব', 'প্রথম কথা'— নিবন্ধগুলোর সবকটাই মৌলিক। বিশ্বের কত প্রাণী কত কাজ পারে, আবার অনেক প্রাণী অনেক কাজ করতে অক্ষম। আর এই সমস্ত সক্ষমতা ও অক্ষমতাকে ছাপিয়ে যায় মানব-সন্তানের

কণ্ঠ-নিঃসৃত ‘মা’ ডাক। কিশোর-কিশোরীর অক্লান্ত কর্মযজ্ঞের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ, তাদের স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যের প্রতি আশীর্বাণী প্রদান— এসবই নিবন্ধ-রচয়িতার নিজস্বতা। *আশীর্বাদ* ও *আশীর্বাণী* গ্রন্থকে বলা হত ‘উজ্জ্বল বই’। *আমার দেশ* গ্রন্থের ‘কথিকা’, ‘শেষ ফুলদল’, ‘পদ্ম’— এই নিবন্ধগুলোতেও মৌলিকতা লক্ষ করা যায়। মেঘেদের, বিভিন্ন ফুলেদের পড়াশোনার মাধ্যমে আসলে শিক্ষার আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনাকেই দক্ষিণারঞ্জন কত সহজ-আটপৌরে ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই নিবন্ধগুলোতেও কর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে। ঘোষক হল বলাকার দল। ‘গভীর সুর, প্রাণের মনের, জীবনের সবুজ গান’ গেয়েছেন নিবন্ধ-রচয়িতা। সবচেয়ে মৌলিক ব্যাপার নিবন্ধের মাঝে মাঝে নানান কবিতা ব্যবহার। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই কবিতাগুলো প্রাসঙ্গিক। যেমন—

দেখছ তো রোজ?... পৃথিবী চলেছে — উড়ে’!
কিশোর-কিশোরী... ছুটেছে, — জগৎ জুড়ে!
যত কিছু আশা যত কিছু কাজ,
সব-হারাদের যত দুখ-লাজ,
আসছে-কাল আর ছুটে চলা আজ,
চোখ ফেলে যায় তোমাদের পথ ধুলে!
দেখতে চায়! কোথা যায়! পথ তোমাদের—
কোন্ সাগরের উজল কূলে। (‘পথে’)

এই ধরনের কবিতা আরো রয়েছে। যেমন—

ঊষার সোনালি গহন গানে
জাগতে হবে,
চির নতুনের তপ্ত-তরুণ শঙ্খরবে!
বন্দর ঘাট, প্রান্তর মাঠ
সিন্ধু,
শহর!
এসেছে! এসেছে
— প্রভাতী প্রহর! (‘পদ্ম’)

নবীন কিশোর-কিশোরীর অনন্ত পথ-চলা বা চির-নতুনের জাগরণের গানকে কেন্দ্র করে রচিত এইসব কবিতা এক কথায় অনবদ্য। ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি, গান ও ধুয়া নিয়ে রচিত ‘গান ও ধূয়া’ প্রবন্ধের বিষয় মৌলিক নয়। তবে অজ্ঞাত পদকর্তার এই যে বিভিন্ন গ্রাম্য বা পল্লীগীতির সংগ্রহ, সংকলন, গীতের মর্মার্থ প্রদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এইসব গানের

ব্যাখ্যায় 'কবির সমাজ, প্রকৃতি এবং স্বয়ং কবি'কে উপলব্ধির সফল প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে বাচ্ তালুকের ধুয়া, নন্দপুরের ধুয়ার ইতিবৃত্ত তো বর্ণিত হয়েছেই। ''নগ্নপ্রায় অর্ধনীরনিমগ্ন সেই শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবা-কৃষকের হাতের 'হাতা' যখন 'শোলা' হইতে পাট ছাড়াইবার জন্য সটাসট-চটাপট শব্দ সমানভাবে উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন সেই অপূর্ব বাদ্যের তালে তালে মুক্ত স্বরে কৃষকেরা এই ধূয়াগীতি গায়।" ('গান ও ধূয়া', পৃঃ ২৯১)। কাছে-দূরের নানা ধরনের পথিক, নৌকা যাত্রীরা এই গানের সুরে অন্য এক ভাবলোকে যাত্রা করে। জ্যোৎস্না রাতে পাশের নৌকাযাত্রীর কানে এই সুর প্রবেশ করলে অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন-প্রাণ ভরে যায়। আসলে এসব গান ক্লান্তি অপনোদনের উপায়। এই গীতের যে অর্থোদ্ধার, সংকলন— সেখানেই প্রাবন্ধিকের মৌলিকতা।

তবে সব প্রবন্ধ ও নিবন্ধেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বিস্তারিত আলোচনা। যেমন— 'পৃথিবীর কথা' প্রবন্ধে ভূগর্ভস্থ যাবতীয় খনিজ পদার্থ, পৃথিবী যা যা উপাদানে গঠিত তাদের নাম, পৃথিবী গড়ে ওঠার বিস্তারিত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। 'পৃথিবী' প্রবন্ধে পৃথিবীর জন্মলাভের পরবর্তী ইতিহাস অতি সহজ ভাষায় অথচ বিস্তারিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, খুব কম গ্রন্থেই যা চোখে পড়ে। গাছপালা থেকে শুরু করে সমস্ত জীবের জন্মলাভ, বিবর্তনের কথাও এতে আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় মধু-কৈটভের পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা। মধু হল জল আর কৈটভ হল কীট। মানুষের সৃষ্টিকর্মের কথাও উল্লেখিত হয়েছে এতে। 'ম্যাজিক' প্রবন্ধে ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল বলতে কী বোঝায় তার সবিস্তার বর্ণনা তো রয়েছেই। 'পুজোর চিঠি'— এই নিবন্ধ বা রম্যরচনায় পল্টু, মণ্টু, ভোলা, লা লা, কিরণ, কেব্‌লা, পরেশ, নরু ইত্যাদি অজস্র বাঙালি যুবকের নাম, বীরভূম, সিলেট, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, মেদিনীপুর, কুচবিহার, কুমিল্লা ইত্যাদি বাঙালির ভ্রমণস্থানের বিবরণ রয়েছে। শুধু তাই নয় ঢাকা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, ধুলিয়ান, কৃষ্ণনগর, হুগলী, শিলিগুড়ি, শিলচর, বর্ধমান, খুলনা— ইত্যাদি স্থান মিলিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশের ছবি বঙ্গবাসীর চোখে এঁকে দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। রাবড়ি, জিলিপি, কচুরি, লুচি, ঝালের ঝোল, ছানাবড়া, আনারস, আঙ্গুর, তাল ইত্যাদি বাঙালীর পছন্দের মিষ্টি, খাবার, ফলের তালিকাও এতে সংযুক্ত হয়েছে। 'কথিকা'য় সূঁচ, সুতো, কাগজ, কাপড়, কাঁচি, বাঁশ, কাঠ, ছুরি, কাটারি, হাতুড়ি, বাটালি, করাত, দা, কুড়ুল, শাবল, কোদাল, পাটা ইত্যাদি নানান সরঞ্জাম— যা দিয়ে বাংলার ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন কাজের জিনিস গড়ে তুলবে বা কাজ করবে তার দীর্ঘ তালিকার উল্লেখ রয়েছে। রিক্সা, স্টিমার, ট্রেন, ট্রাম, বাস ইত্যাদি যানবাহন, শানাই, ঢোল, টিকারা, কাঁসি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দক্ষিণারঞ্জন বাংলার কিশোর-কিশোরীদের যে কোনও বিষয়েই যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'গ্রাম্য-গীতি'র

মহিমা খুব সহজভাবে বর্ণনা করেছেন প্রাবন্ধিক— "এ গানের ভাষা উন্মুক্তগাত্র সবলহৃদয় কৃষক-কবিরই উপযুক্ত। কবির যেমন অনাড়ম্বর মূর্তি, তাহার ভাষাও তেমনি নিরাভরণা, তাহার সুরও তেমনি বাধাহীন।" এ গান ভালো লাগার কারণ, কবি-কথাও বিস্তারিত।

আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী গ্রন্থের অন্তর্গত নিবন্ধগুলো রূপকধর্মী। এগুলোতে কল্পনাপ্রবণতা বেশি। *আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী* এবং *আমার দেশ*-এর অন্তর্গত নিবন্ধগুলোতে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ রয়েছে। সব নিবন্ধেই স্বদেশ, স্বভূমি, সত্যিকার সোনার বাংলার উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এই ছবিগুলোকে চলচ্চিত্রধর্মী বলা যেতে পারে। ছবিগুলো যেন সবাক, সচল।

শব্দ বা ভাষা ব্যবহার অভিনব। যেমন— অজীব, রোদ-ঝলন্ত, ঝলক খেলে, দুধের হাসি, হেতেড়ে, দোলন্ত, বলন্ত রোদ, সুঘন সুগন্ধ হাওয়া, শস্য-বিশস্য, উতল উৎসাহ, মহা-নীহারের আলো, ঝঙ্কারীণ্, অধ্বংস, অন্তহারা, হীরেলী নিশান, অযুত সন্তান ইত্যাদি। "বকেরাও পাখা চালাতে, দেখলে, ওই দূরে সবুজ শহর উঁচুতে মাথা তুলেছে হীরের সপ্তমুকুট পরা রোদ যেন চলে-যাওয়া আর আসবে-যুগের সহস্র কথা বলছে তার গলা জড়িয়ে ('শেষ ফুলদল')!" এই ভাষা ব্যবহার দক্ষিণারঞ্জনের পক্ষেই সম্ভব। "স্বদেশের পাখীর পাখায় থাকি, ফুলে থাকি জলে থাকি, জ্যো'স্নায়, শিশিরে আর সবুজ তৃণে থাকি, ধরার ধুলোতে থাকি, সন্ধ্যার মেঘে, নিশুতির স্বপ্নে কি ভোরের আলোতে থাকি— এসে হেসে তোমাদের আশীর্বাদ করব, অমল আলোর দল/ পুণ্য দেশের প্রাণরক্তের সচল মুক্তাফল!"— এ ভাষা শুধু উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যিকই ব্যবহার করতে পারেন। বিষয়-নির্বাচন, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা, ভাষাব্যবহারে নিজস্বতা তথা রচনাশৈলী— প্রাবন্ধিক দক্ষিণারঞ্জনের বলিষ্ঠতারই প্রমাণ দেয়।

তথ্যসূত্র ::

১ M.H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms,* 3rd Edition, Macmillan India Limited, First published in India 1978, p. 54

২ হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ,*বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৭

৩ তদেব

৪ কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৫; চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০১, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ২২৭

৫ অচিন্ত্য বিশ্বাস, পাঁচ-ছয় দশকের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঊনত্রিংশ উজ্জীবনী পাঠমালা (৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ - ২০ জানুয়ারি ২০১৬)।

৬ শ্রীশচন্দ্র দাশ, 'সাহিত্য সন্দর্শন', চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, ইণ্ডিয়া বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং, আল্‌ফা পাবলিশিং কনসার্ণ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৬,পৃ. ১৭৮।

৭ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তকবিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮,পৃ. ৩১১

৮ শ্রীশচন্দ্র দাশ, 'সাহিত্য সন্দর্শন', চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, ইণ্ডিয়া বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং, আল্‌ফা পাবলিশিং কনসার্ণ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ১৭৯

৯ তদেব, পৃ. ১৮০

৫. পঞ্চম অধ্যায়

<u>জীবনী, চিঠি, গান</u>

জীবনী, চিঠি, গান— এইসব সাহিত্য প্রকরণও দক্ষিণারঞ্জনের সৃজনশীল সাহিত্যের অন্তর্গত।

জীবনী

দক্ষিণারঞ্জন শুধুমাত্র একটা জীবনী রচনা করেছেন, তা হল *বাংলার সোনার ছেলে* (১৯৩৬)। বলাই বাহুল্য এই জীবনী রবীন্দ্রনাথের। এই জীবনী রচনার শুরুতে রাজা রামমোহন, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 'বাংলার সোনার ছেলে'দের অর্থাৎ বাংলাদেশের মহামানবদের সম্পর্কে মুখবন্ধ লিখেছেন লেখক। এই জীবনীর আবার 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'গীতাঞ্জলি'— এই দুই অংশ। রবীন্দ্রনাথ বাংলার গৌরব। ঐশ্বর্যরূপ লক্ষ্মী আর বিদ্যারূপ সরস্বতী তাঁর মধ্যে একত্রে বিরাজ করতেন। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, হাস্যকৌতুক, গান, প্রভৃতি নানা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যের ডালি ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রচনা করে নোবেল পুরস্কার পান। 'বিশ্বভারতী' নামক বিদ্যানিকেতন গড়ে তোলেন। 'বাঙালীর ভাষা'কে বিশ্ব সাহিত্যের সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থাপন করে গেছেন। বাংলার ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর জীবনী যেন রূপকথা। ''মূর্তিতে যেমন লোকটির প্রকৃত চেহারা আঁকবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে শিল্পের প্রতিও সুবিচার করতে হয়, জীবনী লেখককেও আলোচ্য চরিত্রটি এমনভাবেই আঁকতে হয়, যাতে আর পাঁচজন সেই চরিত পাঠে উৎসাহ পান অথচ তথ্যের বিকৃতি কোথাও না ঘটে।''[১] রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনা করতে গিয়ে জীবনী লেখক দক্ষিণারঞ্জন তথ্য অবিকৃত রেখে 'আর পাঁচজন' বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তিনি এখানে একাধারে ''অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সাহিত্যিক রসবোধের সঙ্গে''[২] রবীন্দ্রনাথের জীবন 'চিত্রিত' করার চেষ্টা করেছেন। এর দ্বারা বাংলার কিশোর-কিশোরীর কাছে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার খবর পৌঁছে গেছে। ''বাংলার সোনার ছেলের এমন সত্য কাজ, সুন্দর এত, এতই মোহন, যেন একটি সদ্য রূপকথার মত। বাঙালীর ছেলে-মেয়েদের কাছে তা নিত্য সুন্দর। প্রতি সন্ধ্যার দীপ।'' ('বাংলার সোনার ছেলে', পৃ. ১৮৯)। এটা 'অপূর্ব্ব বই'। 'বাংলার সোনার ছেলে' 'রবীন্দ্রনাথের সুন্দরতম জীবনী'।

চিঠি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'একটি চিঠি' লিখেছেন, শিরোনাম— 'তোমাদের বয়সে আমি'। শিশু-সাহিত্য সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন 'পরম স্নেহভাজনেষু' বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে এই চিঠিটা লিখেছেন। রচনাকাল— ১লা মাঘ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। বিজন গঙ্গোপাধ্যায় লেখকের কাছ থেকে তাঁর ছেলেবেলার দুষ্টুমি ভরা গল্প শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। লেখক জানিয়েছেন দুষ্টুমির গল্প শুনে যারা 'সুখী' হয় তারা উচ্ছল, সতেজ, 'চিরসবুজ'। এই রচনাটা আকারে প্রকারে চিঠি হলেও নিত্য শুভানুধ্যায়ী লেখক তাঁর স্নেহাস্পদকে একটা গল্প বলেছেন, তাঁর ছেলেবেলার 'অগুস্তি'র গল্প। এতে রয়েছে জাহ্নবী চৌধুরানীর গাছের লিচু চুরি করা ও ধরা পড়ে যাওয়া, সবশেষে চুরির শাস্তি তথা দুষ্টুমির শাস্তি হিসাবে ও চৌধুরানী কর্তৃক পুরস্কার স্বরূপ ফল খাওয়ার নেমতন্ন লাভ। তাঁর গল্প, কবিতায় যেমন তারুণ্যের জয় জয়কার, তিনি চিঠিতেও তেমনি সবুজের, প্রাণোন্মাদনার নিশান উড়িয়েছেন। ভাষা তেমনই সংহত, সংযত, সুললিত। ‘‘পত্র যেখানে সাহিত্য হয়ে ওঠে, সেখানে প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে যায়— মনের অত্যন্ত কাছাকাছি যে আছে তার কাছে এখানে লেখক তাঁর হৃদয় উন্মোচন করেন। ব্যক্তিগত তা এখনও থাকে, তবে প্রয়োজনভিত্তিক থাকে না— হয় লঘু আলাপচারিতা, অথবা গভীর অনুভূতির প্রকাশে তা সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সেক্ষেত্রে পত্রটি যার কাছে প্রেরিত হয়েছে শুধু তার কাছেই নয়, সাহিত্যমনস্ক অন্য যে কোন মানুষের কাছেই পত্রটি উপভোগ্য।’’[৩] দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'মনের অত্যন্ত কাছাকাছি' অবস্থানকারীর কাছে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন। এই পত্র বা চিঠিও একেবারেই 'প্রয়োজনভিত্তিক' নয়। এখানেও পত্রকার পত্রে 'লঘু আলাপচারিতা' শুধু নয়, একেবারেই সহজ, সরল ভঙ্গিতে একটা গল্প বলেছেন। আর এই পত্র শুধু পত্র প্রাপক বিজন গঙ্গোপাধ্যায় নয়, বাংলার যে কোন পাঠক-পাঠিকা বিশেষত কিশোর-কিশোরীর কাছেও সমান চিত্তাকর্ষক। পত্র শুধু ‘‘নিছক ব্যক্তিগত সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে না থেকে পত্রলেখকের অন্তর্মানস ও রসলোকের উন্মোচন ঘটায়।’’[৪] বলাই বাহুল্য, এই পত্রেও পত্রলেখক দক্ষিণারঞ্জনের রসময় অন্তর্জগৎ ধরা পড়েছে।

গান

দক্ষিণারঞ্জন একটাই গান লিখেছেন। 'দেশ' নামাঙ্কিত কবিতা আবার স্বদেশ প্রেম পর্যায়ের গান, যে গানের স্বরলিপি রচনা করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। এর থেকে মনে হয় ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাতায়াত ও ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। এই স্বরলিপি প্রকাশিত হয় 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'য় (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ৮ম ভাগ, ১ম সংখ্যা)। রাগ— ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, তাল— দাদরা। এ গানের ভাষা খুবই আবেগমথিত।

দেখা যাচ্ছে দক্ষিণারঞ্জনের রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠি, গান, জীবনী — যাই হোক না কেন সবেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতি, পুরাণ, সাধারণ মানুষ, স্বদেশপ্রেম, বেঁচে থাকার আদর্শ, যুক্তি শৃঙ্খলা, বিজ্ঞানের জ্ঞান, মানবিকতাবোধ। আর সব কিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছে শিশুসুলভ পরিবেশ সৃজন। এখানেই দক্ষিণারঞ্জনের মৌলিক ও সংগৃহীত তথা লোকসাহিত্য এক হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র ::

১ হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১২

২ তদেব, পৃ. ২১২-২১৩

৩ তদেব, পৃ. ২১৬ ঘ

৪ কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৫; চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ২৪৬

তৃতীয় পর্ব

দক্ষিণারঞ্জনের লোকসংস্কৃতির উপাদান ঃ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

বাংলা লোকসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অবদান অপরিসীম। বাংলার লোকসংস্কৃতি, লোককথা তথা রূপকথার সাহিত্যরসে মুগ্ধতা এবং বাংলার প্রাচীন মৌলিক গল্পকথাকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মুদ্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বাংলার যেসব লেখক গোষ্ঠী দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন তাঁদের পুরোধাপুরুষ। তিনি ''সুপরিকল্পিত উপায়ে মৌখিক বাংলা রূপকথাকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে, বাংলা রূপকথার সৌন্দর্য ও সাহিত্য মূল্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহৎকার্যে আত্মনিয়োগ''[১] করেছিলেন। তিনি লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা বা লোককথাকে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে সংকলন করেছিলেন। তাঁর এই সদিচ্ছার পেছনে কাজ করেছে সাহিত্য রস পিপাসা ও লোকসাহিত্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। এই লোকসাহিত্য ''যে প্রাচীন রক্ষণশীল কিংবা নিরক্ষর সমাজেরই উপভোগ্য নয়— এর ভিতর দিয়ে যে সর্বকালীন জীবন-সত্য প্রকাশ করা সম্ভব''[২]— দক্ষিণারঞ্জন এই দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী ছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ও বিদেশী ভাষাশিক্ষার গৌরবে গর্বিত বাঙালি যখন বাংলার লোককথাকে ভুলে যেতে বসেছিল, স্বাজাত্য অভিমানী দক্ষিণারঞ্জন তখনই বাংলার প্রাচীন মৌখিক গল্পকাহিনিকে সযত্নে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখার বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির উপাদানকে রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা ও গীতিকথা— এই চার ভাগে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় বিপুল কথাসাহিত্যকে *ঠাকুরমা'র ঝুলি* (১৯০৭), *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮), *ঠা'ণদিদির থলে* (১৯০৯) ও *দাদামশা'য়ের থলে* (১৯১৩) নামক গল্পগ্রন্থে স্থায়ী রূপদান করেছেন। এর মধ্যে ব্রতকথা হল *ঠা'ণদিদির থলে*, রূপকথা হল *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, রসকথা *দাদামশায়ের থলে* আর গীতিকথা *ঠাকুরদাদার ঝুলি*। ''আমাদের মতো লোকের অতি সামান্য বৈভবের গণ্ডি, সামাজিক দায়ের রাজ্য ছাড়িয়ে দক্ষিণারঞ্জনের জীবনদর্শনের আনন্দ ভূমিতে, কাঁপতে কাঁপতে হলেও, পৌঁছে যাই আপাত অদৃশ্য ডানাঅলা বিচিত্র ঘোড়ায় চড়ে।''[৩]

তথ্যসূত্র ::

১. মলয় বসু, বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ১৫

২. তদেব

৩. নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, চিরদিনের মানবসত্তা ও ঠাকুরমার ঝুলি, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৫৫

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

<u>ব্রতকথা</u>

ব্রত বলতে সাধারণত নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। ‘ব্রত’ শব্দের মধ্যে নারীদের অন্তর-অন্দরমহলের নিজস্ব কৃত্য সংশ্লিষ্ট রয়ে যায়। ‘‘মানুষের কামনা বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত অর্থাৎ কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তাই হল ব্রত।’’[১] ‘বাংলার পবিত্র কথা’ ‘বাংলার ব্রতকথা’। এই ব্রতকথার নামকরণের বানানের প্রকারভেদ রয়েছে। কোথাও ‘ঠাণ’দিদির থলে’, ‘ঠা’ণদিদির থলে’ অথবা কোথাও ‘ঠানদিদির থলে’। এই ‘ব্রতকথা’ শুধু ‘কথা’ অথবা ‘ব্রতের কথা’। বাংলার নারীদের ব্রতকথা বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান। কিন্তু এই ব্রতকথাকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হিসাবে বলা যায়— ‘‘বাংলার মেয়েরা যে ব্রত পালন করে, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বর্গ বা মোক্ষ-লাভের কামনা প্রকাশ পায়না বরং ঐহিক জীবনের অভাব-অনটন হইতে পরিত্রাণের কামনাই প্রকাশ পায়। স্বচ্ছল গৃহবাসই তাহাদের স্বর্গবাস, মানবিক সম্পর্কের বন্ধনের মধ্যেই তাহাদের মোক্ষের আনন্দ। অতএব ধর্মবোধ যেখানে এমন একান্ত বাস্তব জীবনাশ্রিত, সেখানে তাহার সম্পর্কিত শাস্ত্র ও বাস্তব জীবন অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বমার্গে বিচরণ করিতে পারে না’’[২]। সেই কারণে ব্রতকথা বাংলা লোককথার অন্তর্গত। ব্রতকথা, রূপকথা ও উপকথার মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যে একদিকে রূপকথার কল্পনার ছোঁয়া যেমন আছে, অন্যদিকে তেমনই আছে উপকথার বাস্তবতা। ‘‘The fundamental religion in which the Bengalis are “born and brought up” is called brata. It is a domestic form of religion and apparently not associated with temple service. Bratas are performed exclusively by womenfolk with a view to fulfilling their aspirations by means of magical rites.’’[৩]

নারীদের আচরণীয় এই ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে আদিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও বৈদিক ধর্মবোধ লুকিয়ে রয়েছে। ব্রতকথা হল মূলত নারীদের আচার-অনুষ্ঠান— কৃত্যালি ও তৎসহ কাহিনি। ‘‘The brata Kathas or tales interspersed with hymns and attended

with religious observances. Some of these seem to have come down to us from hoary antiquity. The deities addressed are those for the most part to whom the Aryan pantheon has not opened its doors. Their names are unknown and non-Sanskritic, and the mode of their worship is strange."[৪]

'কথা' বা কাহিনি যুক্ত থাকায় ব্রতকথা লোককথারও অংশবিশেষ যার মধ্যে শুধু ইচ্ছা বা কামনা পূরণ নয়, লোকগোষ্ঠীর কঠিন জীবনসংগ্রামও যুক্ত হয়ে পড়ে। ''অভাব-অনটন-দারিদ্র্য যাদের নিত্যসঙ্গী, যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে নানারকম অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, তাদের মানসিকতা, তাদের হাবভাবই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ব্রতের ছড়া বা ব্রতকথার কাহিনির মধ্যে। সেইদিক থেকে তাকালে এই ব্রতকথাগুলি ব্রতীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং মানসিকতার পরিচায়ক। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানের নিরিখে এই ব্রতকথাগুলির তাৎপর্য অসাধারণ।"[৫] দক্ষিণারঞ্জন বাংলার ব্রতকথা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ব্রতকথা বিষয়ক গ্রন্থ হল *ঠা'ণদিদির থলে*। *বাংলার ব্রতকথা*-য় দক্ষিণারঞ্জন বিভিন্ন ঋতুতে পালনীয় বা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ব্রতের নিয়ম বা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই ব্রতের চারটে পর্যায়— প্রথমে আকাঙ্ক্ষা, তারপর আলপনা, ছড়া এবং সবশেষে ব্রতকথা। দক্ষিণারঞ্জন যে সব ব্রত সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন সেই ব্রতগুলো যথাক্রমে— হরিচরণের ব্রত, রণে-এয়ো ব্রত, বসুধারা ব্রত, ভদ্রালী বা ভাদুলী ব্রত, যমপুকুর ব্রত, কুল-কুলতী ব্রত, সেঁজুতী ব্রত, থুয়া ব্রত, তুষ-তুষলী ব্রত, তারা ব্রত, মাঘ-মণ্ডল ব্রত, ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রত, ফাগুন-কোণা ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, শঙ্কর ব্রত, গো-কল ব্রত, অশ্বত্থ-নারায়ণ ব্রত, পৃথিবী ব্রত। সবশেষে আবার হরিচরণের ব্রত ও রণে-এয়ো ব্রতের প্রতিষ্ঠা বা উদ্যাপনের প্রসঙ্গ রয়েছে। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র (১৯০৭) পরে *ঠা'ণ দিদির থলে* (১৯০৯) রচিত হলেও ''ঠানদি দক্ষিণারঞ্জনের ভূমিকা যেন ঠাকুরমার ভূমিকার থেকে আর-এক ধাপ এগিয়ে গেছে। পুরুষ দক্ষিণারঞ্জন আর কেবল ঠাকুরমা নারী সেজে গল্পই শোনাচ্ছেন না; নিজে একেবারে ঠানদির জায়গায় দাঁড়িয়ে কুলবধূদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদের কর্তব্যকর্মের কথা। ... যে-কাজ প্রবীণাদের করার কথা, যে কাজ করা না হলে গৃহবধূ, সুভাষণে গৃহলক্ষ্মীদের কর্তব্যচ্যুতি পরিবারের পরম্পরার ধারাকে টলিয়ে দিতে পারে — সেই

কাজ যাতে যথাযথ সম্পন্ন হয়, সেই দায়িত্বই কি দক্ষিণারঞ্জন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন?"[৬]

দক্ষিণারঞ্জনের *ঠা'নদিদির থলে* থেকে বাংলার ব্রতপার্বণগুলোকে উদ্ধার করা যাক্। প্রথমে বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হরিচরণের ব্রত। 'বছরের প্রথম মাসের' 'প্রথম দিনে' এই ব্রত শুরু হয়। সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সকালে শুদ্ধ বস্ত্রে এই ব্রত পালন করতে হয়। চার বছর ব্রত না করলে ফল লাভ হয় না। ব্রতের উপচার তামার টাট বা ছোট রেকাব, শ্বেত চন্দন, ধান, দূর্বা, ফুল। এই ব্রতের উদ্দেশ্য শ্রীহরির শ্রীচরণ লাভ নয়, বরং হিমালয়ের মত পিতা, মেনকার মত মাতা, রাজরাজেশ্বর স্বামী, সভা-উজ্জ্বল জামাই, নিত্যানন্দ ভাই, গুণবতী বৌ, রূপবতী ঝি, লক্ষ্মণসম দেবর, দুর্গার মত আদর, কুলপাবন অমর পুত্র লাভ ও স্বামীর কোলে মাথা রেখে এক গলা গঙ্গাজলে গঙ্গাপ্রাপ্তি। ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হওয়ার সব কামনাই এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত। হরিচরণ ব্রতের নিয়ম ও উদ্দেশ্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাংলার ব্রত* গ্রন্থে একই থাকলেও অবনীন্দ্রনাথ এই ব্রতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা দক্ষিণারঞ্জনে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট মেয়েরা এই ব্রতের ব্রতিনী। "কিন্তু এই ব্রতে ছোটো মেয়ের মুখের কথা বা প্রাণের আনন্দ, এমন-কী ছোটোখাটো আশাটুকু পর্যন্ত নেই। পাকা-পাকা কথা এবং জ্যাঠামিতে ভরা এই শাস্ত্রীয় ব্রতটি অত্যন্ত নীরস।"[৭] আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় ছোট বালিকারাও গুরু বা পুরোহিততন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি।

'রণে-এয়ো ব্রত'ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে শুরু করতে হয়, চার বছর পালনীয়। উপচার হল আলপনা দেওয়ার পিটুলি, গোটা ধনে, পরিষ্কার নেকড়া, নতুন সিঁদুর কৌটো, ধান, কচি বা কাঁচা আম। এ ব্রতের লক্ষ্য 'রণে রণে এয়ো', 'জনে জনে সুয়ো', 'আকালে লক্ষ্মী', 'সময়ে পুত্রবতী', সর্বোপরি 'স্বামী সোহাগিনী' হওয়া। অবনীন্দ্রনাথ বলেন: "এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্যব্রত হলেও আর্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নীচে ছিল তা তো বলা যায় না। রণচণ্ডীর যে মূর্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত সুশোভন আদর্শ' এখানে লক্ষ করা যায় সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।"[৮]

ব্রত নির্বাচনের ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ কার্তিকের ব্রত, ব্রাহ্মণাদর, আদর সিংহাসন, কুক্কুটীব্রত, রা'লদুর্গা, লক্ষ্মীব্রত, কুলাই ঠাকুরের ব্রত, শস্পাতার ব্রত, ভাঁজো, সুবচনী ব্রত ইত্যাদি ব্রতের উল্লেখ করেছেন দক্ষিণারঞ্জন যেগুলো আলোচনা করেননি। আবার দক্ষিণারঞ্জন যমপুকুর ব্রত, কুল-কুলতী ব্রত, থুয়া ব্রত, ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রত, ফাগুন-কোণাব্রত, শঙ্কর ব্রত, গো-কল ব্রত ইত্যাদি যেসব ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন, *বাংলার ব্রতকথা*-য় সেসব নেই।

'বসুধারা ব্রত' জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, চার বছর এই ব্রত পালনের সময়সীমা। দুপুরে বা স্নানের সময় এই ব্রত পালন করা হয়। শুধুমাত্র প্রথম দিন ব্রতের আগে উপবাসে থাকতে হয়। ব্রতের উপকরণ মাটির নতুন ঘট, ঘটে ছিদ্র করার জন্য সূচালো লোহা, আম সহ আটটা ফল, পরিষ্কার ধোয়া বাটি, 'ভাল ভাল' আটটা ফুল, বট আর পাকুড় গাছের ছোট ডাল, কিছুটা পিটুলি। এই ব্রত তুলসী তলায় করতে হয়। এই ব্রত পালন করলে পৃথিবী বৃষ্টিস্নাতা হবে, 'চাঁদের কোণা', 'হীরের দানা', 'অষ্ট সোনা' আট ভাই মিলবে। ব্রতিনী হবে আট ভাইয়ের সতীলক্ষ্মী বোন, ধর্মপরায়ণা, পতৃকুল-মাতৃকুল-শ্বশুরকুলের মুখোজ্জ্বল করবে, তার 'অষ্টকোলে অষ্ট পুত' খেলা করবে। মূলত জলধারা বা বৃষ্টির কামনায় এই ব্রত। অবনীন্দ্রনাথের মতে মানুষ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ব্রত করছে না, ভবিষ্যতে কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্রত পালন করছে। যেমন— প্রখর গ্রীষ্মে বর্ষার বারি সিঞ্চনের কামনায় বসুধারা ব্রত। কারণ "in popular belief that seasonable and sufficient rainfall depends on a due supply of sunshine."[৯] তবে এ ব্রতের জল ঢালবার মন্ত্রের কোন কোন অংশ শুনলে শুধু দীর্ঘশ্বাসের হুতাশ মনে হয়, এর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছুই নেই। তিনি আরো বলেছেন ব্রতে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অনুষ্ঠানের খুব নিকট সম্পর্ক। তাই নারীর দল বৃষ্টির আশা করেই থেমে থাকছে না। বরং মাটির ঘটকে মেঘ কল্পনা করে, ঘটের মধ্যে লোহার শিক দিয়ে ছিদ্র করে বট-পাকুড় গাছের মাথায় জল ঢেলে বৃষ্টির সৃষ্টি করে সংগঠিত 'সচল জীবন্ত কামনা' জানিয়েছে। এই ধরনের ব্রত বিদেশেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দক্ষিণারঞ্জন আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কোনও ব্রত পালন করার কথা বলেননি।

ভাদ্র মাসে পালিত হয় 'ভদ্রালী' বা 'ভাদুলী ব্রত'। এ ব্রত ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত করতে হয়। চার বছর পালন করলে তবেই ব্রতের পূর্ণতা। ভোরে বা বিকালে যখন ইচ্ছা এ ব্রত করা যায়। ব্রতের উপকরণ বৃষ্টির জল, নদীর জল, একটা পিঁড়ি, নতুন পৈতে, দুটো পাকা তাল, কিছুটা চাল-ডাল-তরিতরকারি-তেল-নুন-মশলা-হলুদ সহ একটা সিধে, একটা পুঁটি মাছ, এক কাঁদি কলা, কলাগাছের খোল দিয়ে তৈরি একটা নৌকো, ফুল, চন্দন, সিঁদুর, আলপনা দেওয়ার জন্য পিটুলি। "এই ব্রতটিকে বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্রতও বলা যায়। বর্ষার পরে আত্মীয়-স্বজন যাতে বিদেশ থেকে, সমুদ্র যাত্রা থেকে স্থল বা জলপথে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে এই কামনায় নারীরা এই ব্রত পালন করে।"[১০] আবার একই সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়তার দিকটাও গুরুত্ব পেয়েছে, তা সে বৃষ্টিরই হোক বা নদীর হোক। গাছপালা, জীবজন্তুর কথাও রয়েছে। আলপনায় সাত সমুদ্র আঁকার কথা বলা হয়েছে। এই ব্রতের মন্ত্র হল:

নদি! নদি কোথায় যাও? বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।

নদি! নদি! কোথায় যাও? স্বামী শ্বশুরের বার্তা দাও!

মন্ত্রে আবার রামের সেতুবন্ধনের প্রসঙ্গও চলে আসে। প্রতিবারে এক-একটা আলপনার চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ফুল ধরে ভিন্ন ভিন্ন ছড়া উচ্চারণ করে ব্রতিনীরা। তবে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের ফুল ধরা আর পুজোর ফুল দেবতার পায়ে দেওয়ার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রতে ফুল দেওয়া হয় নদী-বাঘ-মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্তিকে ফুল দিয়ে পুজো করার জন্য নয়, বরং নদী ও বনের কামনা শেষ হয়ে গেছে এটা মনে রাখার জন্যই ফুল ধরা হয়। স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, পিতা, ভাই সহ একান্ত নিকট জনের কাছ থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণাও এই ব্রতের মধ্যে ব্যক্ত হয়। নদীমাতৃক বাংলায় বাণিজ্য যে অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক মাধ্যম সেই বিষয়টাও অনুভূত হয়। এই ব্রতের ছড়া, আলপনা, ক্রিয়াকরণ ভালোভাবে লক্ষ করলে একটা নাটকের দৃশ্যপট ফুটে ওঠে। এ যেন প্রতীক্ষা, বিরহ ও মিলন এই তিন অঙ্কের নাটক। অবনীন্দ্রনাথের মতে ভাদুলী যেন এক নাটিকা।

এরপর পালিত হয় 'যমপুকুর ব্রত'। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে সকালবেলায় এই ব্রতের সূচনা আর কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন সমাপ্তি। কাক ডাকার আগে পুজো শেষ করতে হয়।

এই ব্রতও চার বছর ধরে করতে হয়। সধবা, কুমারী সকলেই এ ব্রত পালন করতে পারে। এই ব্রত পালন করলে দেশকে মড়কের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। প্রথমে পূর্বদিকে মুখ করে বসে চার কোণা একটা পুকুর কেটে তাতে একটা খাল রাখতে হয়। এছাড়া লাগবে ধান, মান, কলা, কচু গাছ, কল্‌মী শাক, শুষ্‌ণী শাক, হলুদ গাছ, তুলসী গাছ, চারটে কড়ি, চারটে সুপারি, চারটে হলুদ, পুকুর কাটা মাটি দিয়ে তৈরি হাঙর, কুমীর, কুচ, কচ্ছপ, ষোলটা পুতুল, কাক, বক, 'চিলে-টিলে', যমের মা। এই ব্রতের মন্ত্র 'ধান মান কলা কচু তুলসী হলুদায় নমঃ।' এভাবে শুরু হয়। পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী, স্বামী আর নিজের নামে এক ঘটি জল নিয়ে পুকুরে ঢেলে ব্রতিনী পুকুর পুজো করে। এই ব্রত পালন করলে পরিবার ও সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি এবং যমরাজের 'তাড়না' থেকে মুক্তিলাভও ঘটে। দক্ষিণারঞ্জন এই ব্রতের দুরকম কথা বা কাহিনির উল্লেখ করেছেন। এই ব্রতকে 'যমের মা-বুড়ীর ব্রত' বা 'কাক-চিলের ব্রত'ও বলা হয়। তার আবার কাহিনি অংশ একটু পৃথক। পৌরাণিক যমপুষ্করিণী ব্রতের পরবর্তী সংস্করণ বলা যেতে পারে এ ব্রতকে। ''প্রবাসী পত্রিকার ১৩১৬, ভাদ্র সংখ্যায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'বাঙ্গালার ব্রত ও কথা' নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে কুমারী ব্রতের আলোচনা করেছেন। যমপুকুর ব্রতের নিয়ম, সময় ও এই ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথাটিও লিপিবদ্ধ করেছেন।''[১১] *বাংলার ব্রতকথা*-য় দক্ষিণারঞ্জন কুমারী ব্রতের উল্লেখ করেননি।

'কুল-কুলতী ব্রত'ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন শুরু করে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন শেষ করতে হয়। চার বছর করতে হয় এ ব্রত। স্বর্গে বাতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্রতিনীরা সন্ধ্যাবেলায় তিন গণ্ডা তিনটে অর্থাৎ পনেরোটা করে কুলপাতা তুলসীতলায় পেতে নতুন সলতেয় প্রদীপ জ্বেলে ব্রত শুরু করে।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন 'সেঁজুতী ব্রত'-এর শুরু, অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিন শেষ। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নান সেরে ব্রতিনীরা উঠোন, বারান্দা, ছাদ বা দালানের মধ্যে আলপনা দিয়ে ব্রতের সূচনা করে। সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই এই ব্রত পালন করতে পারে। সেঁজুতী ব্রতের অনুষ্ঠান না করলে অন্য সমস্ত ব্রত ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই বেশিরভাগ নারী কুমারী অবস্থায় এই ব্রত সম্পাদন করে থাকে। কোথাও কোথাও এই ব্রতকে 'সাঁঝ পূজনীর ব্রত'-ও বলা হয়। ব্রতের উপকরণ পূর্ণ ঘট, ফুল, চন্দন। মন্ত্র 'নমঃ শিবায়'। নারীরা

পিতা-মাতা-ভাইয়ের মঙ্গলে, তারপর নিজের মঙ্গলে, সতীন না হওয়ার দোষ কাটাতে এবং ধর্মে মতি রাখতে এই ব্রত করে থাকে। বিশেষত ‘‘সপত্নীর সর্বনাশ কামনাই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত ধন ধান্য অলঙ্কার প্রভৃতি সংসারের তাবৎ সুখ-সৌভাগ্য লাভ করাও ইহার অন্যতর লক্ষ্য।’’[১২] প্রথম দিন সকালে শুরু হলেও পরের দিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় ব্রত পালন করতে হয়, তাই সেঁজুতী। ব্রত পূর্ণ হলে প্রতিষ্ঠার সময় ‘বুড়োর ঘরে ঘিয়ের বাতি’ এই কথাটা বলতে হয়। ‘বুড়ো’ হলেন শিব। তখন ষোলটা ঘরে ষোলটা বাতি আর শিবের ঘরে একটা ঘিয়ের বাতি দিতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন সেঁজুতী বেশ বড় ব্রত। ব্রতিনী প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিস আলপনা দিয়ে এঁকে তার প্রত্যেকটায় ফুল ধরে টুকরো টুকরো ছড়া বলে। তবে এই ছড়ার মধ্যে কামনাই প্রকাশ পায়, আবেগের অনুরণন ঘটে না। আবার কারো মতে ‘‘এই ব্রতের আলপনায় চিত্রিত ছবিগুলি যেন এক একটি বিশিষ্ট প্রতীক। এই প্রতীকগুলিকে অবলম্বন করে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের এক অকপট অভিব্যক্তি ব্রতের ছড়ায় ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠে।’’[১৩] এই ব্রতের ছড়ার মধ্যে বাংলার অতি পরিচিত কয়েকটা প্রবাদের সন্ধান মেলে। যেমন— ‘‘বঁটি বঁটি বঁটি। সতীনের শ্রাদ্ধের কুট্‌না কুটি।।’’, ‘‘অশথ কেটে’ বসত করি, সতীন কেটে’ আল্‌তা পরি।।’’, ‘‘খোরা খোরা খোরা। সতীনের মাকে ধ’রে নিয়ে যায় যেন তিন মিন্‌সে গোরা।।’’ ইত্যাদি।

অগ্রাণ মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু করে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত ‘থুয়া ব্রত’ পালন করতে হয়। এই ব্রতও পর পর চার বছর ধরে পালিত হয়। ব্রতের দিন সকাল বেলায় উঠোনে ছোট্ট একটুখানি পুকুর কেটে সেই পুকুরের নতুন মাটি তুলে থুয়া (মাটির স্তূপ) বসিয়ে এ ব্রত করতে হয়। মাথার দিক সরু, চারদিকে শির-তোলা টিপির মতন পাঁচটা থুয়া তৈরি করে পুকুরের উত্তর কিনারায় আলপনা দিতে হবে, তারপর মাঝে একটা থুয়া, চারপাশে চার থুয়া সাজালে তবে থুয়ার পাট হল। থুয়া পুজো করার পর ব্রতন্তী ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করলে মা আশীর্বাদ করে বলেন : ‘‘অকালে ভাতন্তী; সকালে পুতন্তী; রণে বনে আয়তী; ধনে জনে সুয়তী’’ হতে। এই ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়। এই ব্রত বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরেও প্রচলিত আছে।

অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত সকালবেলায় 'তুষ-তুষলী ব্রত' অনুষ্ঠিত হয়। ব্রত করতে লাগে নতুন আলো চালের তুষ, কালো গাই-গরুর গোবর, সর্ষে ফুল, মুলোর ফুল, দূর্বা, মালসা। তুষ আর গোবর মেখে 'ছ' বু'ড়ি ছ'গণ্ডা' গুলি পাকিয়ে প্রত্যেক গুলির মাথায় পাঁচ গাছি করে দূর্বা গুলির মাথায় বসানো হয়। এরপর সব গুলি একটা মালসায় রেখে দিয়ে শুধু চারটে গুলি আর একটা মালসায় করে ব্রতিনী সামনে রাখে। তারপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে গুলির ওপর সর্ষের ফুল দিয়ে তার ওপর হাত চেপে রেখে বা ধরে রেখে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে। এই দেবী শস্যের দেবী ও মঙ্গলময়ী। শুধু তাই নয়, এই ব্রত পালন করলে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, রামের মত স্বামী— দশরথের মত শ্বশুর— কৌশল্যার মত শাশুড়ি লাভ করা যায়, সীতার মত সতী— কুন্তীর মত পুত্রবতী— পৃথিবীর মত ধীর— গঙ্গার মত শীতল হওয়ার বাসনায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কোদাল-কাটা ধন— গোয়াল-আলো গরু— দরবার-আলো পুত্র— সভা-আলো জামাই প্রাপ্তিও ঘটে। কেউ মনে করেন ''গোময় মিশ্রিত তুষের পূজাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। কেবল বালিকারাই এই ব্রতের অধিকারিণী। স্বামীগৃহে গমন করিয়া রন্ধন শালায় প্রবেশ করিলে তুষ ও গোময় খণ্ডের (ঘুঁটে) ধূমে যেন ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যেই বোধহয় গোময় ও তুষের পূজা প্রচলিত হইয়াছে।''[১৪] ব্রতের শেষ দিন যত জন ব্রতন্তী তাদের প্রত্যেকের জন্য ছোট ছোট ছয় বুড়ি ছয় গণ্ডা (১৪৪টা) ময়দার 'গুলি' তৈরি করে নতুন হাঁড়ি বা কোন পরিষ্কার বাসনে ঐ ময়দার 'গুলি' দুধে জ্বাল দিতে হয়। পিঠের মত হলে নামিয়ে নেওয়া হয়। এবার মালসায় যে এক মাসের ব্রতের ছয় বুড়ি ছয় গণ্ডা তুষলীর 'গুলি' রয়েছে সেগুলোর ওপর আগুন জ্বালিয়ে প্রত্যেক ব্রতিনী পেছনে রেখে গুলি-পিঠে খেতে বসে। এই সময়

তুষ-তুষলী! স্বর্গে ভাসা'লি।।

আখা জ্বলন্তি; পাখা চলন্তি;

ইত্যাদি মন্ত্র বলা হয়। খাওয়া শেষ হলে তুষলী ভাসাতে যেতে হবে। কিন্তু তুষলী জ্বলে গেছে, তাই মালসা মাথায় তুলে নিয়ে ঘাটে যেতে যেতে মন্ত্র বলে:

তুষলী গো রাই! তুষলী গো ভাই! তোমার ব্রতে কি বা পাই?

ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা গুলী খাই। তোমাকে নিয়ে জলে যাই।।

আবার তুষলী ভাসাবার মন্ত্র আলাদা—

তুষ-তুষলী গেল ভেসে।

বাপ মার ধন এল হেসে।। ইত্যাদি।

এভাবে চার বছর এই ব্রত পালন করতে হয়। অঞ্চল ভেদে এই ব্রতের 'গুলি'র সংখ্যা ভিন্ন হয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই জায়গাতেই তুষ-তুষলী বা তোষলা ব্রতের প্রচলন রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এই ব্রত সম্পর্কে বলেছেন ব্রতের নাম এবং উপকরণ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এটা 'সারমাটি' দিয়ে কৃষিক্ষেত্র উর্বর করে তোলার ব্রত। এই ব্রতের ছড়াগুলো থেকে গ্রামবাংলার সরল সাধারণ দিন যাপনের ছবি পাওয়া যায়। পৌষমাসে বাংলায় বেশ শীত থাকে। কুয়াশার চাদর সরিয়ে গ্রাম যখন শিশিরভেজা সকালে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে, তখন মেয়েরা ব্রত করার উদ্দেশ্যে ক্ষেতের দিকে চলে। এই ক্ষেতে যাওয়ার কথা দক্ষিণারঞ্জন বলেননি। ব্রতিনীর 'আসন পিঁড়ি, এলোচুল' অবস্থায় ব্রতের অনুষ্ঠান করার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রত করার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এই ব্রত-অনুষ্ঠানের আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন: ব্রতের শেষ দিনে মেয়েরা সূর্যোদয়ের আগে ব্রত শেষ করে স্নান সেরে নদীতে তোষলা ভাসাতে যাওয়ার পথে 'শীতের জল-স্থল-আকাশের প্রতিধ্বনি' দেয়, কনকনে ঠাণ্ডায় সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের বাসনা জাগে। নদীর কুলুকুলু রব, পাখিদের কলতান যেন বরযাত্রার বাজনা। রাতের শিশির-সিক্ত শাকসবজি ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় বরবেশী সূর্যের আগমনে সোনারঙের আলো ফুটে ওঠে। তোষলার সরা বা মালসা নদীতে ভাসিয়ে তোষলার সারমাটি আর সূর্য— চাষের এই দুই প্রধান মাধ্যমকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েরা 'জলে ঝাঁপাঝাঁপি বালিখেলা' খেলে, এরপর সূর্যোদয় দেখে স্নান সেরে ব্রতের সমাপ্তিতে সূর্যোদয়ের বর্ণনায় ছড়া কাটে—

রায় উঠছেন রায় উঠছেন বড়ো - গঙ্গার ঘাটে।

যেখানে অবনীন্দ্রনাথের আবেগঘন বক্তব্য: ''তোষলা ব্রতের অনুষ্ঠান, এই শীতের প্রভাতের দৃশ্যপটগুলি, আর সদ্যঃস্নাত মেয়েদের মুখে সিন্দূর এবং মার্জিত তামার বর্ণ রক্তবাস সূর্যের উজ্জ্বল বর্ণনা— আমাদের সহজেই সেই কালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে দেখি মানুষে আর

বিশ্বচরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে; গড়াপেটা শাস্ত্রীয় ব্রতের এবং হিন্দুয়ানির আচার-অনুষ্ঠানের চাপনে মানুষের মন যেখানে সব দিক দিয়ে অনুর্বর, নিরানন্দ এবং প্রাণহীন হয়ে পড়েনি।"[১৫] দক্ষিণারঞ্জন সেখানে নিছক ব্রতের বর্ণনা দিয়েছেন, আবেগকে সেভাবে স্থান দেননি। সূর্য-পৃথিবীর কল্পিত বিবাহের ছড়াও মেলে না।

পৌষ মাসের সংক্রান্তি থেমে মাঘ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত সন্ধ্যাবেলায় 'তারা ব্রত' অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রতে সবার প্রথমে উঠোন পরিষ্কার করে আলপনা দিতে হবে। এই আলপনার আবার বিশেষত্ব আছে। ব্রতের প্রথম বছরে আলপনার মাঝের মণ্ডল অর্থাৎ গোল আঁক দিতে হবে একটা। এই ব্রত পাঁচ বছর করতে হয়। যত বছর হবে, তত বছরে এক-একটা করে মণ্ডল বাড়বে। ব্রত করতে ফুল-চন্দন, দূর্বা, বেলপাতা, আলোচাল প্রয়োজন। এই ব্রতে নক্ষত্র পুজো করা হয়। এর ফলে শিবের সমান স্বামী, কার্তিক-গণেশের মত পুত্র, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত কন্যা প্রাপ্তি ঘটে। আবার তারা প্রণাম করাও হয়। তারা পুজো করলে সাত ভাইয়ের বোন, সতী সাবিত্রীর সমান হওয়া যায়, পুত্রবতী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। ব্রতের শেষদিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন চার সরা সাদা খই, সরার ওপরে চারটে করে বাতাসা ব্রতের কাছে সাজিয়ে দিতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ এই তারা ব্রতের সম্পর্কে বলেছেন সারা রাত ধরে চাঁদের আলো, তারাদের ঝিকিমিকি পূর্ববঙ্গের তারা ব্রতের ছড়ায় পাওয়া যায়। যেমন—

যোল যোল বর্তীর হাতে যোল সরা দিয়া।
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।।

তাঁর মতে তারা ব্রতের সূর্য, চন্দ্র, তারা— এসব কোন কিছুর অনুকরণ নয়, শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত।

মাঘ মাসের পয়লা তারিখ থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত 'মাঘ-মণ্ডল ব্রত'-এর অনুষ্ঠান হয়। এই ব্রতে যেসব দ্রব্যাদি প্রয়োজন সেগুলো হল: একটা টাট, একটা পিঁড়ি, কিছুটা মাটি, দূর্বা, চম্পাদাড়ি, ফুল, নতুন আলো-চাল, কলা, গুড়, বাটি ইত্যাদি। আগের দিন বিকালে টাটের ওপর লাউল বানানো থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে রাখতে হয়। যতজন ব্রতিনী ততগুলো লাউল অথবা সব ব্রতিনীর মধ্যে একটা লাউল ঠাকুর বানালেই চলে। পরদিন অর্থাৎ পয়লা তারিখে ভোর ভোর হয়ে এলেই পুকুর ঘাটে যেতে হবে। পুবের ঘাটে জল ছিটিয়ে লাউল ঠাকুর নামিয়ে রেখে ব্রত শুরু হয়। ব্রতিনীরা এবার চোখে মুখে জল দেওয়ার মন্ত্র,

কুয়াশা ভাঙার মন্ত্র পড়ে। এরপর সূর্য ঠাকুরকে ওঠানোর মন্ত্র পাঠ হয়— 'উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।' সূর্য ঠাকুরের ভোজন, স্নান সমাপনের পর সূর্যঠাকুরের সঙ্গে চন্দ্রকলা মাধবের কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ চলে আসে। এবার লাউল ঠাকুর ও চন্দ্র ঠাকুরের বিয়ে হয়। এরপর ঢেঁকিশাকের আঁটি খেয়ে লাউলের বউ একমাসের, কল্মী শাকের আঁটি খেয়ে দুই মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়ে। একে একে সর্ষে, ডাঁটা, গিমা, পাট, কলাই, মটর, হেলেঞ্চা, নালঞ্চা শাক খেয়ে তার গর্ভ ক্রমবর্ধিত হতে থাকে। তার সাধভক্ষণ হয়, লাউল ঠাকুরের পুত্র সন্তান জন্মায়, সে বড় হতে থাকে। এবার লাউল ঠাকুরকে স্নান করানো ও খাওয়ানো হয়। সবশেষে লাউল ভাসানোর মন্ত্র পড়ে নারীরা:

আজ যাও লাউল; কা-ল আইসো নিত্যি নিত্যি দেখা দিও।
বচ্ছর বচ্ছর দেখা দিও।।

এরপর বাড়িতে এসে হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে তারা ব্রতের মত আলপনার চিত্র উঠোনে আঁকতে ও ফুল ছিটিয়ে পুজো করতে হবে। এই ব্রতের উদ্দেশ্য ধনী-গৃহিণী হওয়া। ব্রতের শেষদিন ছ-কুড়ি ছটা ক্ষীরের নাড়ু লাগে। এই ব্রত পাঁচ বছর করতে হয়। *বাংলার ব্রত* গ্রন্থে এই ব্রতের ছড়ার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এভাবে: ''এই ব্রতের ছড়া দেখি তিন অঙ্কে ভাগ করা রয়েছে। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয় বা শীতের পরাজয় ও সূর্যের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে, শেষ অংশে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়।''[১৬] অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন রাওল হল সূর্যের পুত্র ঋতুরাজ। 'রাতুল' থেকে 'লাউল' শব্দ এসে থাকতে পারে। তার সঙ্গে মাটির কন্যা হালামালার বিয়ে হয়। তাদের মিলন শেষে ঋতুরাজ ধরিত্রীকে ফুলে-ফলে উর্বরা করে বিদায় নেন। মাঘমণ্ডল ব্রতের প্রথম অংশে লক্ষ করা যায় সূর্যকে মানুষ যেভাবে দেখে সেভাবেই তাকে বিশ্বাস করে। তাই কুয়াশা ভেঙে দিয়ে সূর্যোদয়ে সহায়তা ও সূর্যকে আবাহন করে। সূর্যের বিবাহের রূপকের মধ্যে দিয়ে নারীরা নিজেদের মনের মধ্যে সুপ্ত থাকা শ্বশুরবাড়ির-বাপের বাড়ির স্বপ্ন দেখছে। টোপরের আকারে লাউল বা বসন্তদেবের মূর্তি গড়ে তার বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দৈনন্দিন কেজো জীবনের ছবিটাকে তুলে ধরে। ভাদুলিব্রতেরই মত মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ার মধ্যেও গীতি ও নাটক দুটোই রয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় কোন এক সময়ে ছড়াগুলো শুধু মন্ত্রের মত উচ্চারণ করাই হত না, অভিনয় করাও হত।

‘প্রতিভা’ পত্রিকার ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় ‘মেয়েলী সাহিত্য’ নামে দক্ষিণারঞ্জনের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ দুই কিস্তিতে প্রকাশ হয়েছিল। “শ্রাবণ সংখ্যায় লেখক ‘মাঘমণ্ডলের ব্রত’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি ছড়া উদ্ধার করে তৎকালীন নারী সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয়টুকু উপস্থাপিত করেছেন।”[১৭] এবং “ভাদ্র সংখ্যায় (১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) লেখক মূলতঃ লাউলের বিবাহের বিবরণ প্রদান করেছেন, বলা বাহুল্য ছড়ার মাধ্যমে।”[১৮] সূর্যকে সুখাদ্য সহযোগে আতিথেয়তার প্রলোভন দেখানোও বেশ মজার। তিনি সোনার থালায় ভাত, রূপোর বাটিতে ব্যঞ্জন, ‘বিড়া বিড়া’ পান, ‘ছড়া ছড়া’ সুপারি, ‘চাক্কা চাক্কা’ খয়ের, ‘খুট্‌রী ভরা’ চুন খেয়ে ‘লাদা লাদা’ পিক ফেলবেন— এই বর্ণনা বেশ হাস্যরসাত্মক। লাউলের গর্ভবতী স্ত্রীর সাধভক্ষণের চিত্রে বাস্তবতার পরিচয় মেলে। লাউলের নবজাত সন্তানের গহনার তালিকা থেকে ‘সেকালের প্রচলিত গহণা’ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, মালী সকলকেই গুরুত্ব সহকারে এই ব্রতে সামিল করে নেওয়ার চেষ্টা চলে। গ্রাম-বাংলার নারীদের কাছে পুকুরঘাট যে অতি প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেই বিষয়টাও লক্ষণীয়। সূর্য ও চন্দ্রের স্ত্রীদের দুর্মূল্য ও একই সঙ্গে দুর্লভ বাণারসী ও ঢাকাই শাড়ি পড়ানোর প্রসঙ্গ উল্লেখিত। ব্রতিনীরা ‘বড় মানুষের ঝি’ এবং ‘বড় মানুষের’ পুত্রবধূ হওয়ার বাসনাও প্রকাশ করেছে। এক কথায় পছন্দের শাড়ি, খাবার, গহনা, বাসন, স্থান, পরিবার সহ এক ‘সব পেয়েছির দেশ’-এর যে স্বপ্ন মনের মধ্যে বাংলার নারীরা বুনে চলে, তারই প্রতিচ্ছবি এই ‘মাঘমণ্ডল ব্রত’-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

মাঘ মাসের প্রথম চতুর্থী তিথিতে পালিত হয় ‘ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রত’, আবার পরের পক্ষের চতুর্থীর দিন এই ব্রত করতে হয়। এই ব্রত প্রতিদিন করতে হয় না। এতেই এক বছরের ব্রত সম্পাদন হয়। ব্রতের উপচার অঘ্রাণ মাসের আলো চাল, পৌষ মাসের সরা টোপা, মল্লিকা, মাঘ মাসের জল, আলপনা, পাঁচটা কাঁঠাল পাতা, একটা আমের পল্লব, প্রদীপ জ্বালানোর তেল সলতে, আগুন, চোদ্দটা ফুলের একটা মালা, ফুল, চন্দন, দূর্বা। বাপের রাজা হওয়া, ভাইয়ের লক্ষপতি হওয়ার বাসনা, সর্বোপরি এই ব্রতে শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ থাকার বাসনা প্রকাশ পায়। এই ব্রতকে কেন্দ্র করে দক্ষিণারঞ্জন একটা ‘কথা’র উল্লেখ করেছেন। এই ব্রত চার বছর করতে

হয়। কোথাও কোথাও এই ব্রতকে 'বরদা চতুর্থী' ব্রতও বলা হয়। ঢাকা-বিক্রমপুরেও এই ব্রতের চল আছে।

ফাল্গুন মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে 'ফাগুন-কোণা ব্রত'। চার বছরে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা। যেহেতু ফাল্গুন মাসের ব্রত তাই আবির দিয়ে আলপনার চিত্র আঁকতে হয়। আসনটা পিটুলি দিয়ে আঁকা হবে। ব্রত করতে লাগবে : এক বাটি শুকনো আবির, ছোট একটা বাটিতে কিছুটা পিটুলি, ফুলপাত্রে ফুল, দূর্বা, চন্দন, তিল, তুলসী, ঘি, প্রত্যেক ব্রতিনীর পাঁচটা করে সুপারি, কিছুটা ছোলা, একটা করে গোটা পান, এক ঘটি জল আর একটা প্রদীপ। ব্রতের আগের দিন উঠোন লেপে রেখে পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং মুখ ধোয়ার শেষে সকল ব্রতী একজায়গায় জড়ো হওয়ার পর পাঁচটা করে জোকার দেয়। এদের মধ্যে একজন হবেন 'আসন-ব্রতী', বাকিরা হলেন 'পালন-ব্রতী'। আসন-ব্রতী আঙিনার ঠিক মাঝখানে আবিরের চিত্র আঁকে। পালন-ব্রতীরা আসন-ব্রতীর আসন বাদে দুদিকে দুসারি আলপনা দিয়ে নিজেদের আসন আঁকে। এবার আবিরের চিত্রে ফুল দিয়ে সকলে মন্ত্র পড়া শুরু করে :

ফাগুন-কোণা শ্যাম সোনা, দুর্গার হাতে দিয়ে সোনা।
দুর্গা কন, — 'জন্মায়স্তী'।।

পিতৃকুল, শ্বশুরকুল ও পতিকুল অর্থাৎ নিজের সংসারের মঙ্গল ও সুখ-সমৃদ্ধির কামনায় এই ব্রত।

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' শুরু হয়, গোটা বৈশাখ মাস ধরে চলে। এই ব্রত চার বছর করতে হয়। ব্রত করতে দরকার ফুল, চন্দন, দূর্বা, এক ঘটি জল আর একটা নিখুঁত-পাতা বেলগাছের ডাল। ব্রতীকে লেপা উঠোনে পুণ্যি পুকুরের পুকুর কাটতে হবে। পুকুরটা হবে চার কোণা। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক পুকুর করতে পারে। বেলের ডালটা পুকুরের ঠিক মাঝখানে পুঁততে হয়। এবার পুকুরে জল দিয়ে মন্ত্র পড়া হয় :

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী, ভাইয়ের বোন্, পুত্রবতী।।
হয়ে পুত্র মর্‌বে না, পৃথিবীতে ধর্‌বে না।

'পুণ্যিপুকুর' নাম শুনে মনে হতে পারে যে, "পুণ্য সঞ্চয় এই ব্রতটির উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রতের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই জানা যায়, সৌভাগ্য সঞ্চয়ই ইহার লক্ষ্য। তবে পতিব্রতা সতী না হইলে কেহ সৌভাগ্যবতী হয় না।"[১৯] তাই এমন বর-প্রার্থনা। ব্রতের শেষে পুকুর বুজিয়ে ও বেলের ডাল নিয়ে জল দিতে হয়। পরের দিন অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন থেকে নতুন বেলের ডাল দিয়ে ব্রত করতে হবে। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে। অবনীন্দ্রনাথ বলেন : বৈশাখ মাসে পুকুরে যাতে জল না শুকিয়ে যায়, গ্রীষ্মের দাবদাহে গাছ যাতে না মারা পড়ে তারই কামনায় পুণ্যিপুকুর। এই ব্রত যেন কোন এক ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতিতে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ধরিত্রীকে শস্যশ্যামলা করে তোলার 'আদিম কামনাপ্রসূত ব্রত'। এই ব্যাখ্যা 'বাংলার ব্রতকথা'য় মেলে না।

'শঙ্কর ব্রত'ও অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত। এ মূলত শিবের পুজো। ব্রতের উপকরণ হল শিব গড়ার জন্য গঙ্গামাটি, তার অভাবে যে কোন শুদ্ধ মাটি, আকন্দ ফুল, বেলপাতা, এক ঘটি গঙ্গাজল বা শুদ্ধ জল, পুষ্পপাত্রে চন্দন আর কিছুটা আতপ চাল, আলপনার জন্য পিটুলি। এ ব্রত সকালবেলায় করতে হয়। আলপনায় মণ্ডল আঁকার পর মাটি দিয়ে শিবমূর্তি গড়তে হয়। এরপর গঙ্গাজলের ধারা দিয়ে শিব স্নান করানো হয় এবং মন্ত্র পাঠ হয় :

হর হর শঙ্কর বোম্ বোম্ বোলে। স্নান ক'রে তুষ্ট হও গঙ্গা জলে।।

স্নানের পর পুজোর মন্ত্র পড়া হয়। পুজোর মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই কামনা ব্যক্ত হয় : "জন্ম জন্ম যেন— হর কৈলাস পাই।" এর পর প্রণামের ও শেষ প্রণামের মন্ত্র। পরদিন আবার নতুন শিব, নতুন নৈবেদ্য। এই ব্রত চার বছর করতে হয়। তবে কুমারী মেয়েরা যে বিশেষত শঙ্করের মত স্বামী লাভের জন্য এই ব্রত পালন করে দক্ষিণারঞ্জন সেকথা বলেননি।

'গো-কলব্রত'ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত হয়। এই ব্রতও চার বছর পালনীয়। ব্রতের দিন সকালবেলা দূর্বা ঘাস তুলে, ঝেড়ে, বেছে, ধুয়ে টাটের ওপর রাখা হয়। এছাড়া লাগে প্রত্যেক ব্রতীর একটা করে পাখা, এক ঘটি জল, সর্ষের তেল, হলুদ বাটা, সিঁদুর, চন্দন, তিনটে পাকা কলা। গরুর শিঙে তেল দেওয়ার পর কপালে সিঁদুর, হলুদ, চন্দন দেওয়া হয়। তারপর দূর্বা ঘাস তিন গোছা করে নিয়ে প্রত্যেক গোছায় এক একটা কলা পুরে গাই ও বাছুরকে খেতে দেওয়া হয়। তারপর মন্ত্র বলা হয় :

গো-কলে গোকুলে বাস।

গরুর মুখে দিলাম ঘাস, আমার যেন হয় স্বর্গে বাস।।

এরপর 'গাই বাছুর সক্কলের পা ও ক্ষুর' ধুইয়ে দেওয়ার সময় পা ধোওয়ার, ক্ষুর ধোওয়ার, বাতাস করার, প্রণাম করার মন্ত্র বলে ব্রতিনীরা। স্বর্গে বসবাস, দুধেভাতে থাকা, সুস্থ সবল নীরোগ দেহের অধিকারিণী হওয়া, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা — এই ব্রতের এমনই সব কামনা। *মেয়েলি ব্রত* গ্রন্থে এই ব্রতের সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে : ''গোকল ''গো-কবল'' শব্দের অপভ্রংশ। গো সেবাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ব্রতটি কেবল 'মেয়েলী' ব্যাপার নহে! প্রতিদিন নিত্য শ্রাদ্ধের পর গো-সেবা করা হিন্দুর নিত্যাচারের অন্তর্গত। দিবসের পঞ্চম যামার্দ্ধে ইহার অনুষ্ঠান কর্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নাম 'গোগ্রাস'...''[২০]। দক্ষিণারঞ্জন ব্রতের শুরুতেই বলে দিয়েছেন জন্ম থেকে গরুর দুধেই মানুষের বল। গরুর ঋণ শোধ করা যায় না। তাছাড়া গরুর দুধ অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তাই গবাদি পশুর সুস্থতারও প্রয়োজন। *বাংলার ব্রতপার্বণ* গ্রন্থে বলা হয়েছে— গো-কল ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুদের আদিম সমাজজীবনের ছবি ও ক্রিয়াকরণ ফুটে ওঠে। এছাড়া রোগশোক, মশামাছি সহ কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচার প্রার্থনাও আদিম সমাজ-মনের প্রতিচ্ছবি।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত স্নানের সময় 'অশ্বত্থ-নারায়ণ ব্রত' পালিত হয়। এই ব্রতকে অশথ পাতা বা অশ্বত্থপাতার ব্রতও বলা হয়। এই ব্রত মূলত বৃক্ষ বন্দনা। এর জন্য প্রয়োজন : একটা করে কাঁচা, পাকা, শুকনো, ঝুরঝুরে আর কচি অশ্বত্থ পাতা। এই পাঁচটা পাতার মধ্যে প্রথমে পাকা পাতাটা মাথায় ধরে মন্ত্র পাঠ হয়। সেই সঙ্গে নারীরা সুখ-শান্তি, পাকা চুলে সিঁদুর পরার বাসনা প্রকাশ করে। সেই রকম কাঁচাপাতা মাথায় দিলে কাঁচা সোনার বর্ণ, শুক্নো পাতা মাথায় সুখ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি, ঝুর্ঝুরে পাতা মাথায় মণিমুক্তোর ঝুড়ি আর কচি পাতা মাথায় ধরে স্নান করলে কাঞ্চনপুত্র লাভ হয়— এই বিশ্বাস ব্রতিনীদের।

কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে, কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।

শুকনো পাতাটি মাথায় দিলে, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।।

ঝুরঝুরে পাতাটি মাথায় দিলে, মণিমুক্তার ঝুরি পায়।

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে, পাকা চুলে সিন্দুর পরে।।

"ভাষা এখানে ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে আশ্রয় করে আশা পূরণের যাদু বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। কোনো কোনো ছড়ায় বিষয়টি রূপকের বৈচিত্র্য তৈরি করে।"[২১] এই ব্রতও চার বছর করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের মতে 'অশথপাতার ব্রত'র ছড়া থেকে বোঝা যায় বসন্তের দিনে নদীতীরে অশ্বত্থপাতা, কুঞ্জলতা, চম্পকসুন্দরী— এদের কিশলয় অবস্থা থেকে ঝরে পড়ার একটা উৎসব যেন চলেছে। ছেলে-বুড়ো সকলে এই উৎসবের টানে হাজির হচ্ছে। এর পরেই আসছেন 'ঠাকুর ঠাক্রুণ'। দক্ষিণারঞ্জন নারায়ণ পুজোর কথা বলেছেন। কারণ ডুব দেওয়ার সময় প্রণামের মন্ত্রপাঠে ব্রতিনীরা নারায়ণকে সাক্ষী রাখে এবং নিজেরা লক্ষ্মী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বৃক্ষাদি আর মানুষের মিলনে ছোট একটা নাটকের মত গাঁথা হলেও এমন বসন্তে নতুন ও পুরনোর এবং মানুষ ও অরণ্যের নিঃশ্বাস যখন একসঙ্গে ওঠাপড়া করে তখন এর ব্যাপ্তি অনেকটা দাঁড়ায়। এ নিছক ব্রত নয়, 'কামনার প্রতিক্রিয়া'। এই ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে আদিম মানবের প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির হাত থেকে রক্ষা, পৃথিবীকে উর্বর করে তোলা, দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চাওয়ার প্রার্থনাই আভাসিত হয়।

'পৃথিবী ব্রত'ও চৈত্রমাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত আসলে পৃথিবী বা বসুমতীর আরাধনা। এই ব্রতের বিশেষত্ব হল কুমারী, সধবা, বিধবা সকলেই এই ব্রত পালনের অধিকারিণী। উপকরণ লাগবে পদ্মের ঝাড়, পদ্মপাতা, তার ওপরে ধরিত্রী মায়ের আলপনা, শাঁখ, ছোট ছোট বাটিতে করে একটু মধু, দুধ, ঘি। শাঁখে মধু, দুধ, ঘি ভরে দুহাতে অঞ্জলি করে আলপনায় ঢেলে দিয়ে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করে নারীরা :

বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন, আর, না হয় আমার।।

চার বছরে ব্রতের প্রতিষ্ঠা বা উদ্‌যাপন। বড় অদ্ভুত এই ব্রতের কামনা। মৃত্যুর পর রাজরানী হওয়ার বাসনা— এ কি পার্থিব বস্তুর প্রতি উদাসীনতা নাকি জীবনের ক্ষণিকতার প্রতি অঙ্গুলিহেলন? আবার পৃথিবীতে পুনর্বার না জন্মানোর প্রার্থনা। হতে পারে নারী জীবনের যন্ত্রণা, বঞ্চনা, অবহেলা, অনাদর থেকেই এমন ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আবার এই ব্রতও আদিম ভাবনা জাত। বেশি ফসল, উর্বরতাবৃদ্ধি, বেশি সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্রত পালন। পৃথিবী আমাদের ধাত্রী দেবতা, তার কৃপাতেই আমাদের জীবন ধারণ, তাই তাকে আবাহন।

দক্ষিণারঞ্জন প্রত্যেক ব্রতের উদ্‌যাপনকাল উল্লেখ করলেও শুধুমাত্র ‘হরিচরণের ব্রত’ বা ‘রণো-এয়ো ব্রত’-এর প্রতিষ্ঠা বা উদ্‌যাপনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, অন্য ব্রতগুলোর উদ্‌যাপনের ব্যাপারে কিছুই বলেন নি।

‘হরিচরণের ব্রত’-এর প্রতিষ্ঠায় এক জোড়া সোনা, এক জোড়া রূপো ও এক জোড়া তামা দিয়ে তৈরি হরির চরণ (কোথাও বলা হয়েছে তিনটে সোনার অথবা দুটো সোনার, একটা রূপোর তৈরি হরির চরণ) ব্রতে দিতে হবে। আর লাগবে একজোড়া করে নতুন বস্ত্র ও গামছা। ব্রতের শেষে ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে তাঁকে এই সব দান করে দক্ষিণা দিতে হবে।

আর ‘রণে-এয়ো ব্রত’-এর উদ্‌যাপনের দিন একটা সোনা বা রূপোর সিঁদুর-কৌটো, সিঁদুর, পাঁচপোয়া ধনে, পাঁচ সের ধান, পাঁচটা আম, একজোড়া লাল পেড়ে শাড়ি, এক গাছা ‘নোয়া’ ব্রতে দিতে হবে। ব্রতের শেষে ‘সধবা ব্রাহ্মণ ঠাকুরানীকে পরিতোষ ভোজন’ করিয়ে সবকিছু দান করতে এবং দক্ষিণা দিতে হবে।

‘রণে-এয়ো ব্রত’-এর তুলনায় ‘হরিচরণ ব্রত’ বেশি ব্যয়সাপেক্ষ।

দক্ষিণারঞ্জনের ‘ব্রতকথা’র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বেশিরভাগ ব্রতের নিয়ম-কথনের আগে তিনি ছড়া রচনা করে দিয়েছেন। এই ছড়াগুলো পড়লে ব্রত পালনের আগেই সব ব্রতের গুরুত্ব খুব সহজেই অনুভব করা যায়। এই ছড়াগুলো ব্রতের প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া ব্রতের ক্রিয়াকরণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে ‘কথা’ বা কাহিনি দক্ষিণারঞ্জন তা শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, একেবারে ঠানদির মতই ব্রতের ‘নিয়ম সিয়ম’ বলে দিয়েছেন। বলার আগে বঙ্গললনাদের ‘লক্ষ্মী’ সম্বোধন করেছেন। বড় আন্তরিক তাঁর কথনভঙ্গি, ব্রতিনীরা যেন তাঁর পরিবারের সদস্য, তাঁর মা, বোন, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতনি, নিকট আত্মীয়া। যেমন— ‘বসুধারা ব্রত’-এর নিয়ম বলার সময় বলেছেন : ‘‘লক্ষ্মীরা! দ্যাখ তো এখন স্নানের বেলা হয়েছে কি না? হয়েছে। তো এখন ঘটি আর ঘটটা নিয়ে স্নানে চল তো।

হয়েছে, হয়েছে! লক্ষ্মীরা! আর বেশী ডুব দিয়ে কাজ নাই। এখন ঘটটিকে ধুয়ে পাড়ে রাখ, আর, এই যে বলছি, এই মন্ত্র বলে’, শেষবার ডুব দিয়ে ঘটিটি ভর তো?...’’[২২] ‘ঠানদি’ দক্ষিণারঞ্জন যেন ভোরবেলায় বাংলার বধূদের ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্রতপালনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হল দক্ষিণারঞ্জনের এই ধরনের কথনরীতি বেছে নেওয়ার কারণ

কি? আসলে ''এই গল্পগুলো তো লিখে বইয়ের আকারে ছাপার জন্য তৈরি হয়নি। এই গল্প বাচন কথা— মুখে মুখে চলে। লিখিত ভাষার সংকেত বা কোড থেকে কথাগুলোকে লেখক আবার মুখের ভাষার ধ্বনি সংকেতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। লেখার ভেতর এত বেশি কমা, ঊর্ধ্বকমা, ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহারে ধরা আছে সেই বাচনেরই সংকেত।''[২৩] দক্ষিণারঞ্জনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুহাসিনী দেবী *মেয়েলি ব্রতকথা* (১৩৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), হিরণবালা দেবী *বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা* (১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) ছাপা লেখার আকারে প্রকাশ করতে এগিয়ে এলেন। নিরুপমা দেবী তাঁর 'পল্লী বালিকাদের উৎসব' প্রবন্ধে ('ভারতী', বৈশাখ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে ''চাঁপা-চন্দন, সম্পদ নারায়ণ, হরিচরণ, অশ্বত্থ নারায়ণ, সেঁজুতি, যমপুকুর, দশপুতুল, তুষতুষলা ইত্যাদি ব্রত এবং ব্রত-সংশ্লিষ্ট ছড়ার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুটনে প্রয়াসী হয়েছেন।''[২৪] এই প্রবন্ধে বাংলার রকমারি ব্রত বালিকাদের নীতিগত শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে কীভাবে সহায়তা করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

রেণুকাবালা দাসী তাঁর 'গোকল ব্রত' ('ভারতী', আশ্বিন ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে গোকলব্রত সম্পর্কে, 'ব্রতমন্ত্র' ('ভারতী', চৈত্র ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে বিভিন্ন ব্রত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইন্দুমতী দেবীর *বঙ্গনারীর ব্রতকথা* (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), বিমলা দেবীর *উত্তরবঙ্গের ব্রতকথা* (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থগুলো থেকে বোঝা যায়, নারীরা যে 'কথা' বা কাহিনিগুলো একটা বিশেষ দিনে, বিশেষ উপলক্ষ্যে নিজেরাই বলে আর শোনে— সেই 'বাচনকথা'গুলো বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে স্থান পেল। একটা সময়ে দক্ষিণারঞ্জনের *ঠা'ণদিদির থলে* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে নৃতত্ত্ববিদ্যার পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ছিল।

ঠা'ণদিদির থলে গ্রন্থে দক্ষিণারঞ্জন একেবারে বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত ঋতুরঙ্গময়ী বঙ্গে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ব্রতের পদ্ধতি ও এইসব ব্রতের 'কথা' লিপিবদ্ধ করেছেন। ''তবে লেখক এই ব্রতের প্রণালীগুলি বর্ণনায় যতখানি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, ব্রতকথা সঙ্কলনের ব্যাপারে ঠিক ততখানি নিষ্ঠা দেখাননি স্বীকার করতে হয়।''[২৫] শুধুমাত্র যমপুকুর আর ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রতের 'কথা' সংকলিত হয়েছে। আর সব ব্রতের উদ্‌যাপনের ব্যাপারে আলোচনা যে করেননি, সে প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখিত। তাছাড়া তিনি ব্রতগুলোকে শুধু ঋতু অনুযায়ী শ্রেণিবিভক্ত করেছেন, কুমারী ব্রত বা সধবা ব্রত এভাবে কোনও শ্রেণিবিভাগ

করেননি। আশুতোষ মজুমদারের *মেয়েদের ব্রতকথা* গ্রন্থে লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী, কুমারী-ব্রত, সধবা-ব্রত, বিবিধ খণ্ড— এভাবে ব্রতগুলোর শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। তাছাড়া ঋতু অনুযায়ী বিভাগ তো রয়েছেই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, কিছু কামনায় যে সামাজিক অনুষ্ঠান তাই হল ব্রত। আর এই ব্রতের রীতি-পদ্ধতির বিষয়টা *ঠা'ন্‌দিদির থলে*-তে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে এবং আন্তরিক দক্ষতায় উন্মোচিত হয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বজনীন নারী-হৃদয়কেই তিনি *বাংলার ব্রতকথা*-য় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জন নিজে একজন পুরুষ হলেও তাঁর গ্রন্থ পড়লে একথা ভাবতেই ইচ্ছা করে যে বাংলার এইসব ব্রত পার্বণে পুরুষ নয়, "...'ব্রাত্য' নারীরই একাধিপত্য। পুরুষের অনভিপ্রেত প্রভুত্ব সেখানে খর্ব, নারীর এই নিজস্ব জগতে পুরুষকে 'ব্রাত্য' করেছে নারী। একেই কি নারী শক্তি বলে? তাই কোনও ব্রতে শাস্ত্রীয় ঘেরাটোপ কিংবা তন্ত্রমন্ত্রের ফাঁদ পাতা নেই। পুরুষ নেই, শাস্ত্রীয় বুজরুকিও নেই। ব্রত একেবারেই সর্ব অর্থে বঞ্চিত নারীহৃদয়ের অমল লোকায়ত সহজ সৃষ্টি।"[২৬] শুধু পুরুষতন্ত্র নয়, ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অধিকারও খর্ব হয়েছে।

ব্রতের উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষার দিকটাও যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধি ব্রতের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। "The notable bratas, ritually related to the agriculture and fertility and Punnipukur Brata, Vasudhārā Brata, Tush-Tushuli Brata, Śaspātar Brata, Prithivi Brata, Kojāgari Brata etc. We should not forget that these agrarian rites and rituals including bratas are a domestic form of religion having no connection either with the temple worship or with the higher form of religion"[২৭] ব্রতের মাধ্যমে নারীরা ব্যক্তিগঠন, পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায়, জীবনের প্রতি গভীর আস্থা লাভ, সামাজিক ও জাতীয় তথা বিশ্বের শুভ কামনা, সম্পদ বৃদ্ধি, রোগমুক্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা পতি-পুত্র-পরিজন-প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করতে চায়। এক্ষেত্রে ব্রতকথার একটা নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে : "বাঙ্গালীর যে নিজস্ব একটি জাতীয় ধর্মবোধ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ'দেশে একটি বিশেষ প্রকৃতির লোক-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্রতকথা নামে পরিচিত।"[২৮] এছাড়া ব্রতপালনে নারীদের অন্যতম প্রধান উপলক্ষ্য স্বামী-সোহাগ কামনা।

মূলত সমস্যা-জর্জরিত জীবনের শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তারা একটু শান্তির প্রলেপ লাগাতে চায়। তবে মনে হয় এইসব কামনা বা প্রার্থনা "প্রাক্-আর্য যুগের। এবং ঐসব প্রার্থনা আর্য-সংস্কৃতি থেকেই ব্রতকথার কাহিনীর শরীরে চক্রমনশীলতার সূত্র ধরেই চলে এসেছে।"[২৯]

দক্ষিণারঞ্জনের মতে ব্রতকথা হল 'মেয়েলী-সাহিত্য'। এর "সম্পর্ক ধর্মের দিকেই অধিক, ... ব্রতকথা ব্রতের পর সৃষ্টি হইয়াছিল বোধহয়।" 'গৃহলক্ষ্মীদের প্রাণটিকে অতি কোমলভাবে গৃহকর্ম্মে তন্ময় করিতে' (*ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র 'ভূমিকা') তাঁর 'ব্রতকথা' রচনা। "ব্রতকথা— ফুলের রাশি পূজোপচারে চন্দন চর্চ্চিত, ...সরল ধর্ম্মোপদেশ কাহিনী, ...সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে অমৃতের ধারা বর্ষণ করে", এ হল 'জলশস্যসুভারা ধরিত্রী'র ন্যায়।

বাংলার ব্রত পার্বণের অন্যতম অঙ্গ আলপনা। "The alpana related to a brata must clearly depict the object the bratee (devotee) desires to have other wise its performance will be meaningless and impossible."[৩০] এই আলপনায় চিত্রিত নকশায় নারী-হৃদয়ের সুপ্ত কামনাগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্রতের কামনা-বাসনার ঐন্দ্রজালিক চিন্তা-চেতনাও আলপনায় থেকে যায়। অন্যদিকে আলপনা নারীর সৌন্দর্যসচেতনতা ও নান্দনিক মনের প্রতিফলক। আর নারীর কল্পনাপিয়াসী, আবেগ মথিত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটে ব্রতের ছড়ার মধ্যে। ছড়াগুলো ব্রত-অনুষ্ঠানের লৌকিক মন্ত্রস্বরূপ। কিছু ব্রত আবার অভিনয়ধর্মী। শুধু তাই নয়, নৃত্য-গীতসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াত্মক। আর ব্রতের 'কথা'য় মৌখিক-পরম্পরায় যেসব কাহিনি চলে আসছে, সেগুলোই পরিচিতি লাভ করে। বাংলার ব্রতকথা-য় দুর্বলকে সাহায্য দান (৭৫), প্রথম সূর্যোদয় দেখা (১২০), কৃতজ্ঞ পশু, অকৃতজ্ঞ মানুষ (১৬০), ইচ্ছা (৪০৩ ক), ভাগ্য ও ধনরত্ন (৭৩৬) ইত্যাদি টাইপ (লোককথার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য) লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্রতের কৃত্য। একটা ব্রতের থেকে অন্য ব্রতের কৃত্যালি প্রায়শই ভিন্ন। ব্রত-পার্বণ এক কথায় নানান বৈচিত্র্যের সমাবেশ। তবে এই ব্রত-পার্বণ করলে যে নারী-জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্টের সমাপ্তি হবেই একথা জোর দিয়ে বলা না গেলেও ব্রতের মধ্যে দিয়ে নারীরা নিজেদের মত করে বেঁচে থাকার রসদ ও প্রতিরোধের শক্তি খুঁজে পায়। এ ব্যাপারে দক্ষিণারঞ্জন সার্থক সহায়ক।

তথ্যসূত্র ::

১ শীলা বসাক, *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮, পৃ. ১

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৭৩

৩ Sudhansu Kumar Ray, *The Ritual Art of the Bratas of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Kolkata, First Edition January 1961, p. 11

৪ Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal*, 1920, Published by the University of Calcutta, 1920, p. 246

৫ অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৬৫

৬ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমার ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৭০

৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১লা শ্রাবণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬

৮ তদেব, পৃ. ১৬

৯ W. Crooke, *Folklore of India*, Aryan Books International, New Delhi, First reprint 1993, p. 389

১০ শীলা বসাক, *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮, পৃ. ১৩৮-৩৯

১১ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৫১

১২ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মেয়েলি ব্রত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃ. ৩৫

১৩ শীলা বসাক, *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮, পৃ. ১৪৪

১৪ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মেয়েলি ব্রত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৪

১৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১লা শ্রাবণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫-৩৬

১৬ তদেব, পৃ. ৪৮

১৭ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ১৩৩

১৮ তদেব, পৃ. ১৩৪

১৯ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মেয়েলি ব্রত,* প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৭

২০ তদেব, পৃ. ৬২

২১ অচিন্ত্য বিশ্বাস, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১৭৪

২২ *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র,* ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ; তৃতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩৪

২৩ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমার ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৭০

২৪ মানস মজুমদার, *লোকসাহিত্য পাঠ,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬৯-৭০

২৫ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৪৮

২৬ দিব্যজ্যোতি মজুমদার, 'অভিজ্ঞতা লব্ধ অনুশীলনে সমৃদ্ধ', বইয়ের দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৭৯

২৭ Dr. Gouri Sankar Bandyopadhyay, Folk Religion and Mass Culture in Rural Bengal, Touchstone Publication, Kolkata, First published January 2007, p. 94

২৮ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৭২

২৯ দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪; দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩, পৃ. ৫৩৯

৩০ Sudhansu Kumar Ray, *The Ritual Art of the Bratas of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Kolkata, First Edition January 1961, p. 42

৭. সপ্তম অধ্যায়

লোককথা

সংজ্ঞা :

ইংরাজি ‘Folktale’ শব্দকে বাংলায় অনেকেই লোককথা বা লোককাহিনি বলে থাকেন। ‘‘The term “folktale” has always been used loosely to cover the whole range of traditional oral narrative.”[১] গদ্যের মাধ্যমে যে কাহিনি প্রকাশ করা হয় তাকে সাধারণ ভাবে লোককথা বলা হয়। পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত, লিখিত এবং মৌখিক গদ্যের ভাষায় প্রকাশিত লোকসংস্কৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সম্পদ লোককথা। তবে এতে নারীর চেয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব বেশি। এই লোককথাকে লোককাহিনি, লোকগল্প বা সংক্ষেপে ‘কথা’ বলা যেতে পারে। গ্যেটে বলেছেন— ‘‘Folktale is the father of fiction.”। এই লোককথার মূল বৈশিষ্ট্য মৌখিক-পরম্পরা। ‘‘It is handed down from one person to another, and there is no virtue in originality. This tradition may be purely oral. The tale is heard and is repeated as it is remembered, with or without additions or changes made by the new letter.”[২] লোককথার বিষয়বস্তু ‘লোক’ বাহিত। তাই কোন মৌলিক বিষয়বস্তু লোককথার উপজীব্য হওয়া সম্ভব নয়। ‘‘একটি মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক (traditional) ধারা অনুসরণ করিয়া লেক-কথা সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কতকগুলি অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন থাকে, তাহা দ্বারাই ইহারা কালজয়ী হইয়া অমরত্ব লাভ করে।”[৩] এদের অভ্যন্তরে সর্বজনীন আবেদন থাকলেও রসের বিভিন্নতা লক্ষ করা যেতে পারে।

লোককথা বর্ণনামূলক। ছোট বা বড় যাই হোক এর কাহিনিটি পূর্ণাঙ্গ হবে। এর মধ্যে একক ও সরলরৈখিক এবং বিচিত্র শাখাযুক্ত জটিল গল্প দুই-ই অন্তর্ভুক্ত। একক গল্প আকারে ছোট এবং জটিল গল্প আকারে বড় হয়। লোককথায় অনেক মোটিফ থাকে। ‘‘একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনি-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনি-অংশ পাওয়া যাবেই, সেই কাহিনি-অংশ বা কাহিনি-অংশসমূহকে টমসন মোটিফ বলেছেন। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে।”[৪] আর লোককথা বা লোককাহিনিকে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা

হল টাইপ। এই টাইপ হল: "…a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale."[৫] টাইপ লোককথার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে লোককথা কাহিনি-সর্বস্ব এবং এর পরিসরও যথেষ্ট ব্যাপক। লোককথার তাই নানান প্রকার। যেমন পশুকথা, রূপকথা, পরীকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ, ব্রতকথা, রসকথা ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন এই লোককথার চর্চা করে গেছেন। তারই ফল তাঁর লোককথা বিষয়ক গ্রন্থগুলো। যেমন — *ঠাকুরমা'র ঝুলি, চিরদিনের রূপকথা* । এগুলোকে দক্ষিণারঞ্জন 'রূপকথা' বলেছেন। বাংলায় যাকে রূপকথা বলা হয় ইংরাজিতে তার কোন প্রতিশব্দ নেই। অনেকে 'রূপকথা'র ইংরাজি প্রতিশব্দ হিসাবে বলেছেন fairy tale। এই 'fairy' শব্দের বাংলা অর্থ পরী। কিন্তু বাংলা রূপকথায় পরীর দেখা মেলে না। "জার্মান ভাষায় বাংলা রূপকথাটির একটি যথার্থ প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, তাহা 'Marchen'..."।[৬] আচার্য সুকুমার সেনের মতে 'রূপকথা'র উৎস শব্দ 'অপরূপকথা'। লোককথার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সমৃদ্ধতর হল রূপকথা। "…the rupa-kathas, – they are simple tales in which the super human element predominates. The Raksasas, the beasts and Celestial nymphs often play the most important parts in these stories. The tales of heroism related in them are sometimes fantastical."[৭] *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে কম-বেশি এই সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান।

<u>লোককথার উপাদান সংগ্রহ</u> :

ঠাকুরমা'র ঝুলি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। এই লোককথার উপাদান সংগ্রহের আলোচনায় দক্ষিণারঞ্জন এই উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং কেন করেছেন — এই প্রশ্নগুলো অবধারিতভাবে এসে পড়ে।

প্রথমে 'কেন'-র উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক:

"ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের "Fairy Tales" আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে।

স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে।"[৮] — রবীন্দ্রনাথ লিখিত *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র এই ভূমিকা থেকে দক্ষিণারঞ্জনের লোককথা সংগ্রহের কারণ স্পষ্ট। দক্ষিণারঞ্জনের যখন ঊনত্রিশ বছর বয়স "…he came over to Calcutta with a store of folkloristic materials at his disposal. It was a time when political movement in Calcutta was in full swing. Movement against Partition of Bengal, "Swadeshi'' movement (a movement to encourage use of indigenous commodities and at the same time, discourage use of foreign goods) were the order of the day."[৯] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল সংবেদনশীল ও স্বাদেশিক যুগে আচার্য দীনেশচন্দ্রের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা'র ঝুলি* (১৯০৭) প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স থেকে। গোটা দেশ সেসময় ইংরেজ শাসনাধীন। দেশের স্বার্থে প্রতিনিয়ত কত শত তরুণ-তরুণী আত্মোৎসর্গ করে চলেছে। শুধু কলকাতা নয়, বঙ্গভঙ্গের কারণে সমগ্র বাংলায় তখন আগুন জ্বলছে। "দেশ জুড়ে পরে পর খুলছে গুপ্তসমিতি। কঠিন, নিষ্করুণ এ সত্যটি তখন বেবাক হাট : উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা গোরাদের অনাচারে, রাঙামুখোদের কালা স্যাঙাতদের অকল্যাণে, আছে বলতে আছে শুধু আজ, ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল; রাক্ষসে ছেয়ে সাহেব রাজার রাজত্ব;"[১০] 'সাহেব রাজা'র একচোখোমিতে দেশমাতার দুয়োরানীর অবস্থা। বাংলার তাঁতশিল্পেরও চরম বিপর্যয় উপস্থিত।

বাঙালি ও বাংলার ইতিহাসে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯০৫ সালে ইংরেজ শাসনের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ হয়। এর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। এই স্বদেশি আন্দোলনের প্রায় ছ'বছর পর ইংরেজ শাসক বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে দেখা গেল সবার মধ্যেই স্বদেশিয়ানার ভাব জেগে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলা ভাষায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। দেশমাতার সন্তানেরা তাঁকে সুখের মুখ দেখাতেই লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে। সাহিত্য-সম্পদ সব দিক থেকে পায়ের তলার মাটি সরে গেলেও, 'শিল্পকৌশল প্রকাশের অবসর', 'প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র' সবেরই অভাব প্রতি মুহূর্তে ভারতবাসীর স্বপ্নভঙ্গ ঘটালেও তাদের মধ্যে দেশভক্তি জাগ্রত হয়। এতদিনের সমস্ত অবহেলা-অবমাননার হিসাব বুঝে নেওয়ার সময় উপস্থিত— এমন ভাবনা উপলব্ধ হয় তাদের হৃদয়ে। ঠিক এমনই সময় দক্ষিণারঞ্জন দেশবাসীর হাতে তুলে দিলেন 'দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা' *ঠাকুরমা'র ঝুলি* নামক

স্বদেশি মায়ের ঝুলি যার 'উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহ'। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলার নারীরা রূপকথার যথাযথ রূপটা যেখানে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, দক্ষিণারঞ্জন সেকাজে সফল হয়েছিলেন। 'উচ্ছ্বসিত জাতীয়তার দিনে' ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত দক্ষিণারঞ্জন বাংলা সাহিত্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মাতৃভাণ্ডারের সম্পদ তাঁর 'ঝুলি'-র বড় কথা। আর একটা বিষয় এখানে বড় হয়ে উঠেছে তা হল 'মাতৃমাতামহী' তথা প্রাচীনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। শুধু বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা উদ্ধার নয়, ইংরাজিশিক্ষাভিমানী বাঙালিকে বাংলাভিমুখী করতে প্রাচীনার অভিজ্ঞতার বলিরেখার সঙ্গে তারুণ্যের প্রাণশক্তিকে মিলিয়ে দিলেন। তিনি যে বুঝেছিলেন: ''সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।''[১১] দক্ষিণারঞ্জন দুঃখিনী মাতৃভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে সন্তানের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বলা যেতে পারে : ''Through Western education, this country was then becoming Europeanized in thoughts and manners when at the same time the spirit of independence was drawing in the heart of the country folk.''[১২] আর দক্ষিণারঞ্জনের এই শেষোক্ত প্রয়াস দেশবাসীকে প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেশবাসীকে 'নিজস্ব কিছু' দেওয়ার বাসনা দক্ষিণারঞ্জনের মনে জেগেছিল। দেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি, দেশজ সংস্কৃতির শিকড় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাংলার রূপকথা সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। 'হারানো সুরের মণিরত্ন মাতৃভাষার ভাণ্ডারে উপহার' দেওয়ার প্রেরণা থেকেই বাংলার অসামান্য গল্পগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, যা আসলে বাংলার মাতৃপ্রধান অন্দরমহলেরই সম্পদ। পাঠক-পাঠিকাদের হাতে ''বাঙ্‌লা-মা'র বুক-জোড়া ধন'' 'ছেঁড়া নাতা পুরোণ কাঁথার — ঠাকুরমা'র ঝুলি' গ্রন্থ তুলে দিয়ে বলেছিলেন—

তোমাদেরি হারাধন তোমাদেরি ঝুলি
আবার এনে ঝেড়ে' দিলাম সোণার হাতে তুলি'!

স্বাদেশিকতা আর রূপকথা — সংকলন সমার্থক হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

এই গ্রন্থের নামকরণের বানান-ভেদ রয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন উৎসর্গ অংশে লিখেছেন ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’। গ্রন্থকারের নিবেদন, কাহিনি অংশের শুরুতে রয়েছে ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’, ভূমিকা অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’। অথচ কোন কোন সংস্করণের (যেমন ত্রিংশতি সংস্করণ) প্রচ্ছদে রয়েছে ‘ঠাকু’মার ঝুলি’। ‘বাঙ্গালা’, ‘বাঙ্‌লা’, ‘বাংলা’— তিন ধরনের বানানই এই গ্রন্থে চোখে পড়েছে। ‘উৎসর্গ’ অংশেই কোথাও রয়েছে ‘সোনা’ আবার কোথাও রয়েছে ‘সোণা’। এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে সচেতনতার সঙ্গে, বানান নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনার কথা বলা যেতে পারে। আবার অসচেতনতার ফলেও বানানের পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। সে যাই হোক ‘ঝুলি’ থেকে বেরনো গল্পগুলোর রসাস্বাদনই মূল কথা।

<u>লোককথার উৎস</u> :

দক্ষিণারঞ্জন বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার দীঘাপাইত গ্রামের জমিদার-গৃহিণী এবং পতি-পুত্রহীনা পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরানীর কাছে থাকতেন। তাঁর পিসিমা বাংলার লোককথার অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিকারিণী ছিলেন। পিসিমার সান্নিধ্যে থাকায় স্বভাবতই বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের মুগ্ধতা এবং তাঁর সাহিত্য-জীবনেরও শুভ সূচনা। অবশ্য এর আগে যতদিন তাঁর জননী জীবিত ছিলেন প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর মুখ থেকে ‘কথাকাব্যের মধুরস সংযোগে’ রূপকথার গল্প শুনতেন দক্ষিণারঞ্জন। ফলে রূপকথার আনন্দলোকে তাঁর প্রবেশ আগেই ঘটেছিল। যাই হোক তাঁর বাংলা লোককথা সংগ্রহের সদিচ্ছার পশ্চাতে ছিল পিসিমার প্রেরণা। এছাড়া আর একটা কার্যকরী প্রভাব হল তাঁর গ্রামাঞ্চল প্রদক্ষিণ। ‘‘এই গ্রামাঞ্চল পর্যটনের ফলেই তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজীবনের সঙ্গে যেমন গভীর ভাবে পরিচিত হন, তেমনিই এই সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।’’[১৩] তিনি জমিদারি দেখাশোনার কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। বাংলার নদী, মাঠ, ঘাট, নৌকাভ্রমণ, রাখালের বাঁশি, ‘রসিক মাঝির ভাটিয়ালী গান’ তাঁকে রূপকথা-রসে মগ্ন করে তুলল। অধস্তন প্রজাদের সঙ্গে নিংসঙ্কোচে মিশে গিয়ে তাদের ‘হৃদয়রসে জারিত’ গ্রাম-বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ-লোককথা উদ্ধার করে আনলেন। ‘‘গ্রামবাংলার সেই দামাল ছেলে গ্রাম-বাংলার হারিয়ে-যাওয়া প্রায়-অবহেলিত সম্পদ্‌কে উদ্ধার করার কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহের নিভৃত পল্লীর ঠাকুরমাদের অভিজ্ঞতার বলিরেখা, গ্রাম-বৃদ্ধের কথকতার অসামান্য

ভঙ্গি দক্ষিণারঞ্জনের সংগ্রহ পুস্তকে কালির আঁচড় কাটতে লাগল।"[১৪] টাঙ্গাইলের পিঙ্গেরের কাছাকাছি কোন গ্রামের শতাধিক বর্ষীয়া যুগী জাতীয়া বৃদ্ধার মুখনিঃসৃত কাহিনি এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কারো মতে, "আমার ঠাকুরদাদের আমলে এক খুব বড় গল্প বলিয়ে মানুষ ছিলেন। তাঁর নাম সোনাঢুলি। ...আমাদের গাঁয়ের সবাই বলে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' আর 'ঠাকুরদাদার থলে' লিখেছেন, এ সবই আসলে সোনাঢুলির শাস্তর।"[১৫] প্রায় এক যুগের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলার হারিয়ে যাওয়া কথা-সাহিত্য সম্পদের পুনরুদ্ধার হয়। একই কাহিনি নানা জনের মুখে নানান ভঙ্গিতে বহুবার শুনে এবং তার থেকে 'পরিবর্জন-পরিমার্জন' করে দক্ষিণারঞ্জন 'লোককথা'র কাঠামো নির্মাণ করেছেন। উনিশ শতকে তাঁর লোককথা সংকলনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল আর বিশ শতকে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হল। তিনি শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং লোকমুখেও রূপকথার কাহিনি সংগ্রহ করতেন। এছাড়া আরেক বিষয়ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তা হল 'পরণকথা' বা গল্পের আসর। টাঙ্গাইলে, দক্ষিণারঞ্জনের পিসিমার বাড়িতে মাঝে মাঝে এই 'পরণকথা' বসত। সেখানে গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গানের সুরে গল্প বলত। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন 'পরণকথা'র 'সবচেয়ে উৎসাহী শ্রোতা'।

বাংলার লোকসাহিত্য পুনরুদ্ধারে দক্ষিণারঞ্জনের অপর বিশেষ কৃতিত্ব লোকমুখে সংগৃহীত এই লোককাহিনির সংরক্ষণ পদ্ধতি। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহসভাপতি, এই সংস্থার মুখপত্র 'পথ'-এর সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির কার্যকরী সভাপতি হওয়ার সুবাদে বিশেষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। গ্রামের বৃদ্ধাদের মুখ-নিঃসৃত কাহিনি, বৃদ্ধাদের ফোকলা দাঁত ও জিহ্বার জড়তার জন্য প্রায়শই জড়িয়ে যেত। এই সমস্যার সমাধানে দক্ষিণারঞ্জন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েছিলেন। এক প্রাচীন ধরনের ফোনোগ্রাফের সাহায্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গল্প কথাকে মোমে-করা রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করে নিতেন। তারপর বাড়িতে বার বার বাজিয়ে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সঠিক কাহিনিটি আবিষ্কার করে খাতায় লিখে নিতেন। তারপর তার সঙ্গে নিজস্ব লিখন-রীতি, কৌশল, দক্ষতা অনুযায়ী সেই কাহিনির সাহিত্যরূপ দান করতেন। বলা যায়, পঁচাত্তর শতাংশ যদি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে সংগৃহীত, তো পঁচিশ শতাংশ তাঁর কল্পনাপ্রসূত। দুই-য়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ গল্পের চেহারা পেয়েছে। আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর ভাবনায়: "Majumdar was probably the

first collector to use a phonograph in field collecting, and all his books faithfully reproduce typical folktales and folklife in the then East Bengal."[১৬]

<u>**লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে দক্ষিণারঞ্জনের লোককথা সংগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের গ্রন্থাবলী:**</u>

- **উইলিয়াম কেরী** (১৭৬১-১৮৩৪)— বাংলা সাহিত্যে লোককথার উপাদান সংগ্রহ ও চর্চার প্রথম সূত্রপাতের কৃতিত্ব যে উইলিয়াম কেরী-র একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কেরী-র রচিত গ্রন্থদ্বয় হল যথাক্রমে *কথোপকথন* (১৮০১) এবং *ইতিহাস মালা* (১৮১২)। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত তাঁর *ইতিহাস মালা* (১৮১২)-কে আপাতদৃষ্টিতে ইতিহাসের গ্রন্থ বলে মনে হলেও ইতিহাসের সঙ্গে আদতে এর সম্পর্ক নেই। এটা আসলে ছোট-বড় মিলিয়ে দেড়শ বিশুদ্ধ গল্পের সংকলন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা গল্প বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ থেকে সংগৃহীত গল্প রয়েছে। যে সালে *ইতিহাস মালা* রচিত হয়েছিল, সেই ১৮১২ সালেই জার্মানির গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত লোককথার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। *ইতিহাস মালা*-র "কোনো আখ্যানের সঙ্গেই ইতিহাসের কোনো সংযোগ নেই। নিছক নীতি-উপদেশমূলক গালগল্প এর কলেবর পূর্ণ করেছে। এর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরল ও সহজ সাধুভাষার আদর্শে পরিকল্পিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেক লেখকের চেয়ে এর রচনাভঙ্গিমা চিত্তাকর্ষক।"[১৭] তাছাড়া বাংলার লোকপ্রচলিত গল্পগুলোকে বাংলাভাষায় তাঁর প্রথম মুদ্রিত করার কৃতিত্ব অবশ্য অনস্বীকার্য।

- **লালবিহারী দে** (১৮২৪-১৮৯৪)— বাংলা লোককথা চর্চার ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর পরেই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তাঁর *Folktales of Bengal* (১৮৮৩) একজন বাঙালি কর্তৃক বাংলার প্রথম লোককথা সংগ্রহ হলেও গ্রন্থটা ইংরাজি ভাষায় রচিত। গ্রন্থটাতে সর্বমোট বাইশটা গল্প সংকলিত হয়েছে। তবে উইলিয়াম কেরী ও লালবিহারী দে — দুজনেরই লোককথা সংগ্রহ সম্পর্কে বলা যায়: "উইলিয়াম কেরী 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংকলিত করেছিলেন; কিন্তু, তিনি কোথাও গল্পগুলি সংগ্রহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেননি। একাজ পরবর্তীকালে আংশিকভাবে করেছিলেন

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, যদিও তাঁর এই চেষ্টা বহুলাংশেই ছিল অবৈজ্ঞানিক।"[১৮] আর গল্পগুলো ইংরাজি ভাষায় রচিত হওয়ায় সেগুলো বাংলার সাধারণ শিশু এমনকী পূর্ণবয়স্ক মানুষের বোঝার ক্ষেত্রেও দুঃসাধ্য ছিল।

- **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৭১-১৯৫১)— বাংলা সাহিত্য বিশেষত লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির জগতে অবনীন্দ্রনাথ এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গল্প, ছড়া, গান, কথকতায় তাঁর *বাংলার ব্রত* (১৯১৯), *মারুতির পুঁথি* (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), *চাঁইবুড়োর পুঁথি* (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *গঙ্গাফড়িং* (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), *আলোয় কালোয়* (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), *কারিগর ও বাজিকর* (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), *কনকলতা* (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), *কোণের ঘর* (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), *সাথী* (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), *খোকাখুকি* (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কল্পগল্প এককথায় অনবদ্য। *বুড়ো আংলা* (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) বা *আলোর ফুলকী* (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি গল্প বিদেশি গল্পকেও স্বদেশি মোড়কে ঢেকে দেওয়ার সাক্ষ্য দেয়। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ *নালক*, *রাজকাহিনী*, *ভূত পত্‌রির দেশ* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা লোককথা চর্চার ইতিহাসে তাঁর *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), *কনকলতা* উল্লেখযোগ্য রূপকথা গ্রন্থ। এগুলোতে একটাই মাত্র গল্প আছে। শিশুপাঠ্য ও লোকসাহিত্যের দিগন্তে গ্রন্থগুলো বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

- **জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত** (১৮৭৬-১৯৩৭)— ঐতিহাসিক বিচারে বাংলা লোককথা চর্চার ধারায় দক্ষিণারঞ্জনের পরেই জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্তের কথা উল্লেখ্য। তাঁর *উপকথা* গ্রন্থে (১৯০৭) দুই খণ্ডে তেরোটা করে মোট ছাব্বিশটা গল্প সংকলিত। নামে 'উপকথা' হলেও শেয়াল, বাঘ, হীরামন তোতা সহ বিভিন্ন জীবজন্তুর গল্প যেমন এতে রয়েছে, তেমনই আবার রাজপুত্র, সওদাগর পুত্র, সুবর্ণবরিষণ রাজা, শঙ্খকুমারের গল্পও আছে। জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত তাঁর গল্পের ভূমিকায় নিজেকে লোককথার প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে দাবি করলেও তাঁর এই দাবি যথার্থ নয়।

- **উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী** (১৮৬৪-১৯১৬)— শিশু সাহিত্যিক হিসাবে *ছেলেদের রামায়ণ*, *ছোটদের মহাভারত*, *পৌরাণিক কাহিনী*, *সেকালের কথা* রচনা করে বিখ্যাত হলেও বাংলা

লোককথা চর্চার ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোরের গুরুত্ব এখানেই যে উপকথা বা পশুকথার উপযোগিতা তিনিই প্রথম সার্থকভাবে অনুভব করেন এবং রচনা করেন *টুনটুনির বই* (১৯১০)। কারণ এর আগে বাংলা লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই রূপকথার সংগ্রহ হত। এই গ্রন্থেও মোট ছাব্বিশটা গল্প সংকলিত হয়েছে। শিয়াল, বাঘ, হাতি, ষাঁড়, কুমীর, ছাগলছানা, কাক, টুনটুনি, চড়াই প্রভৃতি পশু-পাখি বিষয়ক সতেরোটা গল্প এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তবে গ্রন্থটাতে নাপিত, চাষা, ব্রাহ্মণ, রাজার গল্পও রয়েছে।

- **শান্তা দেবী** (১৮৯৩-১৯৮৪), **সীতা দেবী** (১৮৯৫-১৯৭৪) — লোককথা চর্চার ক্ষেত্রে শান্তা দেবী সীতা দেবীর গুরুত্ব অন্যদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। শান্তা দেবী সীতা দেবী অনূদিত *হিন্দুস্থানী উপকথা* (১৯১২) লোককথার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটা এলাহাবাদের পাণিনি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু প্রণীত *Folk-tales of Hindusthan*-এর অনুবাদ। স্টেড্ সাহেব 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় শেখ দিল্লীর *Folk Tales of Hindusthan* (*ফোক টেল্স অব্ হিন্দুস্থান*) পড়েছেন এবং 'Review of Reviews' পত্রিকার ১৯০৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় এই উপকথার প্রভূত প্রশংসা করে 'আরব্য উপন্যাসের মতো মনোহর' বলেছেন। মোট এগারোটা গল্প আছে এই গ্রন্থে। এগুলোর মধ্যে 'রাজা বিক্রম ও ফকিরের কথা', 'দুই বোকার কথা', 'হীরা ও লালের কথা', 'সাত সেকরার কথা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। শান্তাদেবী সীতাদেবীর প্রথম সাহিত্য প্রয়াস হিসাবে এই অনুবাদ গল্পগুলো বেশ সরস, কৌতূহলোদ্দীপক, চিরায়ত হাসি-আনন্দের উৎসধারা। তাই বলা যেতে পারে, ''শান্তা দেবী সীতা দেবী যদিও এই সময় সবেমাত্র লেখা শুরু করেছেন, কিন্তু ঝরঝরে ভাষায় চমৎকার বর্ণনায় আরব্য উপন্যাসের স্বাদ বজায় রাখতে পেরেছেন।''[১৯]

- **আশ্রাফ সিদ্দিকী** (১৯২৭ -) — লোকসাহিত্যের আলোচনায় আশ্রাফ সিদ্দিকী এক অতি পরিচিত নাম। তিনি *লোকসাহিত্য* (ঢাকা, ১৯৬৩), *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী* (ঢাকা, ১৯৬৫), *Folk loric Bangladesh* (Dhaka, 1976), *Tales from Bangladesh* (Dhaka, 1976) গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন, বিভিন্ন লোককাহিনি সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। লোকবিজ্ঞানী হিসাবেও তিনি

বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় ফোকলোর নিয়ে চর্চা করেন। তিনি লোকসাহিত্যের মূল্যায়নে সমাজ-সংস্কৃতি তথা লোক-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। পাকিস্তান, বাংলাদেশের লোককথা সংকলনে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে।

<u>প্রেরণা</u>:

লোককথা সংগ্রহ-সংকলন, চর্চার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের প্রেরণা ছিলেন যাঁরা:

- **আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন** (১৮৬৬-১৯৩৯): আজ সমগ্র বিশ্বে বাংলা লোকসাহিত্য যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, তার পেছনে দীনেশচন্দ্র সেনের অবদান যথেষ্ট। ‘‘বাঙলার লোকসাহিত্য ও দীনেশচন্দ্র সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর উদ্যম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত অধ্যায় বিশেষ করে লোকসাহিত্যের বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়।’’[২০] দীনেশচন্দ্র *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৮৯৬), *History of Bengali Language and Literature* (১৯১১) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। লিখিত সাহিত্যের প্রাচীন পুথি সংগ্রহের উৎসাহী অভিযান যেমন চালিয়েছিলেন তিনি, তেমনই দীর্ঘকাল ধরে মৌখিক ঐতিহ্যের একটা ধারা — লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাও করে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিস্তৃত কলেবর লোকসাহিত্য গ্রন্থগুলো হল: *গোপীচন্দ্রের গান* (১ম খণ্ড ১৯২২, ২য় খণ্ড ১৯২৪), *ময়মনসিংহ গীতিকা* (১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৯২৩), *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* (২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৯২৬, ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৯৩০, ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৯৩২), *The Folk-Literature of Bengal* 1920, Eastern Bengal Ballads, Mymensing (Vol.1, Pt.I:1923, II, Pt1: 1926, III, Pt.1:1928, IV, Pt.1: 1932). তৎকালীন বঙ্গভাষা বিভাগের দীনেশচন্দ্রের পুথি ও লোক সাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেশ ও তার ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘‘গীতিকা ও লোককথা সংগ্রহে দীনেশচন্দ্র অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং নিষ্ঠাবান সংগ্রাহকদের দ্বারা বাংলার মৌখিক সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়ে প্রকাশিত করেন— এ এক বিস্ময়কর ঘটনা।’’[২১]

অথচ লোকসাহিত্যের এই পথিকৃৎ কিছুটা উপেক্ষিতই ছিলেন বলা যায়। বাংলা লোককথার সংগ্রাহক-সংরক্ষক দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দীনেশচন্দ্র গ্রাম বাংলার বহু নিরক্ষর মানুষের কাছ থেকে লোকসাহিত্যের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহও দান করেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের বহু প্রসিদ্ধ *ঠাকুরমা'র ঝুলি* প্রকাশের মুখ্য উৎসাহদাতা ও সহায়ক তিনিই ছিলেন। বাংলা লোকসংস্কৃতির জগতে তিনি বিখ্যাত *পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা* ও *পূর্ব্ব ময়মনসিংহগীতিকা* সম্পাদনার কারণে। তাঁর *The Folk Literature of Bengal* গ্রন্থে তিনি বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথা ও উপকথার একটা সংকলন ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। বাংলা লোককথার পাঠ পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও আলোচকের ভূমিকা নিতেন।

- **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** (১২৭৮-১৩২৯ বঙ্গাব্দ): আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের *ছেলেভুলানো ছড়া* ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। *মেয়েদের ব্রতকথা* (১৩২১ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে ব্রতকথাগুলো সংকলন করেন তার বেশিটাই যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, হুগলী, বর্ধমান, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত। তিনি বাংলা ছড়া ও অবিমিশ্র বাংলা রূপকথার প্রথম সংকলক ছিলেন। তবে দীনেশচন্দ্রের মতই বাংলা লোকসাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে তিনিও অবহেলিত ছিলেন। 'ছেলে ভুলানো গল্পের তরঙ্গ' পর্যায়ে *রাক্ষস-খোক্ষস* (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) এবং *ভূত-পেত্নী* (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) নামে লোককথার দুটো সংকলন প্রকাশ করেন। শিশু মনোরঞ্জন ছাড়াও এই গ্রন্থ দুটো প্রকাশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিফলিত হয়। সমালোচকের দৃষ্টিতে শিশুমনে *ভূত-পেত্নী* গ্রন্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলেও লোকসাহিত্য সংকলনের ইতিহাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভূত প্রশংসার দাবিদার। তিনি লোককথাগুলোর আঞ্চলিক রূপ পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিলেন, কোথাও কোনওরকম বিকৃতি বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেননি।

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৬১-১৯৪১): বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছড়া সংগ্রহের কাজে রত ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠার পর পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রকাশিত

হয়। ‘সাধনা’ পত্রিকায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘মেয়েলিছড়া’ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটা পরে ১৩০২ বঙ্গাব্দের ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আশা ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের দেশজ সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতিকে ঠিকমত সংগ্রহ-সংরক্ষণ করা যাবে। হয়েছিলও তাই। এর পর থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছড়া, গান ইত্যাদি সংগ্রহ ক’রে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করলেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁদেরই একজন। দেশিয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ জনমানস থেকে ক্রমশ যে হারিয়ে যেতে বসেছে রবীন্দ্রনাথ সেকথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে উপলব্ধি দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এই উপলব্ধিরই ফল দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা’র ঝুলি*। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থের ‘ভূমিকা’ লেখকও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর *লোকসাহিত্য* (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) প্রথম গ্রন্থ যার মধ্যে লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থে ‘ছেলে ভুলানো ছড়া’র প্রবন্ধ দুটো ছাড়াও ‘কবিসংগীত’ ও ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ও স্থান পেয়েছে। লোকসাহিত্যের মধ্যে আবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় লোককথা। রূপকথা, উপকথা, নীতিকথা ইত্যাদি লোককথার নানান উপাদান রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু সাহিত্যে সুকৌশলে প্রয়োগ করেছেন। যেমন— *সোনার তরী* কাব্যের ‘বিম্ববতী’, ‘রাজার ছেলে’, ‘রাজার মেয়ে’, ‘নিদ্রিতা’, ‘সুপ্তোত্থিতা’; *কল্পনা* কাব্যের ‘জুতা আবিষ্কার’; *শিশু* কাব্যের ‘খোকা’, ‘বীরপুরুষ’; ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের ‘রাজার বাড়ি’; *পরিশেষ* কাব্যের ‘রাজপুত্র’, ‘বিচিত্রা’, ‘ছুটির দিনে’; ‘আতঙ্ক’ কবিতায়; ‘ডাকঘর’, ‘চণ্ডালিকা’ নাটকে; *গল্পগুচ্ছ*-এর বিভিন্ন গল্পে; *সাহিত্যের পথে* ইত্যাদি প্রবন্ধ-গ্রন্থে রূপকথার বিষয় ও গঠন লক্ষ করা যায়। দক্ষিণারঞ্জনের লোককথা সংগ্রহের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থ পূর্বসূরী।

- **আশুতোষ চৌধুরী** (১৮৮৮-১৯৪৪): পূর্ববঙ্গ-গীতিকা সংগ্রহের কাজে যেসব ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন আশুতোষ চৌধুরী। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ছিল। তাই দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রামের বহু স্থান থেকে লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল গীতিকাগুলো গ্রাম্য অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষদের দ্বারা বাহিত এবং অনুষ্ঠিত। আশুতোষ চৌধুরীর দ্বারা চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত গীতিকা বাংলা আকাদেমি

থেকে মৌমেন চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জনের বাংলা লোককথা সংকলনের ক্ষেত্রে আশুতোষ চৌধুরীর এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছিল। কারণ আশুতোষ চৌধুরীও বাংলা মৌখিক সাহিত্যের নানা নিদর্শন দীনেশচন্দ্রের উৎসাহে সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা লোকসাহিত্যে দীনেশচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সুধী, বিদ্বান ও নিষ্ঠাবান সংগ্রাহকের আবির্ভাব হয় তাদের মধ্যে আশুতোষ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম থেকে যেসব 'স্বতন্ত্র প্রাণধর্মসমন্বিত গীতিকা' সংগৃহীত হয়েছিল তাতে আশুতোষ চৌধুরী প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। অপরিসীম উদ্যম ও পল্লীসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল বলেই বিপুল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পালা সংগ্রহের কাজচালিয়ে গেছেন। ''সংগ্রাহক হিসাবে আশুতোষ চৌধুরীর আরও অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাঁর ফটোগ্রাফ সংগ্রহ। ভেলুয়া, কাঞ্চনমালা, মহুয়া, মইষালবন্ধু প্রভৃতি কাব্যে যে সকল ডিঙ্গি নৌকা ও জাহাজের বিবরণ পাওয়া যায় তার বহু ফটোগ্রাফ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে জীবন বিপন্ন করে সংগ্রহ করেন।''[২২] তিনি যেসব কাহিনি সংগ্রহ করেন সেগুলো হল: 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'কাফেন চোরা', 'ভেলুয়া', 'হাতী খেদা', 'কমল সদাগর', 'সুজা-আয়ার বিলাপ', 'নূরন্নেহা ও কবরের কথা', 'নসর-মালুম', 'পরীবানুর হাঁহলা'।

<u>এখন প্রশ্ন দক্ষিণারঞ্জন গল্পগুলো বলেছেন কিভাবে এবং তাতে রূপকথার আস্বাদ কতটা রয়েছে</u>?

''দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া, তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত। আমি হইলে ত এ কাজে সাহসই করিতাম না।''[২৩] সন্দেহ নেই সাহসটা করেছেন দক্ষিণারঞ্জন। তবে এই সাহস কিভাবে দেখিয়েছেন এবং তাতে কতটা সফল হয়েছেন প্রশ্ন সেটাই। একজন ভালো গল্প-বলিয়ে শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে যে কাজ সম্ভব হয়নি সে কাজ যে একজন পুরুষ নিপুণ দক্ষতায় করতে পারবে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধারণাতীত ছিল। বিদেশি শিক্ষার প্রভাবে বাংলার নিজস্ব সম্পদ রূপকথার যে আঙ্গিক নারীরাও ভুলতে বসেছিল

পুরুষ দক্ষিণারঞ্জন সে কাজেই প্রচেষ্টা চালালেন, উদ্ধার করে আনলেন 'স্নেহময়ীদের মুখের কথা', 'দেশলক্ষ্মীদের বুকের কথা'।

গল্পগুলো যেভাবে সংগৃহীত হয়েছিল *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র প্রথম সংস্করণে দক্ষিণারঞ্জন অবিকল সেভাবেই গল্পগুলো প্রকাশ করেছিলেন। তবে টাঙ্গাইলের পিঙ্গেরের কাছাকাছি কোন গ্রামের শতবর্ষীয়া যুগী জাতীয়া বৃদ্ধার আঞ্চলিক ভাষায় প্রদত্ত কথন প্রথম সংস্করণেও কতটা রক্ষিত হয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহটা রয়েই যায়। তবে ''...'ঠাকুরমা'র ঝুলি'-র প্রথম গুণগ্রাহী পাঠকেরা তার রূপ বা ভাষাপ্রাচীনতার চাইতে লক্ষ্য রেখেছেন কথাবস্তুর দিকে। আজ অবশ্য পণ্ডিতেরা স্থির করেই দিয়েছেন, লোককথা-রূপকথা দিনে দিনে জনে জনেই সংক্ষেপ বিস্তার করে বা ভরিয়ে পুরিয়ে তার পাঠের বদল করে দেন মূল কথাবস্তুটিকে অবলম্বন করেই।''[২৪] গ্রীম ভাইরাও তাদের সংগৃহীত রূপকথার প্রত্যেক সংস্করণে পাঠ-পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার এবং আরও অনেক সমালোচকের কাছে ময়মনসিংহী উচ্চারণ দুর্বোধ্য ঠেকে। তাছাড়া ''ভাষিক আঞ্চলিকতা মাত্রাছাড়া উগ্র হলে তেমন বিকোবে না ঠাকুরমা'র ঝুলি, হিতৈষীদের এহেন ইঙ্গিতে বইয়ে কিছুটা অদলবদল করেন দক্ষিণারঞ্জন।''[২৫] *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮)-র ক্ষেত্রেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। সর্বজনবোধ্য হতে গেলে এদিকে রূপকথার রসে আবার কিছুটা কম পড়ে যায়। কারণ গ্রাম-বাংলার দেশজ সংস্কৃতি এই লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর কথনরীতি। নাগরিক সাহিত্য যেখানে শুধুই পড়ার, লোকসাহিত্য সেখানে আবৃত্তিরও। লোককথার প্রসাদ সকলের পাতে পরিবেশন করতে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন আঞ্চলিকতা কিছুটা পরিহার করলেও এর বিশেষ কথনভঙ্গি, কাব্যধর্মিতা, বিশেষ পরিবেশন পদ্ধতি — সব কিছুই বজায় রেখেছিলেন। ফলে লোককথার স্বাদ নিতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধাও হয়নি। ''কেউ কেউ গঠনরীতির দিক দিয়ে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র গল্পগুলিতে ত্রুটি লক্ষ করলেও রূপকথার পরিমণ্ডল ও মোহজাল সৃষ্টিতে লেখকের যাদুকরী ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য এবং বিশেষতঃ রূপকথা কথকের কথনভঙ্গির উত্থান-পতনের ছন্দটিকে যথাযথ রক্ষার জন্য দক্ষিণারঞ্জনের প্রশংসা না করে পারেননি।''[২৬] বাংলাদেশের শিশুরা রূপকথার যে আনন্দ-রস থেকে বঞ্চিত ছিল এতকাল ধরে তারাও এবার সেই রসগ্রহণে সক্ষম হল এবং ধন্য হয়ে গেল। বিলেতের 'Fairy Tales' ছেড়ে দেশি রূপকথার স্বপ্ন দিয়ে ঘুমের জগত ভরিয়ে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনের বর্ণনা-রীতির প্রশস্তি উচ্চারণ করলেন: "ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"[২৭] রূপকথার স্বাদ-গন্ধ এতে পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে।

ঠাকুরমা'র ঝুলি ছাড়াও *চিরদিনের রূপকথা*-ও দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত ও সংরচিত লোককথার মধ্যে পড়ে। বিশেষত এর নামের সঙ্গে 'রূপকথা' শব্দটিও সংযোজিত।

<u>*ঠাকুরমা'র ঝুলি* ও *চিরদিনের রূপকথা*-র গল্পগুলোর বিষয়বস্তু:</u>

'বাংলার রস' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'বাংলা সাহিত্য সম্পুষ্ট' (কালীপ্রসন্ন ঘোষ), 'নিখুঁত সাহিত্য' (অক্ষয়চন্দ্র সরকার), 'জাতির আশায় স্বপ্নের ভাষায় ...অভাবনীয় সত্যসাহিত্য' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'অমূল্য... বাঙ্গালা সাহিত্যের আনন্দ... বাঙ্গালার পূর্ণতা' (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী), 'A Nations's Attractions' (শিশিরকুমার ভাদুড়ী), 'বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর' (শ্রীঅরবিন্দ), 'জাতির চিরজয়' (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ইত্যাধি নানা অভিধায় ভূষিত বাংলার চিরায়ত কথা-সাহিত্য *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র চারটে বিভাগ: দুধের সাগর, রূপ-তরাসী, চ্যাং-ব্যাং আর আম-সন্দেশ। 'দুধের সাগর'-এ রয়েছে ছ'টা গল্প— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্ত পুরী', 'কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'শীত-বসন্ত' আর 'কিরণমালা'। 'রূপ-তরাসী'-তে আছে চারটে গল্প— 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা', 'সোনার কাটী রূপার কাটী'। 'চ্যাং-ব্যাং'-এর অন্তর্ভুক্ত গল্প চারটে— 'শিয়াল পণ্ডিত', 'সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী', 'দেড় আঙ্গুলে'। 'আম-সন্দেশ'-এ একটা ছড়া রয়েছে।

- **'কলাবতী রাজকন্যা'**— এক রাজার সাত রানী। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকলেও সন্তানের অভাবে রাজার মনে ভারি দুঃখ। একদিন রানীরা নদীর ঘাটে স্নান করতে গেলে এক সন্ন্যাসী বড়রানীর হাতে একটা শিকড় দিয়ে বলেন বেটে খেলে রানীদের 'সোনার চাঁদ ছেলে' হবে। কিন্তু বড় পাঁচ রানী শিকড় বাটা খেয়ে নেওয়ায় ন-রানী বাটির তলানি আর ছোট রানী শিল-ধোয়া জল খান। ফল যা হওয়ার হল তাই। পাঁচ রানীর 'সোনার চাঁদ' আর

ন-রানীর পেঁচা, ছোটরানীর 'বাঁদর চাঁদ ছেলে' হয়। ছেলেরা বড় হতে থাকে। পাঁচ রাজপুত্রের অত্যাচারে 'রাজ্যের লোক তিত-বিরক্ত'। ওদিকে পেঁচা রাজপুত্র ভূতুম্ ও বাঁদর রাজপুত্র বুদ্ধু তাদের চিড়িয়াখানার বাঁদী ও ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী মায়েদের সাধ্যমত সাহায্য করে। একদিন রাজপুত্রেরা ময়ূরপঙ্খী চড়ে মেঘ-বরণ চুল কুঁচ-বরণ কন্যা কলাবতীর সন্ধানে তাঁর দেশে রওনা দেন। বুদ্ধু-ভূতুম্ও তাঁদের মায়েদের ভাসানো সুপুরির ডোঙ্গায় যাত্রা শুরু করে। পাঁচ রাজপুত্রের বাধা উপেক্ষা করে রাঙ্গা-নদীর জল পেড়িয়ে, কাঁথা-বুড়ী আর অন্ধকুঠুরীর হাত এড়িয়ে বুদ্ধু, রাজকন্যার মোতির ফুল জয় করে। সেইসঙ্গে বুদ্ধু-ভূতুম পাঁচ রাজপুত্রকেও উদ্ধার করে। রাজপুত্রদের নানান কৌশল সত্ত্বেও কলাবতী রাজকন্যার সঙ্গে বুদ্ধুর বিয়ে হয়। ভূতুমের সঙ্গে বিয়ে হয় আর এক দেশের রাজকন্যা হীরাবতীর। পাঁচ রানী ও পাঁচ রাজপুত্রেরা শাস্তি পান। একদিন রাজকন্যারা 'বিছানার উপরে বানরের ছাল' আর 'পেঁচার পাখ' দেখে পুড়িয়ে ফেলেন। সকলে দেখেন 'দেবতার মত মূর্ত্তি দুই সোনার চাঁদ রাজপুত্র'কে। বুদ্ধু হন বুধকুমার আর ভূতুম রূপকুমার। সকলে সুখে দিন কাটাতে থাকেন।

- **'ঘুমন্ত পুরী'**— এক দেশের এক রাজপুত্র দেশভ্রমণে বেরিয়ে এক ঘুমন্ত পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। এ কুঠুরী ও কুঠুরী দেখতে দেখতে হঠাৎ 'হাজার হাজার ফুলের গন্ধে রাজপুত্র বিভোর' হয়ে যান । সুগন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখেন এক কুঠুরীর মাঝখানে জল নেই অথচ লক্ষ লক্ষ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের সুগন্ধে ঘর সুরভিত। রাজপুত্র ধীরে ধীরে ফুলবনের কাছে গিয়ে দেখলেন ফুলের বনে সোনার খাটে হীরার ডাঁটে দোলানো ফুলের মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্মে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ঘুমে বিভোর। এইভাবে দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে যায়। 'রাজকন্যার আর ঘুম ভাঙ্গে না, রাজপুত্রের চক্ষে আর পলক পড়ে না।' একদিন রাজপুত্র লক্ষ করেন, 'রাজকন্যার শিয়রে এক সোণার কাটী!' 'আর একদিকে এক রূপার কাটী।' দুই কাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সোনার কাঠি রাজকন্যার মাথা ছুঁয়ে যেতেই রাজকন্যা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র সহ গোটা রাজপুরী জেগে ওঠে। এক দৈত্য 'গম্‌গমা সোনার রাজ্য'কে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। ঘুম ভাঙায় সকলে খুশি। রাজা ধূমধাম সহকারে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দেন। রাজপুত্র নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন।

- **‘কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা’**— এক রাজপুত্র আর এক রাখাল বন্ধু। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা হয়ে রাখাল বন্ধুকে মন্ত্রী করবেন। রাজা হয়ে রাজপুত্রের কাঞ্চনমালা রানী, কিন্তু রাজার রাখালবন্ধুকে আর মনেই পড়ে না। একদিন রাখাল রাজদুয়ারে বন্ধুর রানীকে দেখতে এলে দুয়ারী তাকে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে ‘রাখাল কোথায় গেল, কেহই জানিল না।’ পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সকলে চেয়ে দেখে রাজার মাথার চুল থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর সূঁচ হয়ে গিয়েছে। রাজা মনে মনে বোঝেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পাপেই তাঁর এই দশা। একদিন রানী নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সূঁচ রাজার সূঁচ খুলে দিতে পারার শর্তে হাতের কাঁকন দিয়ে এক পরমাসুন্দরী দাসী কেনেন। কিন্তু দাসীর কূটচক্রান্তে সে হয় রানী আর রানী হন দাসী [clothes → exchange of c. between master, servant k527.3]। একদিন নদীর ঘাটে কাঞ্চনমালার সঙ্গে সূঁচের সন্ধানী এক মানুষের সাক্ষাৎ হয়। মানুষটি রাজপুরীতে গিয়ে দাসী ও রানীর নানান পরীক্ষা নিয়ে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পারে, সে সূঁচরাজাকে সূঁচের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিও দেয়। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারেন। দুই বন্ধুর সুখে দিন কাটতে থাকে।

- **‘সাত ভাই চম্পা’**— ‘এক রাজার সাত রাণী’। কিন্তু সেই এক সমস্যা। রাজার কোন সন্তান নেই। মনের দুঃখে রাজার দিন কাটে। একদিন ছোটরানী সন্তানসম্ভবা হন। যথাকালে ছোটরানী সাত ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম দেন। কিন্তু বাকী ছয় রানীরা ষড়যন্ত্র করে শিশুগুলোকে পাঁশগাদায় পুঁতে তাদের বদলে রাজাকে ব্যাঙের ছানা ইঁদুরের ছানা দেখান। রাজা রাগে অগ্নিশর্মা। ফলে ছোটরানী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী। ‘এম্‌নি’ করে দিন যায়। একদিন মালী এসে রাজাকে খবর দেয় পাঁশ গাদার উপরে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটে রয়েছে। কিন্তু রাজা ও তাঁর পাঁচ রানীদের সেই ফুলগুলো তুলতে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ‘ফুলেরা গিয়া আকাশে তারার মত ফুটিয়া রহিল।’ দুয়োরানীও ফুল তুলতে পারেন না। এরপর ফুলেদের দাবি অনুযায়ী ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরানী সেখানে উপস্থিত হন। তখন ফুলের মধ্যে থেকে সাত রাজপুত্র ও এক রাজকন্যা ছোটরানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজা ছয় রানীর শাস্তি বিধান করেন এবং সাত রাজপুত্র, পারুল কন্যা ও ছোটরানীকে নিয়ে রাজপুরীতে যান।

- **‘শীত বসন্ত’**— এক রাজার দুই রানী, সুয়ো আর দুয়ো। দুয়োরানীর দুই ছেলে শীত আর বসন্ত। নিঃসন্তান সুয়োরানীর গঞ্জনা খেতে খেতে দুয়োরানী ও তার পুত্রদের দিন কাটে। একদিন নদীর

ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর মাথায় 'ওষুধের বড়ী' টিপে তাঁকে টিয়া বানিয়ে দেন। 'মা-হারা শীত-বসন্তের দুঃখের সীমা রহিল না।' ওদিকে আর এক রাজার রাজকন্যার সোনার পিঞ্জরে ঠাঁই হয় টিয়া-দুয়োরানীর। দিন যায়, বছর যায়, সুয়োরানীর 'পাটকাটী' তিন ছেলে হয়। একদিন সুয়োরানীর অভিপ্রায় অনুযায়ী রাজা শীত-বসন্তকে জল্লাদের হাতে সঁপে দে ন। জল্লাদ তাদের প্রাণে মারতে পারে না। শীত-বসন্ত বনের পথে ঘুরে বেড়ান। তৃষ্ণার্ত বসন্তের অনুরোধে শীত সরোবরে জল আনতে গেলে এক শ্বেত রাজহাতি শীতকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে সেই রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। অন্যদিকে এক মুনি বসন্তকে আশ্রয় দেন। তিন রাত যেতে না যেতে সুয়োরানীর পাপে রাজসিংহাসন কেঁপে ওঠে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের কিনারে এলে সুয়োরানীর তিন ছেলেকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শোকে দুঃখে সুয়োরানী আত্মহত্যা করেন। ওদিকে দুয়োরানী, যে রাজকন্যার কাছে আছেন তাঁর স্বয়ম্বর সভা। সেই কারণে সাজসজ্জা করতে গেলে সোনার টিয়া রাজকন্যাকে জানায় 'গজমোতি হ'ত শোভা যোল-কলায়'। গজমোতি আনতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজপুত্রেরা রাজকন্যা রূপবতীর নফর হয়ে থাকেন। একথা শীতরাজার কানে যেতে রাজকন্যাকে তিনি 'আটক' করেন। গজমোতির সন্ধানে বসন্তও মুনির ত্রিশূল নিয়ে 'বার বচ্ছর তের দিনে' 'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছান। তার নীচে ক্ষীর-সাগরে গজমোতি উদ্ধার করে বালির ওপর দিয়ে দেশে যান। যাবার পথে ক্ষীর-সাগরে বালি চাপা পড়া তিন সোনার মাছকেও সঙ্গে নে ন। শীতরাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে সেই বনের মধ্যে উপস্থিত হলে তাঁর মনে ভাই বসন্তের স্মৃতি জাগ্রত হয়। গজমোতি ও সোনার মাছ নিয়ে বসন্ত শীতরাজার রাজ্যে ফিরলে দুই ভাই ও তিন সৎ ভাইয়ের মিলন হয়। গজমোতি আনার খবরে খুশি রাজকন্যা সোনার টিয়াকে স্নান করাতে গেলে ওষুধ-বড়ী খসে দুয়োরানী স্বরূপ ফিরে পান। রাজা-রানী-রাজপুত্রেরা ফিরে যান নিজেদের রাজ্যে।

- **'কিরণমালা'**— এক রাজা ছিলেন। প্রজার সুখ-দুঃখের সন্ধান পেতে রাজা ছদ্মবেশে বেরিয়ে [Disguise→ king in d. (to observe subjects) P 14.19, (to learn subjects' secrets) N467 – Motif-Index of Folk-Literature, Vol. VI, by Stith Thompson, p. 214] এক গৃহস্থের তিন মেয়ের ইচ্ছাপূরণের বাসনা শোনেন। বাসনা

পূরণের ব্যবস্থাও করেন। ফলে বড়বোন ঘেসেড়ার স্ত্রী, মেজো বোন রাজবাড়ির রাঁধুনের স্ত্রী আর ছোটবোন রাজার রানী হয়ে সুখে সংসার করেন। রানী গর্ভবতী হলে হিংসুটে দুই বড় বোন দায়িত্ব সহকারে আঁতুরঘরে গিয়ে রানীর দুই পুত্র ও এক কন্যাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে রাজাকে কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা ও কাঠের পুতুল দেখান। রাজা সেসব বিশ্বাসও করেন। এক ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে রাজপুত্র রাজকন্যাদের নিয়ে গৃহে ফেরেন। তাদের নাম রাখেন অরুণ, বরুণ, কিরণমালা। এদিকে 'রাজার রাজপুরী অন্ধকার'। রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েন, শ্রান্ত রাজা পথ হারিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিন ভাইবোনকে দেখে 'রাজার বুক ধুকু ধুক', 'মন উসুখুসু'। তিন ভাইবোনে মিলে সুন্দর এক অট্টালিকা বানান। একদিন এক সন্ন্যাসী জানান 'মনোলোভা' সেই পুরীতে রূপোর গাছে সোনার ফল, মুক্তো-ঝরার জল, হীরের গাছে সোনার পাখির মধুস্বরের অভাব রয়েছে। সেই অভাব পূরণ করতে মায়াপাহাড়ে গিয়ে অরুণ-বরুণ পাথর হয়ে যান। এবার পালা কিরণমালার। রাজপুত্রের পোষাক পরে [clothes→ disguise of woman in man's – p. 148, Vol. VI] সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে মায়া-পাহাড়ে মায়ার হাতছানি এড়িয়ে ঈপ্সিত বস্তুগুলো লাভ করেন, সেই সঙ্গে দাদাদেরও উদ্ধার করেন। পাখির পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা রাজাকে নিমন্ত্রণ করেন। বিস্মিত মুগ্ধ রাজা খাওয়ার সময় মোহরের পায়েস, মুক্তোর মিঠাই খেতে না পারার অপারগতা জানালে সোনার পাখি জানায় কোন মানবীও কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, কাঠের পুতুলের জন্ম দিতে পারে না। অনুতপ্ত রাজা স্ত্রী-সন্তান সকলকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন।

- **'নীলকমল আর লালকমল'**— এক রাজার দুই রানী। এক রানী রাক্ষসী। 'মানুষ-রাণীর ছেলে কুসুম, আর রাক্ষসী রাণীর ছেলে অজিত।' রাক্ষসী-রানীর, সতীনের ছেলেকে খাওয়ার সাধ অনেকদিনের। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। অথচ অজিত-কুসুমের ভারি ভাব। একদিন রাজার চোখের সামনে রাক্ষসী কুসুমকে খেতে থাকে। অজিত তখন রাক্ষসীকে আঘাত করলে সে এক সোনার ডেলা উগরে দেয়। রাগে-দুঃখে তারপর নিজের ছেলেকেও চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। রানীর গলা দিয়ে লোহার ডেলা গড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মী রানীকে তো রাক্ষসী-রানী আগেই মেরেছে। রাক্ষসী-রানী সোনা ও লোহার ডেলা পুঁতে রেখে তবে স্বস্তি পায়। এক কৃষাণ নদীর

ধারে বাঁশ কাটতে গিয়ে ডিম ফেলে দেয়। আর ডিম ভেঙে লাল নীল রাজপুত্র বেরিয়ে সে রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে যান। 'সে রাজ্যে বড় খোক্কসের ভয়।' রাজার নিয়ম যেকোন জোড়া রাজপুত্র খোক্কস নিধন করতে পারলে জোড়া রাজকন্যা আর রাজত্ব পাবে। সব খোক্কস কেটে ফেলে 'রাজার রাজত্ব' আর রাজকন্যা দুভাই লাভ করেন। রাক্ষসীরানীর কানে একথা পৌঁছালে রাজার ব্যারামের অছিলায় দুই ভাইকে রাক্ষসের মাথার তেল আনতে খবর পাঠায়। তাঁরা বেঙ্গম-বাচ্চার পিঠে চড়ে রাক্ষসের দেশে পৌঁছান। সেখানে আয়ীবুড়ির নানান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নীলকমল-লালকমল তার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেন এবং জীয়নকাঠি মরণকাঠি দুই ভীমরুল ভীমরুলীকে মেরে রাক্ষসী-রানীসহ যত রাক্ষস নিধন করেন। নীলকমল আর লালকমল পিতার রাজ্যে ফিরে গিয়ে 'সুখে কাল' কাটাতে থাকেন।

- '**ডালিম কুমার**'— এক রাজার এক রানী ও এক রাজপুত্র। রাজপুরীর তালগাছের এক রাক্ষসী, [palmyra→ residents (as magicians) D1711.10.05] 'রাণীর আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে' জানতে পেরে রাজপুত্রের মাধ্যমে কৌশলে সেগুলো হাতিয়ে রানীকে মেরে ফেলে এবং নিজে রানী সেজে বসে। রাজপুত্র ছাড়া কেউ একথা টের পান না। কালক্রমে রাজার আরও সাত পুত্র জন্মায়। তাঁরা বড় হন এবং বড়কুমারকে নিয়ে আটভাই দেশভ্রমণে বেরোন। বড় কুমারকে যেতে দেখে সূতাশঙ্খ-সাপের কাছ থেকে রাক্ষসী রানী জেনে নেয় 'ডালিম কুমারের আয়ু ডালিমের বীজে'। তারপর সে সূতাশঙ্খকে পাশাবতীর পুরে লিখন সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়, ডালিম হাতে মন্ত্র পড়ে—

পক্ষিরাজ, পক্ষিরাজ, উঠে চলে যা,
পাশাবতীর রাজ্যে গিয়ে ঘাস জল খা।

রাজপুরীর হাজার সিঁড়ির ধাপের নীচে ডালিমের বীজকে 'জন্মের মত বন্ধ' রাখে। তখনই বড় রাজপুত্রের চোখ অন্ধ হয়ে যায়, তিনি বনের মধ্যে একা পড়ে থাকেন। সূতাশঙ্খ পাশাবতীর পুরে না গিয়ে 'পরিপাটী রাজার বাগান'-এর গাছের এক ফলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং রোজকার অভ্যাসবশত রাজকন্যা সেই বাগানের ফল খেলে সূতাশঙ্খ ও লিখন রাজকন্যার পেটে চলে যায়। অন্যদিকে সাত রাজপুত্র পাশাবতীর রাজ্যে হাজির হন এবং পাশাবতীর কাছে পাশাখেলায় হেরে যাওয়ায় পাশাবতীরা সাতবোনে তাঁদের খেয়ে ফেলে। রাজকন্যার পেটে

সূতাশঙ্খ থাকায় তাঁর সঙ্গে যারই বিয়ে হয় সূতাশঙ্খ তাঁকেই খেয়ে ফেলে অথচ কেউ বুঝতে পারে না 'রাজাকে কিসে খায়!' রাজা না থাকলে রাজ্য চলে না; 'তাই নিত্য নূতন রাজা চাই!' একদিন রাজার পাটহাতি অন্ধ রাজকুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। রাজপুত্র তাঁর মানসিক শুদ্ধতার তরোয়ালে সূতাশঙ্খকে টুকরো টুকরো করেন, অমনি রাজপুত্রের আয়ু সোনার ডালিম গাছ হয়ে গজিয়ে ওঠে। রাক্ষসী ভয়ে পালিয়ে যায়। রাজপুত্র এরপর বুদ্ধি করে পাশা খেলায় পরাজিত করে পাশাবতীর হাত থেকে সাত ভাইকে উদ্ধার করেন। আট রাজপুত্র রাজপুরীতে ফিরে যান, রানীও বেঁচে ওঠেন।

- **'পাতাল-কন্যা মণিমালা'**— এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রীপুত্র দেশভ্রমণে বেরোন। এক পাহাড়ের কাছে পৌঁছে সরোবরের পাড়ে এক গাছে রাত কাটাতে গিয়ে তাঁরা দেখেন 'আকাশ পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক কাল্-অজগর' তাঁদের ঘোড়া দুটোকে গিলে খাচ্ছে। অজগরের মণির আলোয় গোটা বন আলোকিত। মন্ত্রীপুত্র খানিকটা কাদা মণির উপর ফেলে তাঁর তরোয়াল কাদার ওপর উল্টে রাখায় রাগে দুঃখে পাগল হয়ে তরোয়ালে মাথা খুঁড়ে অজগর মরে যায়। তখন মণি হাতে দুজনে সরোবরে নেমে যতদূর যান জল দুভাগ হয়ে শুকিয়ে যায়। তাঁরা পাতালপুরীতে পৌঁছান এবং 'লক্ষ সাপের শয্যায়' পাতালকন্যা মণিমালাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। মন্ত্রীপুত্র মণিমালার কপালে মণি ছোঁয়াতেই তিনি জেগে ওঠেন। রাজপুত্রের সঙ্গে মণিমালার বিয়ে হয়। তিনজনে সুখে থাকেন। একদিন মন্ত্রীপুত্র 'পঞ্চকটক দোলা-বাদ্য' সহযোগে পাতালকন্যাকে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশে রওনা দিলেন। তারপর মণিমালা একদিন মণি হাতে সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠে মুগ্ধ হয়ে যান, স্নানও সারেন। সেই সময় সেদেশের রাজপুত্র মণিমালাকে দেখে ফেলেন, আর দেখে কাঠকুড়ানি পেঁচোর মা এক বুড়ি। রাজপুত্র তো মণিমালার জন্য পাগল। রাজার ঘোষণা রাজপুত্রকে যে সুস্থ করবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেওয়া হবে। সেকথা শুনে পেঁচোর মা পবনের নায়ে উঠে মণিমালার দেশে যায় এবং মণিমালা মণি নিয়ে উঠে এলে তাকে ধরে রাজপুরীতে নিয়ে যায়। রাজপুত্র ভালো হন। মণিমালার সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মণিমালা একবছরের ব্রত নেন। পাতালপুরীতে 'নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের শয্যায় সাপের বিষের ঘোরে অচেতন হইয়া রহিলেন।' মন্ত্রীপুত্র পঞ্চকটক নিয়ে সরোবরের পাড়ে এসে কারো সাড়া শব্দ না পেয়ে

সেসব বনে রেখে পথে বেরোন, পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের সংবাদ শোনেন। মন্ত্রীপুত্র পেঁচো সেজে বুড়ির থেকে মণি উদ্ধার করে রাজপুরীতে গেলে অগত্যা রাজা পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেন। বাসরঘরে মন্ত্রীপুত্র পেঁচো রাজকন্যাকে সব খুলে বলেন এবং তাঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা পাতালপুরীতে ফেরেন। তারপর সকলে মিলে 'আপন দেশে চলিয়া গেলেন।'

- '**সোনার কাটী রূপার কাটী**'— এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রীপুত্র, এক সওদাগর পুত্র আর এক কোটাল পুত্রের ভারি ভাব। একদিন তাঁরা ঠিক করেন দেশে আর থাকবেন না, তাই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। চারজনে মস্ত এক বনের মধ্যে উপস্থিত হন, সকলে ক্ষুধার্ত। দূরে এক হরিণের মাথা পড়ে থাকতে দেখে সকলে আনন্দিত। কোটালপুত্র কাঠ কুড়োতে, সওদাগর পুত্র জল আনতে, মন্ত্রীপুত্র আগুনের চেষ্টায় যান। রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়েন। ফিরে এসে প্রত্যেকেই হরিণের মাথা কাটতে গেলে তার মধ্যে থেকে রাক্ষসী বেরিয়ে তিনজনকেই খেয়ে ফেলে। এবার পালা রাজপুত্রের। এক রাজ্য ছেড়ে রাজপুত্র আর এক রাজ্যে পৌঁছান, 'তবু রাক্ষসী পিছন ছাড়ে না।' নিরুপায় রাজপুত্র এক আমগাছকে দুফাঁক হওয়ার প্রার্থনা জানান এবং তার মধ্যে আশ্রয় নেন। রাক্ষসী গাছকে অনেক অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু কোন লাভ হয় না। ভয় দেখিয়েও গাছের থেকে সাড়া না পাওয়ায় সেই গাছেরই তলায় এক রূপসী মূর্তি ধরে কাঁদতে থাকে। সেই দেশের রাজা শিকারে বেরিয়ে সুন্দরী নারীকে দেখে রাজপুরীতে নিয়ে গিয়ে রানী করেন। রাজপুত্র হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ রাক্ষসী কিছুতেই ভুলতে পারে না। তাই 'হাড় মুড়্মুড়ীর ব্যারাম'-এর অছিলায় রাজাকে জানায় বনের সেই আমগাছ কেটে তার তক্তার ধোঁয়া দেওয়ার কথা। তখন রাজপুত্রের অনরোধে গাছ তাঁকে একটা আমের মধ্যে করে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। একটা রাঘববোয়াল তাঁকে গিলে ফেলে। ধরা পড়ার আগে বোয়াল রাজপুত্রকে শামুক করে দেয়। ফলে রানীর উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধিত হয় না। এক গৃহস্থের বউ শামুক ভেঙে ফেলায় রাজপুত্র বেরিয়ে আসেন এবং 'হাসনসখী' পাতিয়ে তার বাড়িতেই থেকে যান। রাক্ষসীরানী সব জানতে পেরে রাজাকে জানায় তার 'বাপের দেশ' থেকে 'হাসন চাঁপা নাটন কাটী, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' আনিয়ে দিলে তার অসুখ সারবে এবং 'অমুক গৃহস্থের বাড়ী'র রাজপুত্রই একমাত্র একাজ পারবেন। নিরুপায়

রাজপুত্র অনেক দিন ধরে পথ চলতে চলতে এক মস্ত পুরীতে পৌঁছে দেখেন এক রাজকন্যা শুয়ে আছেন। তাঁর শিয়রে রূপোর আর পায়ের দিকের কাঠি সোনার। রাজপুত্র কাঠির অবস্থান বদলে দিতেই রাজকন্যা উঠে রাজপুত্রকে বলেন পুরীটা এক রাক্ষসের। রাজপুত্র ভীত হন এবং নিজের বৃত্তান্ত রাজকন্যাকে খুলে বলেন। রাজকন্যাও জানান রাক্ষসেরা তাঁর পিতা, মাতা, রাজ-রাজত্ব সকলকে খেয়ে শুধু তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাইরে যাবার সময় রাক্ষসেরা সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দিয়ে তাঁকে মেরে রেখে যায়। রাক্ষসদের ফিরে আসার শব্দে রাজকন্যা পূর্ববৎ থাকেন আর রাজপুত্র লুকিয়ে পড়েন। পরের দিন রাজকন্যা আয়ি বুড়ি রাক্ষসীর কাছ থেকে সব রাক্ষসদের আর সেই রাক্ষসী-রানীর প্রাণ কোথায় আছে জেনে নেন। তারপর রাক্ষস-নিধনপালা সাঙ্গ করে রাজপুত্র রাজকন্যা ও 'কাটী, পাটি, চাঁপা, কাঁকুড়' সঙ্গে করে সেই রাজার দেশে ফেরেন। তারপর রাক্ষসীরানীর কাছ থেকে কোটাল, সওদাগর, মন্ত্রীবন্ধু, তাদের ঘোড়া সব উদ্ধার করে তাকে মেরে ফেলেন। তারপর সবাই নিজের দেশে ফেরেন।

- **'শিয়াল পণ্ডিত'**— এক ছিল শিয়াল পণ্ডিত, শঁটীর বনে তার ছিল মস্ত এক পাঠশালা। 'পড়ুয়াদের পড়ায়' 'শঁটীর বনে দিন-রাত হট্টগোল।' তাই দেখে এক কুমীর তার সাত ছেলেকে 'বিদ্যাগজ্‌গজ্‌' করার আশায় শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় হাতেখড়ি দেয়। শিয়াল কুমীরকে জানায় সাতদিনেই ছেলেরা পণ্ডিত হয়ে যাবে। পণ্ডিত মশাই এদিকে রোজ একটা করে কুমীর ছানা দিয়ে জলযোগ সারে। এভাবে ছয়দিন কেটে যায়। কুমীর ভাবছে ছেলেরা কতটা পণ্ডিত হয়েছে দেখে আসবে, তাই হাজির হয় শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায়। পণ্ডিতমশাই কুমীরের শেষ ছানাকে সাতবার দেখিয়ে কুমীরকে বলে তাদের পণ্ডিত হওয়ার এক দিন মাত্র বাকি। পরের দিন অবশিষ্ট ছানাটাকে দিয়ে জলযোগ সেরে সে পগার পার। কুমীরও শিয়ালকে ধরবে বলে তক্কে তক্কে থাকে। ক্ষিধের জ্বালায় থাকতে না পেরে শিয়াল নল খাগড়ার বনে গেলে কুমীর তার পা ধরে টানাটানি করে। শিয়াল বলে সেটা আসলে লাঠি। বোকা কুমীর তখন পণ্ডিতের পা ছেড়ে লাঠিটা ধরে। শিয়াল পালায়। অনেকদিন পর শিয়ালকে জব্দ করার জন্যে কুমীর মরার মত ভান করে খালের চড়ায় পড়ে থাকে। শিয়ালের সন্দেহ হয়। সে বলে মরার লক্ষণ হল—

কাণ নড়্‌বে পটাপট
লেজ পড়্‌বে চটাচট্‌

কুমীর সত্যি ভেবে তাই করে। শিয়াল আবার পালায়। অনেক দূরে এক বেগুন ক্ষেতে ঢুকে বেগুন খেতে গিয়ে ক্ষুধার্ত শিয়ালের নাকে কাঁটা ফুটে যায়। কাঁটা বের করার জন্য শিয়াল নাপিতের কাছে গেলে নাপিত তার নাক কেটে ফেলে। শিয়াল তখন নাকের বদলে নরুণ নিয়ে এক কুমোরের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় কুমোর তার নরুণটা নিয়ে দেখতে গিয়ে ভেঙে ফেলে। সে তখন নরুণের বদলে শিয়ালকে একটা হাঁড়ি দেয়। যেতে যেতে বরযাত্রীদলের সামনে পড়ে শিয়াল। তাদের বাজি শিয়ালের হাঁড়িতে পড়লে হাঁড়ি ফেটে যায়। ক্ষিপ্ত শিয়ালকে তার কনেটা দিয়ে বর বেচারা রেহাই পায়। শিয়াল এক ঢুলীর বাড়িতে গিয়ে সব ঢোল বায়না করে পুরুত বাড়িতে যায়। ওদিকে ঢুলীবউ কুট্‌নো কুটতে বসে। কনে ঝিমোতে ঝিমোতে বঁটির উপর পড়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। ফিরে এসে শিয়াল কনের বদলে ঢোল নিয়ে তবে ছাড়ে। ঢোল নিয়ে তালগাছে উঠে বাজাতে গিয়ে পা হড়কে শিয়াল পড়ে যায়।

- **'সুখু আর দুখু'**— এক তাঁতী, তার দুই বউ। দুই বউয়ের দুই মেয়ে— সুখু আর দুখু। তাঁতী বড় বউ আর সুখুকে বেশি ভালোবাসে, ফলে তারা আরাম করে। দুখু আর তার মায়ের খুব কষ্টে দিন কাটে। তাঁতী মরে গেলে বড় বউ তাঁতীর টাকা-পয়সা সব কিছু হাতিয়ে দুখুদের আলাদা করে দেয়। সুতো কেটে, গামছা বুনে, দুখুদের কোনরকমে দিন কাটতে থাকে। একদিন তুলো আগলে বসে থাকার সময় দম্‌কা বাতাস এসে তুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। দুখু কাঁদতে বসলে বাতাসের কথামত দুখু তার পিছু নেয়। যেতে যেতে দুখু এক গাইয়ের গোয়াল পরিষ্কার করে, খড় জল দেয়, এক কলাগাছের লতাপাতা ছিঁড়ে পরিষ্কার করে দেয়, সেওড়া গাছের গুঁড়ির বড় জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে সাফ করে, এক ঘোড়াকে চার গোছা ঘাস দেয়। তারপর বাতাসের সঙ্গে এক ধব্‌ধবে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। বাড়িটা আসলে চাঁদের মা বুড়ির। বুড়ির কাছে গিয়ে তার তুলো চাইতে বুড়ি দুখুকে আগে পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দিয়ে আসতে বলে। এক ডুবে দুখুর 'সৌন্দর্য উথলে পড়ে!', দুই ডুবে দুখুর গা ভরা গয়না। তারপর বুড়ির কাছ থেকে তুলোর পেঁটরা নিয়ে দুখু বাড়ির পথে রওনা দেয় এবং ঘোড়া তাকে এক তেজী পক্ষীরাজ বাচ্চা, সেওড়াগাছ এক ঘড়া মোহর, কলাগাছ একছড়া সোনার কলা, গাই এক 'কপিলা-লক্ষণ বক্‌না' উপহার দেয়। দুখু বাড়ি ফিরলে আনন্দে তার মা আত্মহারা হয়। রাত্রে পেঁটরা খুলতে দুখুর রাজপুত্র-বর বেরোন। দুখুদের সব দুঃখ ঘুচে যায়। অন্যদিকে দুখুর থেকে সব শুনে সুখু তুলো

নিয়ে বসে থাকে, বাতাস তার তুলোও উড়িয়ে নিলে সে বাতাসের পিছু নেয়। যাবার সময় সে গাই, কলাগাছ, সেওড়াগাছ, ঘোড়া কাউকে কোন সাহায্য করে না। চাঁদের বুড়ির বাড়িতে পৌঁছে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। অতি লোভে দুই ডুবের বদলে তিন ডুব দিয়ে ফেললে সুখু অতি কুৎসিত হয়ে যায়। তারপর একটা বড় দেখে পেঁটরা নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয়। ঘোড়া, সেওড়া গাছ সবাই সুখুর দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব দেয়। সুখুর কুশ্রীরূপ দেখে তার মা তো মূর্ছা যায়। রাত্রে বড় পেঁটরা থেকে বরের বদলে অজগর বেরিয়ে সুখুকে খেয়ে ফেলে। দুঃখে সুখুর মাও মরে যায়।

- **'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী'**— এক ছিলেন বোকা ব্রাহ্মণ আর তাঁর 'রণচণ্ডী' ব্রাহ্মণী। ঘরে চাল বাড়ন্ত অথচ ব্রাহ্মণ পিঠে খেতে চাইলে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণকে এক সন্ন্যাসী আশ্রয় দেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে 'হগড়ং ডগড়ং বগ বগ বগড়ম্' লেখাপড়া শেখেন। ব্রাহ্মণ এভাবে এক সময় নিজেকে ভারি পণ্ডিত হয়ে গেছেন মনে করে রাজার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণীকে একবার দেখতে যান। ব্রাহ্মণী তো ব্রাহ্মণকে বিরাট পণ্ডিত বলে মনে করে সকলকে সেকথা রাষ্ট্র করেন। মতি ধোপার গাধা হারালে বরাতজোরে ব্রাহ্মণ সে গাধাকে বাড়িতেই পেয়ে যান। কিন্তু সকলে ব্রাহ্মণকে আরো বড় পণ্ডিত বলে মনে করেন। ফলে রাজকন্যার হার চুরি যাওয়ায় রাজবাড়িতে ব্রাহ্মণের ডাক পড়ে। ব্রাহ্মণ জগদম্বাকে স্মরণ করেন। ওদিকে জগা মালিনী, যার নাম জগদম্বা সে জগদম্বা নাম-স্মরণ শুনতে পেয়ে মনে করে ব্রাহ্মণ তার হার চুরি ধরে ফেলেছেন। ফলে সে ব্রাহ্মণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্রাহ্মণ এ যাত্রায়ও উদ্ধার পেয়ে রাজপণ্ডিত হয়ে যান।

- **'দেড় আঙ্গুলে'**— এক ছিল কাঠুরিয়া আর তার কাঠুরিয়া বউ। ষষ্ঠীর বরে তাদের দেড়-আঙ্গুলে ছেলে। বাবার দুঃখ দেখে সে রাজার কাছে যায় কাঠুরিয়াকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু রাজা তার বদলে কড়ি চান। পথে দেখা ব্যাঙ রাজপুত্রের সঙ্গে। তার কথা শুনে দেড় আঙ্গুলে যায় আড়াই আঙ্গুলে কামারের কাছে কুড়ুল আনার জন্য যায়। দেড় আঙ্গুলে আড়াই আঙ্গুলের দাড়ির সঙ্গে নিজের টিকিটা বেঁধে ফেলে এবং আড়াই আঙ্গুলেকে তার সঙ্গে 'মিতালি' পাতাতে বলে। একথা শুনে আড়াই আঙ্গুলে রেগে গিয়ে তার কাছে কড়ি চায় এবং তার টিকি খুলতে খুলতে এক চুল ছিঁড়ে ফেলে। দেড় আঙ্গুলে রেগে যায় এবং কড়ি চায়। কামার কড়ির বদলে কুড়ুল

দিয়ে বাঁচে। কুড়ুল নিয়ে ভেরেণ্ডা গাছ কেটে লাউয়ের খোলসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ রাজপুত্রের কুণোরানীকে উদ্ধার করে। ব্যাঙ তার কানাকড়ি দেড় আঙ্গুলেকে দেয়, আর কুণোরানী তার থুথুটুকু দিয়ে কাণা রাজকন্যার চোখ ফোটাতে বলে। দেড় আঙ্গুলে রাজার কাছে গেলে রাজা কড়ি নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং বলেন সাত চোরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েদেবেন। দেড় আঙ্গুলের সঙ্গে সাত চোরের দেখা হয়। তারা পাটনীর কড়ি চুরি করলে রাজার কাছে তাদের নামে নালিশ করে দেড় আঙ্গুলে তাদের শূলে চড়ায়। এদিকে রাজার রাজ্য চোরে ভরে যায়। দেড় আঙ্গুলে কুণোরানীর কাছ থেকে পাওয়া সাতনলা আর লাউয়ের খোলসের সাহায্যে সব চোর চোরণীকে তাড়িয়ে দেয়। রাজামশাই 'বীরের চূড়া পিপ্পল কুমার' দেড় আঙ্গুলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেন। দেড় আঙ্গুলে রাজকন্যার চোখ আগেই ভাল করে দিয়েছে। দেড় আঙ্গুলে বাবা-মায়ের সঙ্গে সুখে থাকে, একবেলা রাজ্য শাসন করে আর একবেলা কাঠ কাটে।

চিরদিনের রূপকথা (১৯৪৭)-ও লোককথা। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো হল: 'রাজকন্যা', 'উমনো ঝুমনো', 'চাঁদের দেশ', 'কমল সায়র', 'মুকুট', 'চিরদিনের রূপকথা'। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র মতই *চিরদিনের রূপকথা*-তেও কয়েকটা ছড়া রয়েছে। যেমন— 'রূপ ও কথা', 'রাজকন্যা', 'শিউলি', 'চাঁদের দেশ', 'কমল সায়র', 'মুকুট', 'চিরদিনের রূপকথা'। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু:

- **'রাজকন্যা'**— এক রাজার সাত রানী। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মানিক, কিন্তু নেই কোন সন্তান। নীল সমুদ্রের নীল পাখী রানীদের চন্দন মাখতে বলে। একদিন জানা যায় ছোটরানী সন্তানসম্ভবা। কিন্তু রানীর এক কাঠের কন্যা হয়। রাজা দেশে দেশে দূত পাঠান যে রাজপুত্র কাঠের কন্যাকে জীবন দেবে সে রাজত্ব ও রাজকন্যা দুই-ই পাবে। কেউ আসে না। একদিন এক রাজপুত্র 'দশ দল যোগী জ্যোতিষী' ও ওষুধপত্র নিয়ে রাজপুরীতে আসেন। তাতে কাঠের পুতুল দুহাত উঁচু হয়, কিন্তু তিন বছর তেত্রিশ দিনেও কাঠের পুতুল হাঁ করে না। রাজপুত্র তারপর সব রাজা-রাজপুত্রকে জড়ো করে 'রাজকন্যা কিসে জীয়োবে, সন্ধান' চান। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। আবার এক লোকলশকর বিহীন রাজপুত্র দূতের মুখে শুনে কাঠকন্যাকে পাহারা দেন, আর বাঁশি বাজান। এভাবে পাঁচ বছরও কেটে যাওয়ার পর রাজপুত্র দেখেন রাজকন্যা ঘিয়ের পঞ্চদীপ নেভাচ্ছেন। রাজপুরীতে তখন আনন্দের জোয়ার।

- **‘উমনো ঝুমনো’**— উমনো ঝুমনো দুই ভাই-বোনের বাপ-মা কেউ না থাকায় সকলে দূর্ দূর্ করে। একদিন উমনো, দাদা ঝুমনোকে খুঁজে পায়না। গাছ গাছালি সকলকে জিজ্ঞাসা করে দাদার কথা, কিন্তু উত্তর মেলে না। বনে এক রাজপুত্র দেখেন ‘বনের ঘাস রাঙা, মাটী রাঙা, রক্তের বানে’। উমনোর পায়ের পাতায় লেগে তীরবেঁধা হরিণের বুকের রক্ত কালো হয়ে ওঠে। রাজপুত্র চেয়ে থাকেন, উমনোও। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করেন, ‘বনের কন্যা, না, কে তুমি?’ কোন উত্তর আসেনা। রাজপুত্র হঠাৎ দেখেন বনের কন্যা নেই। কাঠের বোঝা মাথায় কখন ঝুম্‌নো এসে দাঁড়ায়। ঝুমনো দেখে উমনো গাছ হয়ে গেল। যে পথে বনের মানুষ ছিল সেই পথে শিউলি ফুল ঝরে। এই দৃশ্য দেখে রাজপুত্রের চোখের পলক পড়ে না।

- **‘চাঁদের দেশ’**— এক রাজকন্যা ‘রোদ ঝল্‌মল্ দিনে ময়ূরপঙ্খীতে হাসেন’। ‘ফুলহাসন্ খাটে’ ঘুমোন আর তাঁর ‘পুতুলেরা ঘুমায় মণি-মাণিকের দোলায়’। রাজকন্যা ধীরে ধীরে চোখ মেলে ‘ঘুম ঝরণার পাহারা’র সঙ্গে কথা বলেন, শ্বেতপঙ্খী চড়ে শ্বেতরাজ্যে যান। কিন্তু রঙী পুতুল, সঙ্গী, ভঙ্গী, তরঙ্গী পুতুলদের সঙ্গে নিয়ে আসতে না পারায় রাজকন্যার মন খারাপ। তারপর রাজকন্যা চাঁদের দেশে পৌঁছান। ‘‘ঘুম পাহাড়ের তল, ঘুম ঝরণার জল ... সব ফুলপরীতে ছেয়ে আছে!” সেখানে রাজকন্যা দেখেন তাঁর সব পুতুল সেখানে হাজির। রাজকন্যা জেগে দেখেন ঝলমলে রোদ, ঘুমিয়ে পড়লে আবার চাঁদের দেশে। পরীরা রাজকন্যাকে বলেন তাঁরা দিনের বেলা পুতুল হয়ে খেলেন, আর ঘুমের মধ্যে চাঁদের পরী, ‘চাঁদের জ্যোছনা’ হয়ে ফিরে আসেন।

- **‘কমল সায়র’**— এক রাজপুত্র, তাঁর তিনটে পোষাপাখি— শুক, সারস আর ময়ূর। সারস আর ময়ূর সরোবরে স্নান আর মৃগয়ার সময় রাজপুত্রের সঙ্গে থাকে আর শুক তিন মাস পর পর রাজপুত্রের কাছে তিনটে কথা বলে: ‘রাজপুত্র! চলেছ, চল।’ একদিন ময়ূর ও সারস শুকের কথার অর্থোদ্ধার করে রাজপুত্রকে জানায়— কমল সায়রে এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁর ঘুম কখনো ভাঙে না। কেউ ভাঙাতে গেলে সে হীরে হয়ে থাকবে। রাজপুত্র কমল-সায়রের খোঁজে মন্ত্রীপুত্র, কোটাল পুত্র ও সওদাগর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। চলতে চলতে এক পাহাড়ের কোলের এক বনে রাতে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে সাপের কামড়ে সওদাগর পুত্র নীল, নেউলের কামড়ে কোটালপুত্র লাল, কাঁকড়ার কামড়ে মন্ত্রীপুত্র সাদা হয়ে

চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভেঙে রাজপুত্র তিন বন্ধুর পরিণতি দেখেন। তখন এক নীলপরী রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কমল সায়র, না বন্ধু কাকে চান? রাজপুত্র 'বন্ধু চাই' বলাতে নীলপরীর পাখার শেষ পালকটা ছুঁতে রাজপুত্র দেখেন তিনি সাপের সরোবরে পৌঁছে গেছেন। সরোবরের এক দ্বীপে তাঁর তিন বন্ধু আর চার ঘোড়া বন্দী। তরোয়াল খুলে রাজপুত্র সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়লে জল দুভাগ হয়ে দেখা যায় 'নেউলের রাজ্য', 'কর্কটের দেশ'। রাজপুত্র আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখেন কমল সরোবর, সেখানে ঘুমন্ত রাজকন্যা। আর বন্ধুরা ও ঘোড়াগুলো হয়ে গেছে সাতটা হাঁস। এরপর রাজপুত্র ফুলের বনে হীরে হয়ে থাকেন। সাত হাঁস কমলপাতায় রাজকন্যার হীরের কৌটোতে হীরেটা তুলে রাখে। অম্‌নি কমলসায়র দুলে ওঠে, রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে সরোবর 'অছিন্ অভিন্ বিরাট পুরী' হয়ে যায়। রাজকন্যা কৌটোর ঢাকনা খুলে কমলবরণ রাজপুত্রকে দেখতে পান।

- **'মুকুট'**— এক যে বহুকালের বট, কতদিনের কেউ জানে না। আর এক যে রাখাল বাঁশি বাজায় 'বসে' বটের 'শিকড়ে'। বনের পশুপাখি মোহিত হয়ে সে বাঁশি শোনে। আর এক যে রাজপুত্র, ভ্রমণে বেড়িয়ে সেই বটের তলায় বিশ্রাম নেন। তাঁর সৈন্যসামন্তের কলকোলাহলে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ বটগাছের ত্রিসীমানায় নেই। রাখাল এই অবস্থা দেখে তালসুপুরির পথে ফিরে যায় এবং 'পূব-দক্ষিণে উচর মাঠে' বাঁশি বাজায়। রাজপুত্র তার সৈন্যসামন্তকে 'কিসের সুর?' তার খোঁজ করতে পাঠান। কিন্তু বাঁশির আকুল করা সুর শুনে পাইক সিপাই শান্ত্রী কেউ ফেরেনা। শেষে সে বাঁশির সুরে মুগ্ধ রাজপুত্র রাখালকে বলেন, 'এই মুকুট তুমি নাও, সেই বাঁশি দাও আমাকে, বাঁশি শিখাও।' রাখাল বাঁশি দেয় রাজপুত্রকে এবং বলে এত কোলাহলে ডালে পাখি নেই, বাঁশি শোনারও কেউ নেই। 'তারা আগে আসুক'। রাজপুত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। আবার 'প'খ পাখী বটের ডালে, বটবুড়ো, হাসিখুশী নাড়ে জট।' আবার রাজপুত্র বটবৃক্ষের তলায় আসেন। তাঁর মুকুট রয়ে যায় রাজপুরীতে। এবার দুটো বাঁশির সুর শোনা যায়।

- **'চিরদিনের রূপকথা'**— এক বন। সেখানে 'শাল, পিয়াল, চন্দন-চাঁপার সারি', স্বচ্ছ সরোবর, মনোরম পরিবেশ, পরীরা সরোবরে স্নান করতে নামেন, চলেও যান। একমাত্র ছোট পরী সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে 'অচিন বনে' থেকে যান। দিন যায়। একদিন এক রাজা তাঁর

সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে আসেন। পরীর গান শুনে সৈন্যসামন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা অথর্ব বৃদ্ধ হয়ে যান। তাঁকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্যপাট বন্ধ হবার উপক্রম। রানী নেই, কেবল রাজপুত্র ও রাজকন্যা। তাঁরা দিনদিন শুকিয়ে যান, আর গোটা রাজ্যের মানুষ হয়ে যায় 'সব... থুর থুরে বুড়ো'। বছরে বছরে রাজ্যে যেন শত বছর, হাজার বছর নেমে আসে। একদিন এক কালো কাক রাজপুত্র রাজকন্যাকে বলে তাঁরা যদি উত্তর থেকে অক্ষয় ফুল আনতে পারেন তাহলে কেউ আর বুড়ো হবেন না। দক্ষিণ থেকে অক্ষয় মূল আনলে দেশে সব নতুন হবে, দেশ শতগুণে উজ্জ্বল হবে। আর কাকও হবে সাদা। রাজপুত্র রাজকন্যা যাত্রা শুরু করেন। এভাবে অনেক যুগ কেটে যায়। গাছপালা, মানুষ, পশুপাখি সবাই বুড়ো হয়ে যায়। উত্তরের শেষপ্রান্তে সুমেরু পাহাড়ে পৌঁছালে রাজপুত্র হয়ে যান সোনার বরণ। আবার চলা শুরু। এবার দক্ষিণের শেষপ্রান্তে কুমেরু পাহাড়ে পৌঁছালে রাজকন্যা পদ্মের রং পান। তারপর একদিন সুমেরুর নীচে রাজপুত্র সোনার ফুল পান, সেই ফুল তীরের আগায় গেঁথে ধনুকের ছিলায় টঙ্কার দিয়ে রাজপুত্র নিজের দেশে ছোঁড়েন। কুমেরু অন্ধকার। ধীরে ধীরে মেঘ সরে গিয়ে ঝড় বৃষ্টি থামতেই রূপোলি আলোর নীচে পাওয়া যায় সোনালি মূল। রাজকন্যা সেই মূল তীরের আগায় গেঁথে নিজের দেশে ছোঁড়েন। রাজ্য আবার আগের মত হয়ে যায়। রাজ্যে আর কেউ বুড়ো নেই। রাজা রাজপুত্র রাজকন্যাকে খোঁজেন। দিন, মাস, বছর গেলেও কেউ বুড়ো হয় না। শুধু কাক রয়ে যায় কালো। সে রাজপুত্র-রাজকন্যার অপেক্ষায় বসে থাকে।

<u>তুলনা ও প্রতিতুলনা</u> :

দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের তুলনা ও প্রতিতুলনা চলতে পারে। যেমন—

১. *ইতিহাসমালা— ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পের সঙ্গে উইলিয়াম কেরীর *ইতিহাসমালা*-র 'শৃগাল ও সপ্ত কুম্ভীর শিশু' গল্পের সাদৃশ্য আছে। শিয়াল পণ্ডিতের কাছে কুমীরের পুত্রেরা পড়তে যায়। শিয়াল কুমীরকে বলে— ‘‘কুমীর মশাই, দেখেন কি,— সাতদিন যাইতে-না-যাইতেই আপনার এক এক ছেলে বিদ্যাগজ্‌গজ্‌ ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিবে।” (*ঠাকুরমা'র ঝুলি*, ত্রিংশতি সংস্করণ, ২৯৪ পৃ.)। অন্যদিকে ‘‘হে কুম্ভীর, তোমার বালক সকল মূর্খ, অতএব আমার নিকটে পাঠ করিতে দেহ; আমার নাম শিবরাম পণ্ডিত; ছয় মাসের মধ্যেই পণ্ডিত করিয়া দিব।”[২৮] (*ইতিহাসমালা*) । শিয়াল এরপর কুমীর শিশুদের খেয়ে পালিয়ে যায়। তবে কিছুটা অমিলও রয়েছে দুটো গল্পের

মধ্যে। কেরীর গল্পে শিয়াল পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত রয়েছে, সে লোভে পড়ে কুমীর-শিশুদের তার কাছে পড়তে পাঠাতে বলে। দক্ষিণারঞ্জনের গল্পে পণ্ডিতের নাম নেই, কুমীর স্বেচ্ছায় তার কাছে যায়। শিশুদের মৃত্যুর পর কুমীর নানাভাবে শিয়ালকে নাকাল করতে চায় কিন্তু ব্যর্থ হয়। শিয়াল শেষ পর্যন্ত নিজের কারণে বিপর্যস্ত হয়। এই বিষয়গুলো কেরীর গল্পে অনুপস্থিত।

২. *Folktales of Bengal* (*বাংলার উপকথা*)— রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র *Folktales of Bengal* গ্রন্থের বেশ কয়েকটা গল্পের সঙ্গে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র সাদৃশ্য রয়েছে। 'Life's Secret' গল্প ও 'ডালিমকুমার' দুটো গল্পেই রাজপুত্রের নাম ডালিমকুমার। দুটো গল্পেই রাজপুত্রের প্রাণ কোথায় আছে জেনে সে খবর দুয়োরানী ও রাক্ষসী জেনে নেন।

'Phakir Chand' ও পাতাল-কন্যা মণিমালা গল্পদুটোর মিল আছে। দুটো গল্পেই রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র অজগরের মণি হস্তগত করে পাতালপুরীতে যান। পাতালকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়। মন্ত্রীপুত্র লোক-লস্কর আনতে যান। একদিন কন্যা জলের ওপরে এলে সেদেশের রাজপুত্র এক পলকের জন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেন— "Now here, now gone! Now here, now gone!"[২৯] *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে আছে "রাজপুত্র "হায় হায়" করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন"। এর পরের কাহিনিও এক। মন্ত্রীপুত্র কাঠকুড়ানি-বুড়ির পুত্রের রূপ ধরেন। নামটা আলাদা — ফকিরচাঁদ ও পেঁচো। রাজপুত্রের স্ত্রীকে উদ্ধার করে মন্ত্রীপুত্র পাতালে ফিরে যান। তারপর সকলে মিলে নিজেদের রাজ্যে ফেরেন। তবে দুটো গল্পে অমিলও রয়েছে। লালবিহারী দে-র গল্পে রয়েছে মন্ত্রীপুত্র হাতি, ঘোড়া, লোকজনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের পায়ে হেঁটে ফিরতে হয়। রাজ্যে ফেরার পর নানা কারণে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে অবিশ্বাস করেন, শেষ পর্যন্ত মা-কালীর দয়ায় সব সমস্যার সমাধান হয়। সকলে সুখে থাকেন। এই পরবর্তী অংশ *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে নেই।

'The Story of the Rakshasas' গল্পের সঙ্গে 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পের তুলনা চলে। দুই গল্পের বিষয়বস্তু এক। প্রথম গল্প সহস্রদল আর চম্পকদলের, দ্বিতীয়টা নীলকমল লালকমলের। তবে সহস্রদল-চম্পকদল ছিলেন ব্রাহ্মণপুত্র, নীলকমল লালকমল রাজপুত্র। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় স্ত্রী সহস্রদলের মা আসলে রাক্ষসী, সে ব্রাহ্মণ ও তার প্রথম স্ত্রীকে খেয়ে ফেলে। সহস্রদল চম্পকদল তখন পালান। অন্যদিকে রাজার মানুষ-রানী অর্থাৎ কুসুমের মাকে রাক্ষসী রানী চোখের দৃষ্টি দিয়ে রক্ত শুষে মেরে ফেলে। তারপর সে কুসুম আর নিজের পুত্র অজিতকে খেয়ে

ফেলে লোহা আর সোনার ডেলা উগরায় এবং সেগুলোকে বাঁশ-বনের তলায় পুঁতে ফেলে। পরের দিন ডিম ভেঙে নীলকমল-লালকমল সেই রাজ্য ছেড়ে চলে যান। এর পরবর্তী বিষয় এক। ঘরে কে জাগে— রাক্ষসীর প্রশ্নের উত্তরে সহস্রদল বলেন—

Sahasra Dal watcheth,
Champa Dal watcheth,
Two winged horses watch[৩০]

খোক্কসদের প্রশ্নে লালকমল বলে—

নীলকমলের আগে লালকমল জাগে
আর জাগে তরোয়াল,
দপ্ দপ্ ক'রে ঘিয়ের দীপ জাগে—
কা'র এসেছে কাল?

সহস্রদল রাক্ষসী আর নীলকমল খোক্কসদের নিধন করেন। বিতাড়িত চম্পকদল রাক্ষসদের দেশে যান, রাজকন্যা কেশবতীর সাহায্যে সাতশো রাক্ষস হত্যা করেন। নীলকমল লালকমল সব রাক্ষসদের সাবাড় করে শেষে রাক্ষসী রানীকে মেরে ফেলেন। রাজা অজিত কুসুমকে ফিরে পান। কিন্তু 'The Story of the Rakshasas' গল্পের এখানেই শেষ নয়। কেশবতীর সঙ্গে চম্পক দলের বিয়ে হয়। কেশবতী নদীর ধারে স্নান করতে গিয়ে ছদ্মবেশী রাক্ষসীর কবলে পড়েন। এগল্পের পরবর্তী অংশ 'Phakir Chand' অথবা 'পাতালকন্যা মণিমালা'র মত।

'The Story of Swet Basanta' গল্পের সঙ্গে 'শীত বসন্ত' গল্প তুলনীয়। শ্বেত-বসন্ত গল্পের শুরুটা আলাদা। বাকিটা প্রায় এক। সৎমার কাছ থেকে বিতাড়িত শ্বেত বসন্ত ও শীত বসন্ত বনের পথে চলতে চলতে আলাদা হয়ে যান। শ্বেত ও শীতের পরিণতি এক। "…sudden an elepehant, gorgeously caparisoned, shot across his path, and gently taking him up by his trunk, placed him on the rich howdah on its back."[৩১] "রাজপুত্রের কপালে রাজটিকা। দেখিয়া, শ্বেত রাজহাতী অমনি শুঁড় বাড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল।" ('শীত বসন্ত', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*) এরপর শ্বেত রানীর উদরের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা সূতাশঙ্খ সাপকে হত্যা করেন। এই অংশের সঙ্গে 'ডালিমকুমার' গল্পের রাজকন্যার নাকের থেকে

বের হওয়া সূতাশঙ্খ নিধনের প্রসঙ্গ তুলনীয়। সূতাশঙ্খের প্রসঙ্গ 'শীত বসন্ত' গল্পে নেই। তবে এরপর দুটো গল্পই আলাদা। গল্পের সমাপ্তিতে অবশ্য ভাইদের মিলন হয়।

'The Man who wished to be Perfect' গল্পের সঙ্গে 'ডালিকুমার' গল্পের পাশাখেলার প্রসঙ্গ তুলনীয়। পাশা খেলায় রাক্ষসীর কাছে বড় রাজপুত্র হেরে যান। ছোট রাজপুত্র পাশাখেলায় জিতে দাদাকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে পাশাবতীর পুরে সাত রাজপুত্রকে পাশা খেলায় হারিয়ে পাশাবতীরা সাত বোনে খেয়ে ফেলে। ডালিমকুমার পাশা খেলায় জিতে তাঁর ভাইদের ফিরিয়ে আনেন।

'The Boy with the Moon on his Forehead' গল্পের সঙ্গে 'কিরণমালা' ও 'সাত ভাই চম্পা' গল্পের মিল আছে। রাজা তাঁর ছয় রানীর চক্রান্তে ছোটরানীকে তাড়িয়ে দেন। অথচ ছোটরানী তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাঁদ কপালের কুমার আর দেবকন্যার জন্ম দেন। রাজা সেকথা জানতেও পারেননি। শিশু দুটো বড় হয়। রাজবাড়ির ধাইমা কৌশল করে কুমারকে রাক্ষসের দেশে পাঠায়। তারপর কুমার পুষ্পবতীর ঘুম ভাঙিয়ে রাক্ষসদের হত্যা করে ফিরে আসেন। পুষ্পবতী রাজাকে সব বৃত্তান্ত বলেন। রাজা ছয় রানীকে শাস্তি দেন। তারপর ছোটরানী, ছেলে-মেয়ে সকলকে নিয়ে সুখে থাকেন। রানীদের চক্রান্ত, ইচ্ছা করে বারবার শিকল নাড়া, তারপর রাজা এলে সন্তানের বদলে ইঁদুর আর কাঁকড়া দেখানো, রাজার ছোটরানীকে বিতাড়িত করা— এসবের সঙ্গে 'সাত ভাই চম্পা' গল্প প্রায় এক। তবে পরবর্তী অংশ 'কিরণমালা'র মত। তবে 'কিরণমালা' গল্পে রানীর সঙ্গে তাঁর দিদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। সন্তানের বদলে কুকুরছানা, বিড়ালছানা দেখায়। অরুণ, বরুণ, কিরণমালা বড় হন। এক্ষেত্রে মায়া-পাহাড়ে গিয়ে সোনার ফল, হীরার গাছ, ঝরণার জল, সোনার পাখি আনার বিষয়টা আলাদা। সোনার পাখি রাজাকে সব কাহিনি খুলে বলে। রাজা রানীকে ফিরিয়ে আনেন, দোষীদের শাস্তি দেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে রাজত্ব করেন।

'The Bald Wife' আর 'সুখু আর দুখু' একই রকম গল্প। প্রথমটা দুই বউ আর দ্বিতীয়টা দুই বোনের। টেকো বউ নিজের ইচ্ছায় বেড়িয়ে পড়েছিল। চলতে চলতে এক মুনির কাছে হাজির হয়। মুনি তাকে এক ডুব দিয়ে আসতে বলেন। ''When she got out of the water, what a change was seen in her! Her hed was full of jet black hair, which was so long that it touched her heels; her complexion had become perfectly fair; and she

looked young and beautiful."[৩২] মুনির কাছ থেকে মণি-মুক্তোভরা ঝুড়ি আনে। এবার সে সুখী হয়। অন্যদিকে দুখু তুলোর পেছনে দৌড়াতে গিয়ে চাঁদের মা বুড়ির কাছে পৌঁছায়। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে অপরূপ সুন্দরী হয়ে যায়। বুড়ি তাকে একটা পেঁটরা উপহার দেয়। 'রাত্রে পেঁটরা খুলিতেই দুখুর রাজপুত্র-বর বাহির হইল।' ওদিকে ছোট বউ আর সুখু অতি লোভ করতে গিয়ে কিছুই পায় না। সুখু তো মরেই যায়। কোন চিহ্ন দেখে, কেউ জীবিত কিনা বোঝা যায়— এই বৈশিষ্ট্য *Folk Tales of Bengal* ও *ঠাকুরমার ঝুলি*— দুটোতেই আছে। যেমন— 'The Story of the Rakshasas' গল্পে চম্পকদলের মা রাক্ষসীর মতলব বুঝতে পেরে একটা সোনার পাত্রে তার বুকের দুধ কিছুটা দিয়ে চম্পকদলকে বলেন দুধের রংটা লক্ষ রাখতে, ''see the milk get a little red, then conclude that your father has been killed; and should you see it grow still redder, then conclude that I am killed: when you see this, gallop away for your life as fast as your horse can carry you, for if you donot, you also will be devoured."[৩৩] 'কিরণমালা' গল্পে মায়া-পাহাড়ে যাওয়ার সময় অরুণ ও বরুণ তরোয়াল ও তীরধনুক দিয়ে কিরণমালাকে বলেন যদি তরোয়ালে মরচে পড়ে আর তীরের আগা খসে, ধনুকের ছিলা ছেঁড়ে তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা আর বেঁচে নেই।

৩. *ক্ষীরের পুতুল* ও *কনকলতা*— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পে এক বানরকে দুঃখিনী দুয়োরানী সন্তানস্নেহে পালন করেন। বানর তার দুয়ো-মাকে বলে, ''মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাতমহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব... সোনার চাঁদ ছেলে দেব তবে আমার নাম বাঁদর।"[৩৪] বাঁদর শেষপর্যন্ত তার মায়ের দুঃখ ঘোচায়। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*'র 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বানর রাজপুত্র বুদ্ধুও তার দুঃখিনী মা; ছোট রানীকে ঘুঁটে কুড়িয়ে, বনজঙ্গল থেকে নানারকম ফল এনে সাধ্যমত সাহায্য করে। শেষপর্যন্ত তার মাকে তার হৃত সম্মান ফিরিয়ে দেয়।

'কনকলতা' গল্পে 'সাত ভাইয়ের এক বোন কনকলতা'। আর 'সাতভাই চম্পা' গল্পের চম্পাও সাত ভাইয়ের এক বোন। এইটুকুই সাদৃশ্য।

৪. *টুনটুনির বই*— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *টুনটুনির বই* গ্রন্থের বেশ কয়েকটা গল্পের সঙ্গে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পের সাদৃশ্য আছে । উপেন্দ্রকিশোরের 'শিয়ালপণ্ডিত' তো একেবারে দক্ষিণারঞ্জনের 'শিয়াল পণ্ডিত'-এর মত। কুমীর তার ছানাদের দেখতে এলে ''শিয়াল

একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে, পাঁচবার পাঁচটাকে দেখাল, শেষেরটিকে দেখাল তিনবার। তাতেই কুমির খুশি হয়ে চলে গেল। তখন শিয়াল ঠিক আগের মতো করে আর একটা ছানাকে খেল। এমনি করে সে রোজ একটি ছানা খায়, আর কুমির এলে তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলায়।"[৩৫] আর 'পণ্ডিত মহাশয় পড়ান, রোজ একটি করিয়া কুমীরের ছানা দিয়া জল খান।' (*ঠাকুরমা'র ঝুলি*)। তারপর কুমীর ছানাদের সাবাড় করে শিয়াল পণ্ডিত পালায়। কুমীর অনেক চেষ্টা করেও শিয়ালের নাগাল পায় না। তবে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র শিয়াল শেষ পর্যন্ত রাখালের দলের হাতে কুমীরকে দিয়েছে। তারপর নাকের বদলে নরুণ পেয়েছে, তালগাছ থেকে পা ফস্কে পড়ে গেছে। এই শেষটা 'টুনটুনির বই'তে নেই। এছাড়াও 'বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে', 'বাঘের পালকি চড়া', 'বোকা বাঘ', 'বোকা কুমিরের কথা' এই গল্পগুলোও 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পের মতই। শুধু কুমীরের বদলে বাঘ নাকাল হয়েছে।

৫. *হিন্দুস্থানী উপকথা*— শান্তা দেবী সীতা দেবী অনূদিত *হিন্দুস্থানী উপকথা* গ্রন্থের কিছু কিছু গল্পের সঙ্গে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র গল্পগুলোর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'সাত রাজপুত্রের কথা' গল্পের সাত রাজপুত্রের মধ্যে ছোট রাজপুত্রের স্ত্রী এক বানরী। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে ছোট রাজপুত্র বুদ্ধু এক বানর। উভয়েই অন্যদের পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। উভয়েই মানুষের মত কথা বলতে পারে। বড় রাজপুত্রেরা ছোটকে হিংসা করেন। ফলে ছয় রাজপুত্র বানরীরূপী পরীরানীর চামড়াটা ছোটকুমারকে পুড়িয়ে ফেলতে বলেন। তিনি তাই করেন। এতে পরীরানীর শরীরের চারিদিকে আগুন জ্বলে যায়। তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে ছোট দুই রাজপুত্র ভুতুম্ আর বুদ্ধুর স্ত্রীরা তাদের ছাল পুড়িয়ে ফেলেন। তবে এতে তাঁদের ভালোই হয়। ছোট রাজপুত্র পরীরানীর খোঁজে বেরিয়ে শীর্ণ শরীরের একটা লোক, এক বাদ্যকার, এক রোগা বিবর্ণ যুবকের সাক্ষাৎ পান যারা প্রত্যেকেই পরীরানীকে একবার দেখে উন্মাদের মত উচ্চারণ করে— "একবার তোমায় দেখেছি, আর একবার দেখা দাও!"[৩৬] 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পে মণিমালাকে এক পলক দেখার জন্য ভিন্‌দেশী রাজপুত্রও 'হায় হায়' করেন।

'সাত সেকরার কথা' গল্পে সাত সেকরা বন্ধু, এক সামন্তের বাড়ি গয়না তৈরি করতে গেলে ছাগলী রাক্ষসী ছয় বন্ধুকে খেয়ে ফেলে। 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগর আর কোটাল পুত্রের মধ্যে রাজপুত্র ছাড়া বাকি তিনজনকে হরিণের মাথার ভেতরকার

রাক্ষসী খেয়ে নেয়। দুজনেই পালাতে যান, রাক্ষসী পিছু নেয়। তখন সপ্তম সেকরা একটা গাছ দেখতে পায় যার দেবতা শিব। সে গাছে উঠে শিবের কাছে প্রার্থনা জানায়—"হে বাবা ভূতনাথ মহাদেব, তুমি আমাকেএই ভয়ানক রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা কর।"[৩৭] রাজপুত্র এক আমগাছকে দেখে বলে— 'হে আমগাছ! যদি তুমি সত্যকালের বৃক্ষ হও, রাক্ষসীর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।' দুজনেই গাছের কাছে আশ্রয় পান। দুই রাক্ষসীই সুন্দরী নারীর মূর্তি ধরে। বনের মধ্যে এক রাজা ঐ সুন্দরী নারীকে বিয়ে করে রাজ্যে নিয়ে যান। ছাগলী রাক্ষসীকে বিয়ে করার পর রাজা তাঁর সাত রাণীকে তাড়িয়ে দেন। তাঁরা সবাই মিলে ছোটরানীর পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখেন। দুই রাক্ষসীই রাজপুত্রদের রাক্ষসের দেশে পাঠায়। দুজনেই জয়ী হন। রাক্ষসনিধনও সাঙ্গ হয়। যোগী বা সপ্তম সেকরা রাক্ষসদের দেশ থেকে আনা 'সঙ্গীতকারী জল' ছিটিয়ে বাকি বন্ধুদের বাঁচায়। অন্যদিকে 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পের রাক্ষসী রাজপুত্রের বন্ধুদের উগড়ে দেয়। তারপর দুটো গল্পেই রাজপুত্রেরা যথাক্রমে ময়ূর ও শুকের ঘাড় মটকে রাক্ষসীদের মেরে ফেলেন।

৬. *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*— আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত 'কাজলরেখা' পালার 'পাষাণময়ী কাজলরেখার চরিত্রের চিরসহিষ্ণুতা'র সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পের কাঞ্চনমালার সহজেই তুলনা চলে। কাজলরেখা বলেন—

কর্ম্মদোষে কাজল রেখা হইছিল বনবাসী।
কঙ্কণ দিয়া কিন্‌ল ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী।।[৩৮]
অথবা,

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্ম্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী।।[৩৯]

অন্যদিকে কাঞ্চনমালারও একই বক্তব্য—

হাতের কাঁকণ দিয়া কিনলাম দাসী।
সেই হইল রাণী, আমি হইলাম বাঁদী।

তবে কিছু অমিলও আছে। যেমন— কাঞ্চনমালা বিবাহিতা, তিনি সুঁচরাজার রানী। আর কাজলরেখা অবিবাহিতা। কাঞ্চনমালার স্বামী সুঁচরাজা তাঁর রাখালবন্ধুকে মন্ত্রী না করে তাঁকে ভুলে যাওয়ায় তাঁর

সর্বাঙ্গ সূঁচময় হয়ে গেছে। অন্যদিকে 'কাজলরেখা' গল্পে সূঁচরাজপুত্রের এরকম বন্ধুবিস্মৃতির প্রসঙ্গ নেই। কাঁকনমালার আচরণে সূঁচরাজার মনে কোন সন্দেহই হয়নি। অন্যদিকে 'কাঙ্কণ দাসী'কে সূঁচরাজা নকল বলে সন্দেহ করেছেন এবং নানান পরীক্ষা নিয়েছেন। রন্ধন, আলপনা দেওয়ার পরীক্ষা কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা দুজনেই দিয়েছেন। তবে কাজলরেখার 'চরিত্রের উপর অবিশ্বাস করা', তাঁকে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া, 'ধর্ম্মমতি' শুক পাখি কর্তৃক পরিচয় প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ কাঞ্চনমালা গল্পে অনুপস্থিত। যাই হোক দুটো গল্পেই শেষ পর্যন্ত কাঁকনদাসীরা কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে, সূঁচরাজারাও তাঁদের প্রকৃত রানীকে ফিরে পেয়েছেন।

৭. *Tales from Bangladesh* (*বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত গল্প*)— বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশ্রাফ সিদ্দিকীর *Tales from Bangladesh* গ্রন্থের বেশ কয়েকটা গল্পের সঙ্গে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র গল্পগুলোর সাদৃশ্য বর্তমান। যেমন— 'The Tree with the Golden Branches' গল্পে দুয়োরানীর খোঁড়া পুত্র পিতার অন্ধত্ব নিবারণে সোনালী গাছ আনতে যাচ্ছেন, 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পের কাঠুরিয়ার দেড় আঙ্গুলে পুত্র যেমন পিতার মুক্তির জন্য রাজার কাছে গিয়েছিল। দুজনেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জয়লাভ করে। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের পেঁচা ও বানর রাজপুত্রও জয়ী হয়েছিল। খোঁড়া রাজপুত্র রাক্ষসের দেশে পৌঁছান, সেখানে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে দেখেন। রাজপুত্র রূপোর কাঠি পায়ের দিকে এবং মাথার দিকে সোনার কাঠি রাখায় ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে ওঠেন। রাজপুত্রকে রাক্ষসদের দেশ থেকে পালাতে বলেন। কিন্তু রাজপুত্র রাজি হন না। তখন রাজকন্যা রাক্ষসদের প্রাণ কোথায় আছে জানার জন্য বুড়ি রাক্ষসীকে বলেন— ''You are now very old, and will die soon, and when you are dead, the other Rakshasas will kil me, and eat me."[৪০] রাজকন্যা রাক্ষসদের প্রাণ কোথায় জেনে নেন, খোঁড়া রাজপুত্র তারপর রাক্ষসদের হত্যা করেন। দক্ষিণারঞ্জনের 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পের রাজপুত্র এই গল্পের মত একইভাবে রাজকন্যার ঘুম ভাঙান। রাজকন্যা জানান যে তিনি রাক্ষসদের দেশে এসে পড়েছেন। রাজকন্যাকে রাজপুত্র শিখিয়ে দেন বুড়ি রাক্ষসীর কাছ থেকে রাক্ষসদের মরণ কিসে আছে জেনে নিতে। রাজকন্যা বুড়িকে বলেন— ''কাঁদি আয়ীমা, কবে বা তুই মরিয়া যাইবি, আর সকল রাক্ষসে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।" ('সোনার কাটী রূপার কাটী')। এরপর রাজকন্যার কাছ থেকে রাক্ষসদের মরণের উপায় শুনে রাজপুত্র সব রাক্ষসদের ধ্বংস করেন।

'The Queen who was a Rakshasa' গল্পের সঙ্গে 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পটা মেলে। দুই গল্পেই রাজা এক সুন্দরী নারীকে বিয়ে করেন যে আসলে রাক্ষসী। 'The Queen who was a Rakshasa' গল্পে রাক্ষসী, রাজার প্রথম রানীকে বনে পাঠায়। তারপর প্রথম রানীর পুত্রকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে হাড়মুড়্মুড়ির ব্যারামের ভান করে। আর রাজাকে বলে, "None of these doctors can cure me, but if you can procure me some foam from the sea, I shall be well."[৪১] রানী যথারীতি রাজপুত্রকেই পাঠায় এবং এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় রাজপুত্র মাছরাঙা হয়ে সমুদ্রের ফেনা নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন। রাক্ষসী আবার অসুস্থ হয় এবং রাজাকে বলে, "In the island of Ceylon there is a kind of rice which ripens the same day that it is sown, and can be boiled the same day; if I could obtain some of it, my pain would be cured."[৪২] রাজপুত্র আবারও সন্ন্যাসীর সাহায্যে তোতা পাখির রূপে ঠোঁটে করে সেই চাল নিয়ে আসেন। রাক্ষসীর উদ্দেশ্য সফল হয় না, ফলে রাক্ষসদের দেশে পাঠায়। রাজপুত্র সব রাক্ষস নিধন করেন, তখন রাক্ষসী রানীও মরে যায়। 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পের রাক্ষসী রানী অন্য দেশের রাজপুত্রকে খাওয়ার চেষ্টা করে, পারে না। রাজপুত্র এক আম গাছের মধ্যে আশ্রয় নেন। হাড় মুড়্মুড়ির ব্যারামের ভাণ করে রাক্ষসী রাজাকে বলে, "ওষুধে তো কিছু হইবে না বনের সেই আমগাছ কাটিয়া তাহার তক্তার ধোঁয়া ঘরে দিলে তবে আমার ব্যারাম সারিবে।" ('সোনার কাটী রূপার কাটী') কিন্তু রাজপুত্রের প্রার্থনায় গাছ তাঁকে একটা আমের মধ্যে করে পুকুরের জলে ফেলে, সেই পুকুরের রাঘব বোয়াল সেটা গেলে, বোয়াল তাঁকে শামুক করে দেয়, এক গৃহস্থের বৌ শামুক ভেঙে ফেলে। রাজপুত্র সেই বাড়িতে থেকে যান। কিছুতেই রাক্ষসীর স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় সে রাজাকে বলে— "আমার অসুখ তো আর কিছুতেই সারিবে না, আমার বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাটী, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, আর বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আছে, সেইগুলি আনাইলে আমার অসুখ সারিবে।" ফলে আবার রাজপুত্রকে পাঠানো হয়। এর পরের কাহিনি একই। রাক্ষসী রানীই মারা পড়ে।

'The Jackle and the Crocodile' গল্পের শিয়াল, অনেকটা *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পের মত কুমীরকে বোকা বানায় ।

আবার বাইরের কোন বস্তুকে লক্ষ করে জীবিত বা মৃতাবস্থার সংবাদ পাওয়া রূপকথার সাধারণ লক্ষণ। 'The Tree with the Golden Branches' গল্পে খোঁড়া রাজপুত্র একটা গাছকে উদ্দেশ্য করে মাকে বলেন, ''Mother, take care of this plant, and look at it everyday, and when you see that it is fading, you will know that some misfortune has befallen me, and when it is dead, I shall be dead too, and if it be flourishing you will be sure that I am well.''[৪৩] 'কিরণমালা' গল্পে কিরণমালাও বাইরের চিহ্ন অর্থাৎ তরোয়াল বা ধনুকের ছিলা দেখে তাঁর ভাইরা বেঁচে আছেন কিনা বুঝতে পারেন।

প্রতিতুলনা :

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহে জন্মেছিলেন। তাঁর সঙ্কলিত উপকথাগুলো তিনি ময়মনসিংহ জেলা থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও শৈশব থেকে পিসিমার কাছে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলে থাকতেন। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পটা দক্ষিণারঞ্জন টাঙ্গাইলের এক শতবর্ষীয়া বৌদ্ধ বৃদ্ধার কাছ থেকে ১৮৯৯ সালের শেষ দিকে সংগ্রহ করেন। তাঁর সংকলিত-সংগৃহীত লোকসাহিত্যের উৎসও ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল। দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরও বিশাল গীতিকা সাহিত্যের উৎসস্থল ময়মনসিংহ। তাঁর বড় সাহিত্য কীর্তি *মৈমনসিংহগীতিকা* (১৯২৩) এবং *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (৩ খণ্ড, ১৯২৬)-র উৎস পূর্ববঙ্গ। পল্লীবাংলার গ্রামীণ জীবন ও সমাজকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরলেন। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, *ঠাকুরদার ঝুলি*, *ঠা'ণদিদির থলে*, উপেন্দ্রকিশোরের *টুনটুনির বই* আজও শিশুমনকে কল্পনার আনন্দে, রঙে, উন্মাদনায় ভরিয়ে চলেছে। লক্ষণীয়, সব রচনার উপাদানই ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের লোকসাহিত্যে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক রূপটাকে ধরে রাখতে পারেননি, সর্বসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্য ভাষাকে পরিমার্জন করেছেন অথচ লোককথার প্রাণশক্তিকে রক্ষা করতে পেরেছেন। আশ্রাফ সিদ্দিকী তো গ্রন্থনামেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর সংগৃহীত গল্পগুলো বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গের। এঁরা তাঁদের 'কথা'য় 'পোয়েটিক জাস্টিস' বা 'শাস্ত্রিক বিধান' প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের হৃত সম্পদ-গৌরব পুনরুদ্ধারের সযত্ন প্রয়াস করেছিলেন এটাই গর্বের বিষয়। বিষয়গত সাদৃশ্য ছাড়া ভাষাগত সাদৃশ্যও আছে। যেমন—

- ‘‘...‘‘কোথায় বা আমার ঠ্যাং, কোথায় বা লাঠি। ধরুন ধরুন, লাঠিটা ছাড়িয়া ঠ্যাংটাই ধরিতেন!’’ কুমীর ভাবিল,—‘‘অ্যাঁ,— লাঠি ধরিয়াছি?’’— ধর্ ধর্! — ঠ্যাং ছাড়িয়া কুমীর লাঠিতে কামড় দিল।’’ (‘শিয়াল পণ্ডিত, *ঠাকুরমা’র ঝুলি*)

- ‘‘...‘শিয়ালনী, শিয়ালনী, আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে! লাঠিটা বা নিয়েই যায়!’ একথা শুনে কুমির ভাবলে, ‘তাই তো, পা ধরতে গিয়ে লাঠি ধরে ফেলেছি! শিগগির লাঠি ছেড়ে পা ধরি।’...’’ [৪৪] (‘শিয়াল পণ্ডিত’, *টুনটুনির বই*)

দুটো ভাষাতেই মৌখিক রীতির বৈশিষ্ট্য, লিখিত ভাষাকে গল্পকথনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রয়েছে।

আবার, ‘কান নড়্‌বে পটাপট

লেজ পড়্‌বে চটাচট্’ (*ঠাকুরমা’র ঝুলি*)

এবং ‘‘পড় তো বাপু— কানাখানা গানা ঘানা, কেমন লাগে কুমির ছানা?’’[৪৫] (*টুনটুনির বই*)

—এখানে গল্পের মধ্যে ছড়া ব্যবহার, সহজবোধ্য ভাষা প্রয়োগ দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এই সাদৃশ্য দীনেশচন্দ্র সেনের *পূর্ববঙ্গগীতিকা*-র ‘কাজলরেখা’র কাহিনির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র ‘কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা’ গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন—

- কর্ম্মদোষে কাজলরেখা হইছিল বনবাসী
  কঙ্কণ দিয়া কিন্‌ল ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী।। (*পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, পৃ. ৩০৯)

  রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
  কর্ম্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী। (তদেব, পৃ. ৩১১)

ঠাকুরমা’র ঝুলি-তে—

- হাতের কাঁকণ দিয়া কিনলাম দাসী।
  সেই হইল রাণী, আমি হইলাম বাঁদী।
  কি বা পাপে সোণার রাজার রাজ্য গেল ছার
  কি বা পাপে ভাঙ্গিল কপাল কাঞ্চনমালার? (ঠাকুরমা’র ঝুলি, পৃ. ৭২-৭৩)

ভাব, ভাষা, নীতি - সব দিক থেকেই পূর্ববঙ্গীয় লোক-রচয়িতারা কিছুটা যেন এক সূত্রে আবদ্ধ।

<u>লোকসাংস্কৃতিক উপাদান বিন্যাস</u> :

১. টাইপ (Type) ও মোটিফ (Motif): টাইপ ও মোটিফ সম্পর্কে পূর্বে সামান্য আলোচনা হয়েছে। "Any tale, no matter how complex or how simple it is, told as an independent narrative is considered to be a type."[৪৬] সামাজিক বিন্যাস দ্বারা এই টাইপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে মোটিফ হল লোককথার ছোট ছোট কাহিনি অংশ। "A motif may also be essentially a short and simple story in itself, an occurrence that is sufficiently striking or amusing to appeal to an audience of listeners."[৪৭] দেখা যাক্ *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে কী ধরনের টাইপ ও মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে:

ক. '<u>কলাবতী রাজকন্যা</u>'

টাইপ— পশু ও পাখী হল বর (বুদ্ধু ও ভূতুম্)

মোটিফ— কথা বলা বানর, পেঁচা, শুকপাখি, বানর ও পেঁচা থেকে মানুষের রূপে পরিবর্তন, কনিষ্ঠদের জয়লাভ, সন্ন্যাসীর ওযুধে সন্তানবতী হওয়া ইত্যাদি।

খ. '<u>ঘুমন্ত পুরী</u>'

টাইপ— ঘুমন্ত রাজকন্যা

মোটিফ— সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জাদুঘুমের থেকে জেগে ওঠা, সোনার পদ্মফুল, জাদু কাঠির ছোঁয়ায় অন্ধত্ব নিবারণ ইত্যাদি।

গ. '<u>কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা</u>'

টাইপ— রানীর দাসত্ব থেকে মুক্তি

মোটিফ— প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, নকল রানী, পাপের শাস্তি ইত্যাদি।

ঘ. '<u>সাত ভাই চম্পা</u>'

টাইপ— সাত ভাইয়ের এক বোন চম্পা

মোটিফ— মানুষ থেকে ফুলে পরিবর্তিত হওয়া, কথা বলা ফুল, কেবল পিতা-মাতার গাছ থেকে ফুল তোলার অধিকার, বিশ্বাসঘাতিনী সতীন, মানুষের পেটে ইঁদুর-কাঁকড়া জন্মানোর সংবাদ ও তাতে রাজার বিশ্বাস ইত্যাদি।

ঙ. '<u>শীত বসন্ত</u>'

টাইপ— অলৌকিক পাখির মন

মোটিফ— মানুষ থেকে শুকপাখি হয়ে যাওয়া, কথা বলা শুকপাখি, দেবহস্তী, মন্ত্রপূত বড়ি খুলে নিলে জাদুমুক্তি, সোনালী মাছ, দুয়োরানীর সন্তানের নায়কত্ব, পুনরায় মিলন ইত্যাদি

চ. '<u>কিরণমালা</u>'

টাইপ— আদরের তিন পুত্র-কন্যা

মোটিফ— রাজার ছদ্মবেশ, বিভিন্ন বস্তুকে জন্ম দেওয়ার জন্য অপবাদ, সোনার ফল, হীরের গাছ, মন্ত্রপূত জল, তার ছোঁয়ায় রূপ পরিবর্তন, নিষেধাজ্ঞা — পেছন ফিরে তাকানো, কথাবলা জ্ঞানী পাখি, বিজয়িনী কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদি।

''...'কিরণমালা' রূপকথায় ১৫টি মোটিফ রয়েছে, যা বিশ্ব-রূপকথার ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়।''[৪৮]

ছ. '<u>নীলকমল আর লালকমল</u>'

টাইপ— সাহসী, শক্তিমান ও বুদ্ধিমান দুই ভাই

মোটিফ— রাক্ষসীর নারী- রূপ ধারণ, রক্তচোষা রাক্ষসী, থুথুর বদলে গরম ঘি, জিভের বদলে তরোয়াল, জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি, ভোমরার মধ্যে রাক্ষসদের প্রাণ, রাক্ষস বংশ নির্বংশ ইত্যাদি।

জ. '<u>ডালিমকুমার</u>'

টাইপ— বুদ্ধিমান বড় ভাই

মোটিফ— পাশা ও ডালিমের বীজে প্রাণ, রাজকন্যার পেটে সূতাশঙ্খ সাপ, পাটহাতি মনোনীত রাজকুমারের সিংহাসনে আরোহণ, পাশা খেলায় জিতে ভাইদের উদ্ধার ইত্যাদি।

ঝ. '<u>পাতাল-কন্যা মণিমালা</u>'

টাইপ— বিশ্বাসী বন্ধু

মোটিফ— সাপের মাথার মণি, তার আশ্চর্য ক্ষমতা, জলের নীচে প্রাসাদ, আশ্রয়দাত্রীর পুত্রের ছদ্মবেশ নিয়ে মণি চুরি, নায়কের স্ত্রীকে নায়কের বিশ্বাসী বন্ধুর দ্বারা উদ্ধার ইত্যাদি।

ঞ. ‘সোনার কাটী রূপার কাটী’

টাইপ— চার অন্তরঙ্গ বন্ধু

মোটিফ— হরিণের মাথা থেকে রাক্ষসী বেরোয়, রাক্ষসীর সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ, হাড় মুড়্‌মুড়ির ব্যারাম, গাছ ও বিভিন্ন প্রাণীর কাছে আশ্রয়, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি আনতে রাক্ষসের দেশে যাত্রা, বহিরঙ্গে রাক্ষসের প্রাণ ইত্যাদি।

ট. ‘শিয়াল পণ্ডিত’

টাইপ— নাককাটা শিয়াল

মোটিফ— বুদ্ধিমান পশু, পশুর বিয়ে, বোকামির দ্বারা কনে লাভ, কনের বদলে ঢোল, কুমীরের বাচ্চাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ শিয়ালের, শিয়াল তাদের খেয়ে ফেলে ইত্যাদি।

ঠ. ‘সুখু আর দুখু’

টাইপ— চরকা-কাটা চাঁদের বুড়ি

মোটিফ— কথাবলা পশু, উপকারী গরু, ঘোড়া ও গাছ, স্নানের মাধ্যমে কুরূপা হয় সুরূপা, সোনার ফল, পশুদের উপকার ও গাছকে সাহায্য, চাঁদের বুড়ি চরকা-কাটে, কামধেনু, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাজপুত্রের সঙ্গে অত্যন্ত-সাধারণ নায়িকারবিবাহ।

ড. ‘ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী’

টাইপ— সবজান্তা ভাব

মোটিফ— বোকা ব্রাহ্মণ, নিন্দুক স্ত্রী, স্বামী কিভাবে পিঠের সংখ্যা জানল? অলৌকিক ক্ষমতা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া।

ঢ. ‘দেড় আঙ্গুলে’

টাইপ— বুড়ো আঙুলের সমান নায়ক

মোটিফ— দেবতার স্বপ্নাদেশ, নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন, পশু মানুষের উপকার করে, ব্যাঙ-রাজপুত্র, দীন দরিদ্র নায়ক, থুথুর দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ, বামনাকৃতি, অতি-সাধারণ নায়কের রাজকন্যাকে বিবাহ ইত্যাদি।

চিরদিনের রূপকথা-র গল্পগুলোতে ব্যবহৃত টাইপ ও মোটিফগুলো হল—

ক. ‘রাজকন্যা’

টাইপ— কাঠের রাজকন্যা

মোটিফ— নীল সমুদ্রের নীল পাখি রানীদের চন্দন মাখতে বলে, তিন বছর তেত্রিশ দিনেও কাঠের কন্যা হাঁ করে না, পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপ নেভানো ইত্যাদি।

খ. ‘উমনো ঝুমনো’

টাইপ— ভাইয়ের খোঁজে বোন

মোটিফ— পিতৃমাতৃহীন নায়িকা, সকলের নির্দয় ব্যবহার, মানুষ থেকে ফুলে রূপ পরিবর্তন।

গ. ‘চাঁদের দেশ’

টাইপ— চাঁদের দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যা

মোটিফ— ফুলহাস্‌ন খাট, রঙী সঙ্গী ভঙ্গী তরঙ্গী পুতুলের দল, চাঁদের দেশ, ঘুম পাহাড়ের তলা, ঘুম ঝরনার জল, চাঁদের পরী, চাঁদের জ্যোছনা ইত্যাদি।

ঘ. ‘কমল সায়র’

টাইপ— রাজপুত্র ও তাঁর তিন পোষাপাখি

মোটিফ— শুক, সারস, ময়ূরের সাহায্য, তিন মাস পর পর শুকের তিনটে কথা, রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে গেলে হীরে হয়ে থাকা, কমল সায়রের খোঁজে চার বন্ধুর যাত্রা, নেউলের রাজ্য, কর্কটের দেশ, সাপের সরোবর, ঘুমন্ত রাজকন্যা, রাজপুত্র ফুলের বনে ইত্যাদি।

ঙ. '<u>মুকুট</u>'

টাইপ— রাখালের কাছে রাজপুত্রের বাঁশি শেখা

মোটিফ— রাখালের বাঁশিতে বনের পশুপাখির মোহিত হয়ে যাওয়া, রাজপুত্রের ভ্রমণ, রাখালের বাঁশি শুনে মুগ্ধ, মুকুট রয়ে যায় রাজপুরীতে, দুটো বাঁশির সুর শোনা যায় ইত্যাদি।

চ. '<u>চিরদিনের রূপকথা</u>'

টাইপ— ছোটপরীর অচিন বনে থেকে যাওয়া

মোটিফ— সরোবরে পরীদের স্নান, ছোট পরী, পরীর গানে রাজার অথর্ব বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া, রাজ্যের সকলে বৃদ্ধ, কালো কাক, দক্ষিণ থেকে অক্ষয় মূল আনার জন্য রাজপুত্র-রাজকন্যার যাত্রা, সুমেরু ও কুমেরু পাহাড়, সোনালী মূল ইত্যাদি।

যেকোন 'কথা'র মোটিফ সম্পর্কে বলা যায়, ''It is these simple elements which can form a common basis for a systematic arrangement of the whole body of traditional literature."[৪৯]

২. ছড়া/ প্রবাদ/ লৌকিক অভিব্যক্তি:

ঠাকুরমা'র ঝুলি গ্রন্থের শুরুতে, শেষে, গল্পগুলোর মাঝে বিবিধ উদ্দেশ্যে বহু ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— দুধের সাগর, রূপ-তরাসী, চ্যাং-ব্যাং— *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটার শুরুতে ছড়া রয়েছে—

শুকপঙ্খী নায়ে চড়ে' কোন্ কন্যা এল,
পাল তুলে' পাঁচ ময়ূরপঙ্খী কোথায় ডুবে' গেল,
পাঁচ রাণী পাঁচ রাজার ছেলের শেষে হ'ল কি,
কেমন দু'ভাই বুদ্ধু, ভুতুম, বানর পেঁচাটি! ('কলাবতী রাজকন্যা')

রূপ দেখ্‌তে তরাস লাগে, বল্‌তে করে ভয়,
কেমন করে' রাক্ষসীরা মানুষ হয়ে' রয়!

চ—প্ চ—প্ চিবিয়ে খেলে আপন পেটের ছেলে,
সোনার ডিম লোহার ডিম কৃষাণ কোথায় পেলে—
কেমন করে' ধ্বংস হ'ল খোক্কসের পাল—
কেমন করে' উঠ্‌ল কেঁপে নেঙ্গা তরোয়াল! ('নীলকমল আর লালকমল')

পড়ুয়াদের পড়ায় কোথায় কাঁপে শ'টীর বন,
সাতটী ছেলে কুমীর দিল করে' সমর্পণ?
তালগাছেতে ড্যাডাং ড্যাডাং কোথায় হ'ল— বাঃ! ('শিয়াল পণ্ডিত)

ছড়ার মাধ্যমে গল্পটা সূত্রাকারে বলে দেওয়া হচ্ছে। এখানে তো প্রত্যেকটা গল্পের কাহিনি অংশ সংক্ষেপিত হয়েছে, আর *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'উৎসর্গ' অংশে এই গ্রন্থের প্রত্যেক বিভাগের সূত্র উল্লেখিত হয়েছে। যেমন—

হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে!' ('দুধের সাগর')

হাঁ—উ মাঁ—উ' কাঁ—উ' শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর—
না জানি সে কোন্ দেশে— না জানি কোন্ দূর! ('রূপ-তরাসী')

নূতন বৌ! হাঁড়ি ঢাক, শেয়াল পণ্ডিত ডাকে;—
চিঁ চিঁ চিঁ কিচির মিচির ঝুলির ভিতর থাকে। ('চ্যাং-ব্যাং')

চিরদিনের রূপকথা-র গল্পগুলোতেও ছড়ার মাধ্যমে কাহিনি সূত্রাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

হেসে কবে হয় কে যে, কাঠের পুতুল?
কি করে যায় ভেঙে শেষে সে কথাটার ভুল?
.. ..
কোন্‌খানে কোথা থাকে মরণের দেশ?
কা'রা আনে জাগরণ, গিয়ে অবশেষ? ('রাজকন্যা', রূপ ও কথা)

ছল্ ছল্ কল্ কল্

রাজার দেশের পাশেই হাসে রূপনদীটির জল!

তারি তীরে নেচে ফিরে

ঘন ছায়ার

রাশি!

নেমে আসে রাজার মুকুট,

বাজে

বাঁশের

বাঁশী! (‘মুকুট’)

ছড়ার মাধ্যমে কখনো কখনো প্রশ্ন-উত্তর চলতে থাকে। যেমন— রূপবতী রাজকন্যা সোনার টিয়াকে তার অলঙ্করণ-প্রসাধনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সোনার টিয়া তার যথাযথ উত্তর দেয়—

রাজকন্যা— “সোণার টিয়া, বল্‌তো আমার আর কি চাই?”

টিয়া— “সাজতো ভাল কন্যা, যদি সোণার নূপুর পাই!”

রাজকন্যা— “সোণার টিয়া, বল্‌তো আমার আর কি চাই?”

টিয়া— “সাজতো ভাল কন্যা, যদি ময়ূর পেখম পাই!”

ময়ূরপেখম শাড়ি পরলে টিয়া মুখ ভার করে রাজকন্যাকে বলে—

“রাজকন্যা, রাজকন্যা, কিসের গরব কর;—

শতেক নহর হীরার হার গলায় না পর!” (‘শীত বসন্ত’)

এই যে প্রশ্নোত্তর পর্ব — এ আসলে ছড়া তথা লোককথার মৌখিক পরম্পরা বা ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

ছড়া কখনো কখনো গল্পের সঙ্গে জুড়ে যায়। রূপোর গাছ, সোনার পাখি, মুক্তো-ঝরার জল কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী উত্তর দেন—

“উত্তর পূব, পূবের উত্তর

মায়া-পাহাড় আছে,

নিত্য ফলে সোণার ফল

সত্যি হীরার গাছে।

ঝর্-ঝরিয়ে মুক্তা-ঝরা

শীতল ব'য়ে যায়,

সোণার পাখী ব'সে আছে

বৃক্ষের শাখায়!' " ('কিরণমালা')

ছড়া গল্পেরই অংশ হয়ে গেছে।

ছড়া আবার গল্পের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত করে। কলাবতী রাজকন্যা যখন স্বামীর ব্যাপারে হতাশ হয়ে সোনার শুককে বলছিল—

"সোণার পাখী, ওরে শুক, মিছাই গেল

রূপার বৈঠা হীরার হা'ল— কেউ না এল।"

বুদ্ধু তখন রাজকন্যার খোঁপা থেকে মোতির ফুল তুলে নিলে শুক বলে—

"কুঁচ-বরণ কন্যা মেঘ-বরণ চুল,

কি হইল কন্যা, মোতির ফুল?"

রাজকন্যা খোঁপায় হাত দিয়ে ফুল দেখতে না পেলে শুক বলে—

"কলাবতী রাজকন্যা, চি'ন্ত না'ক আর,

মাথা তুলে' চেয়ে দেখ, বর তোমার!" ('কলাবতী রাজকন্যা')

ছড়া এখানে গল্পকে সমাধানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ফলে বোঝা যাচ্ছে গল্পটা বেশ প্রাচীন। এখানে ছড়ার চলমানতা লক্ষণীয়। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র শেষ বিভাগ 'আম-সন্দেশে' কোন গল্প নেই। শুধু ছড়া আছে। যেমন—

খোকন্ সোণা চাঁদের কোণা,—

খোকার মাসি এল দেশে'

আকাশের চাঁদ পাতালের চাঁদ

ধরে এনেছে... ছে!— (সোণা ঘুমা'ল)

এ নিছকই ঘুম পাড়ানি ছেলেভুলানো ছড়া।

তারপর 'শেষ' অংশে ছড়ার মাধ্যমে গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে—

এক যে রাজা
খেতেন খাজা
তাঁর যে রাণী খেতেন ফেণী,
তাঁর যে নফর সে যায়
সফর,
রাজার পুত্র
মুরলী
সকল কথা
ফুরলি

'শেষ'-এর পর আছে 'ফুরা'ল'। সেখানেও ছড়া—

আমার কথাটি ফুরা'ল
নটে গাছটি মুড়াল।
.. ..
খাবার ধন খা'ব নি? গুড়্ গুড়ুতে যা'ব নি?

আপাত অসংলগ্নতা ছড়ার যে অনিবার্য শর্ত, তা এখানে বোঝা যায়। এ যেন পাঠক-পাঠিকার কাছে গ্রন্থকারের 'চিরপুরাতন অফুরন্ত প্রশ্ন' থেকে যাওয়া।

চিরদিনের রূপকথা-র 'শেষ' অংশেও ছড়া আছে। যেমন—

কথা কি
ফুরোয়?
ঝড়ে শুধু উড়োয়
.. ..
.. ..

কেন রে বাঁশী বাজিস না?

বাজি বারে বারে,

শুনতে কে পারে?

এখানেও সেই প্রশ্ন। তবে এই ছড়ার পার্থক্য আছে। এখানে গ্রন্থকার প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন—

যে শোনে

সেই সুর

বুকে তার ঢেউ খেলে

তেরো নদী

সা-ত

সমুদ্দুর!

এই সুর যে শুনতে পাবে একমাত্র সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রূপকথার দেশে পৌঁছাতে পারবে।

ঠাকুরমা'র ঝুলি-তে লৌকিক অভিব্যক্তির প্রকাশও যথেষ্ট। যেমন—

ক. সন্ন্যাসীর দেওয়া শিকড়-বাটা খেয়ে রানীদের সন্তানবতী হওয়া ('কলাবতী রাজকন্যা')। এই যে সন্ন্যাসীর কৃপায় সন্তান লাভ— লোকবিশ্বাসের নিদর্শন।

খ. বুদ্ধু-ভূতুমের কল্যাণার্থে তাঁদের মায়েদের সুপারির ডোঙায় দুই কড়া কড়ি, ধানদূর্ব্বা আর আগা-গলুইয়ে পাছা-গলুইয়ে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া। ('কলাবতী রাজকন্যা')

গ. কলাবতী রাজকন্যার ব্রতপালন। (ঐ)

ঘ. কাঁকণমালা কাঞ্চনমালার পিট-কুড়ুলির ব্রতপালন। ('কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা')

ঙ. মণিমালার ব্রতপালন ('পাতালকন্যা মণিমালা')

চ. 'নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা', 'জারে লোহা কোঁকড়', 'ডরে ভয়ে কেন্নটি', 'ঘরে থাক্‌লে রাবণ মারে, বাইরে গেলে রামে মারে'— এইসব প্রবাদের ব্যবহার। ('ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী')

ছ. ব্রাহ্মণকে তেল, জল, ফুঁ-বাতাস দেওয়া। (ঐ)

জ. মন্ত্রের জোরে হারানো গাধা গণে আনা। (ঐ)

ঝ. ‘‘সামাজিক বাধা-নিষেধ অবলম্বন করিয়া লোক-কথায় অনুরূপ আর একটি প্রাচীন লোক-বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, ইংরাজিতে তাহা ‘ট্যাবু’ (Taboo) বলিয়া পরিচিত।’’[৫০] নীলকমল যেমন লালকমলকে খোক্কসদের কাছে লালকমলের নাম আগে বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নিষেধ না মানায় তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হন।

কখনো কখনো দেখা যায় কোন কিছুর অস্তিত্বের সঙ্গে নায়ক/ নায়িকার অস্তিত্বের নির্ভরশীলতা। একে বলা যেতে পারে জীবন-চিহ্ন অর্থাৎ ‘‘The External Soul in Inanimate Things – Thus the idea that the soul may be deposited for a longer or shorter time in some place of security out side the body’’[৫১] যেমন— ‘কিরণমালা’ গল্পে অরুণ, বরুণ আর কিরণের কাছে এক তরোয়াল দিয়ে বলেছিলেন, যদি তরোয়ালে মরচে ধরে তো বুঝতে হবে অরুণ আর বেঁচে নেই। তরোয়ালে মরচে দেখে বরুণ যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তীর ধনুক দিয়ে বলেন—‘যদি তীরের আগা খসে, ধনুর ছিলা ছিঁড়ে’ তবে বুঝতে হবে তিনিও বেঁচে নেই। ‘ডালিমকুমার’ গল্পে রানীর আয়ু একজোড়া পাশা আর ডালিমকুমারের প্রাণ ডালিমের বীজের মধ্যে ছিল।

আবার রাক্ষসদের প্রাণ শরীরের মধ্যে নয়, বাইরে অন্য প্রাণীর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ ‘The External Soul in Animals’। যেমন— ‘নীলকমল আর লালকমল’ গল্পে রাক্ষসদের আর রাক্ষসী-রানীর প্রাণ ছিল পুরীর দক্ষিণ কুয়োর মধ্যে এক সোনার কৌটো মধ্যস্থ ভীমরুল (জীয়ন কাটী) আর ভিমরুলী (মরণকাটী)-র মধ্যে। ‘সোনার কাটী রূপার কাটী’ গল্পে রাক্ষসদের প্রাণ পুকুরের মধ্যে অবস্থিত এক স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেকার এক সাতফণাওয়ালা সাপের ভেতরে ছিল। আর এক শুক পাখির মধ্যে রাক্ষসী-রানীর আয়ু। আবার ‘‘The External Soul in Plants – Further it has been shown that in folk-tales the life of a person is sometimes so bound up with the life of a plant that the withering of the plant will immediately follow or be followed by the death of the person.’’[৫২] যেমন— ‘ডালিমকুমার’ গল্পে রাজপুত্রের প্রাণ ছিল ডালিম গাছের বীজে। সিঁড়ির ফাটলে রাক্ষসী ডালিমের বীজ রেখে দিলে রাজপুত্রের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তালগাছের সঙ্গে

রাক্ষসী রানীর সম্পর্ক। রাক্ষসীর দুঃসময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তালগাছও ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এ সবই আদিম জনগোষ্ঠীর লোকবিশ্বাসের নিদর্শন।

ঞ. ''তেল সিঁদূরে না'বি ধুবি, শশা পা'বি শশা খা'বি।

কোলে পাবি সোণার পুত বুকজুড়ানো মাণিকটুক্।''

কাঠুরিয়া-বউ মা ষষ্ঠীর ব্রত পালন করলে মা ষষ্ঠী স্বপ্নে কাঠুরিয়া-বউকে একথা বলেন। কিন্তু সাতদিন পর খাওয়ার কথা। সেকথা না শুনে কাঠুরিয়া-বউ তখনই শশার বোঁটাসোটা ফেলে খেয়ে নেয়। এখানে নিষেধ বা ট্যাবু কাজ করছে। ফলে কাঠুরিয়া-বউয়ের দেড়-আঙুলে ছেলে জন্মায়। (দেড়-আঙ্গুলে)

ট. এক বিঘত ধানের চৌদ্দ বিঘত চা'ল (ঐ) — প্রবাদের নিদর্শন।

ঠ. 'কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা' গল্পে ''রাজার রাখালবন্ধু যাদুশক্তি সহায়তায় দাসীর শাস্তি বিধান করেছে, রানীর হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছে। ...'শীতবসন্ত' গল্পে দুয়োরানীর মাথা পরিষ্কারের নাম করে সুয়োরানী তার মাথায় একটি ওষুধের বড়ি গুঁজে দিয়ে তাকে টিয়াপাখিতে রূপান্তরিত করেছে।''[৫৩] পরে ওষুধ খসে গেলে আবার পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছে। 'কিরণমালা' গল্পে অরুণ-বরুণ মায়াপাহাড়ে গিয়ে পাথরে পরিণত হয়েছেন। মুক্তো-ঝরার জল ছেটালে আবার মানুষ হয়েছেন। এই রূপান্তরের সঙ্গে রয়েছে যাদু-বিশ্বাসের যোগ, যা লোককথার অঙ্গ।

ড. মানুষের সঙ্গে পশুর বিয়ে ('কলাবতী রাজকন্যা')। এক্ষেত্রে আদিম টোটেম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

ঢ. উত্তর থেকে অক্ষয় ফুল আর দক্ষিণ থেকে অক্ষয় মূল আনতে পারলে কেউ বৃদ্ধ হবে না, সব নতুন হবে ('চিরদিনের রূপকথা')। এই 'দিক' সংক্রান্ত বিশ্বাসও লোকবিশ্বাস।

৩. কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদান :

ঠাকুরমা'র ঝুলি-তে কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ক. ছোট রানীকে শিল-ধোয়া জল খেতে উপদেশ দিয়ে অন্য রানীরা মনে মনে বললেন—''শিল-ধোয়া জল খাইলে— সোণার চাঁদ না তো বাঁনর চাঁদ ছেলে হইবে।''('কলাবতী রাজকন্যা')

খ. তিন বুড়ির রাজ্যে বন্দী ‘‘রাজপুত্রেরা লেজ ধরিয়া, পুচ্ছ ধরিয়া, বুড়ীদের নাকের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল।’’ (‘কলাবতী রাজকন্যা’)

গ. জল্লাদ মানুষকে ধরলে মানুষ পুঁটুলি খুলে বলে—

সূতন সূতন নট্‌খটি!

রাজার রাজ্যে ঘট্‌মটি

সূতন্ সূতন নেবোর পো,

জল্লাদকে বেঁধে থো। (‘কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা’)

ঘ. সুতোর গুটি কাঁকণমালার নাকে ঢিবি হয়ে বসলে কাঁকণমালা ব্যস্ত হয়ে বলে— ‘দুঁয়ার দাঁও, দুঁয়ার দাও, এঁটা পাঁগন, দাসী পাঁগন নিঁয়া আঁসিয়াছে।’ (‘কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা’)

ঙ. সুয়োরানীর ছেলেরা— ‘এক-এক ছেলে যে, বাঁশের পাতা— পাট-কাটী, ফুঁ দিলে উড়ে, ছুঁইতে গেলে মরে।’ (‘শীত-বসন্ত’)

চ. ছোট বোন রানী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অন্য দুই বোনে হেসে বলে— ‘ও মা, মা, পুঁটির সে সাধ!!’ (‘কিরণমালা’)

ছ. মায়া-পাহাড়ে যাওয়ার পথে কিরণমালার পিঠের উপর বাজনা বাজে—

তা কাটা ধা কাটা

ভ্যাং ভ্যাং চ্যাং—

রাজপুত্ত্রের কেটে নে

ঠ্যাং! (‘কিরণমালা’)

জ. রাক্ষসের দল রাক্ষসী-রানীকে বলে—

হুঁম্ হুঁম্ খাম্ — আরো খাঁবো।

আর দিকে বলে,—

গুম্ গুম্ গাঁম্— দেঁশে যাঁবো। (‘নীলকমল আর লালকমল’)

রানী বলল—

গব্ গব্ গুম্, খম্ খম্ খাঃ!

আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যাঃ! (‘নীলকমল আর লালকমল’)

ঝ. মন্ত্রীপুত্র পেঁচোর সাজে সেজে বুড়িকে বলেন— ‘‘মা, মা, আমি তো ভাল হইয়াছি!— এই দেখ কেমন আমার নূপ্— নূপের গাঙ্গে নূপ্ ভেস্যে যায়।’’ (‘পাতালকন্যা মণিমালা’)

ঞ. রাজপুত্রের হাসন চাঁপা নাটনকাটী চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি নিয়ে ফেরার খবর পেয়ে রাক্ষসী রানীর ‘হাড়মুড়্মুড়ি গিয়া কল্জে-ধড়্ফড়ি ব্যারাম হইয়াছে’।

(‘সোনার কাটী রূপার কাটী’)

ট. ছেলেরা পণ্ডিত হয়ে ফিরবে এই আশায় আনন্দিত কুমীর তার কুমীরানীকে বলে— ‘‘ওগো, ইলিস-খলিসের চচ্চড়ি, রুই-কাত্লার গড়্গড়ি, চিতল-বোয়ালের মড়্মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখ, ছেলেরা আসিয়া খাইবে।’’ (‘শিয়াল-পণ্ডিত’)

ঠ. শিয়ালকে ধরার জন্য খালের চড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে মরার ভান করে পড়ে থাকলে দুষ্টু শিয়াল কুমীরকে বোকা বানাতে চেয়ে বলে—

‘‘লোকটা যে মরিল তা’র লক্ষণ কি? হুঁ হুঁ—

কাণ নড়্বে পটাপট

লেজ পড়্বে চটাচট্

তবে তো মড়া!— এ বেটা এখনো তবে মরে নি!’’

কুমীর ভাবিল, কথা বুঝি সত্যি— কাণ নাই তবু কুমীর মাথা ঘুরাইয়া কাণ নাড়ে, চট্ চট্ চট্ লেজ আছাড়ে।

(‘শিয়াল পণ্ডিত’)

ড. সন্ন্যাসীর কাছে ব্রাহ্মণ ‘‘দিনে পড়েন,— ‘হগড়ং ডগড়ং বগ বগ বগড়ম্।’ রাতে পড়েন,— ‘চং, ছং, খঁরঁর্‌ঁঅম্— ঘড়্-ড়্ ঘড়ম্!’ নাকের ডাকে গলার ডাকে নিশি ভোর!’’ (‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী’)

ঢ. রাজকন্যার হার চুরি যাওয়ায় ব্রাহ্মণকে সেই হার উদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘটি ঘটি চল খেয়ে চিন্তিত ব্রাহ্মণ বলেন—

‘‘হায় মাগো জগদম্বা, বিপাকে ফেলিলি,

ছায়ে পোয়ে সর্ব্বনাশ, প্রাণে ধনে নিলি

কি করি উপায় মাগো কি করি উপায়—

জগদম্বা! এই তোর মনে ছিল হায়!’’

এদিকে রাজবাড়ির মালিনীর নামও জগদম্বা। সে মনে করেছে ব্রাহ্মণ তার হার চুরির কথা জেনে ফেলেছে। ভয় পেয়ে সে ব্রাহ্মণকে বলে, ‘‘দোহাই ঠাকুর, দোহাই বাবা!— যা’ বল বাবা তা’ই করি— রাজার কাছে যেন আমার নামটি ক’রো না!’’ (‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী’)

ণ. মা ষষ্ঠীর কথামত সাতদিন পরে এবং সম্পূর্ণ শশা না খাওয়ায় কাঠুরে রেগে গিয়ে বউকে বলে, ‘‘সাতদিন পরে খে’লে হাতীর মতন ছেলে হইত, বোঁটাটা হাতীর শুঁড় হইত!— তা নয়,— হয়েছেন এক টিকটিকি,— বোঁটা হয়েছেন তিন আঙ্গুলে’ এক টিকি— এক বিঘত ধানের চৌদ্দ বিঘত চা’ল।’’ (‘দেড় আঙ্গুলে’)

ত. দেড় আঙ্গুলে ব্যাঙ রাজপুত্রের নাক-কান কাটবে বলায় ব্যাঙ হেসে ফেলে—

‘‘টিং টিঙা টিং টিঙা। কাটবি কি তুই ঝিঙা।
নাকও নাই, কাণও নাই, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্ ঘিঙা।’’ (‘দেড় আঙ্গুলে’)

থ. সাড়ে সাত চোর দেড় আঙ্গুলেকে দেখে মজা পেয়ে ভাবে—

‘‘তিনি আবার টিকি ফর্ ফর্ তিন ভঙ্গী রাগে গর্ গর্—
টিকির আগে ভোম্‌রা, ইনি আবার কোন্ দেশি চেঙ্‌রা?’’ (‘দেড় আঙ্গুলে’)

দ. রাখালের বাঁশী শুনে ‘‘চল্‌মন্ সৈন্য সিপাই, তন্‌মন্ শান্ত্রী সামন্ত নদীর পাড় মধুবন’’

(‘মুকুট’, *চিরদিনের রূপকথা*)

৪. অভিযান:

ঠাকুরমা’র ঝুলি-র গল্পগুলোতে নানান অভিযানের প্রসঙ্গ আছে। যেমন—

ক. তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙ্গা নদীর জলে কলাবতী রাজকন্যার দেশে পাঁচ রাজপুত্রের ময়ূরপঙ্খী নৌকায় আর বুদ্ধু-ভুতুমের সুপারির ডোঙায় করে যাত্রা। (‘কলাবতী রাজকন্যা’)

খ. রাজপুত্রের দেশভ্রমণ। (‘ঘুমন্ত পুরী’)

গ. ‘দুধ-মুকুটে’ ধবল পাহাড়ে ক্ষীর সাগরের পাড়ে গজমোতি আনার জন্য বসন্তের যাত্রা।

(‘শীতবসন্ত’)

ঘ. মায়া-পাহাড়ে হীরার গাছ, সোনার পাখি, মুক্তো-ঝরার জল আনার উদ্দেশ্যে অরুণ-বরুণ-কিরণমালার অভিযান। (‘কিরণমালা’)

ঙ. রাজার ব্যারাম সারাতে রাক্ষসের মাথার তেল আনার জন্য রাক্ষসের দেশে নীলকমল লালকমলের যাত্রা। ('নীলকমল আর লালকমল')

চ. আট রাজপুত্রের দেশভ্রমণ, যম-যমুনার রাজ্য শেষে সূতাশঙ্খের পাশাবতীর পুরে যাত্রা, ভাইদের খোঁজে বড় রাজপুত্রের পাশাবতীর দেশে গমন। ('ডালিম কুমার')

ছ. রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের দেশভ্রমণ। ('পাতাল-কন্যা মণিমালা')

জ. রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগর পুত্র আর কোটাল পুত্রের দেশের বাইরে যাত্রা। হাসন চাঁপা নাটন কাটী, চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আনতে রাজপুত্রের অভিযান। ('সোনার কাটী রূপার কাটী')

ঝ. তুলো আনতে বাতাসের সঙ্গে দুখুর যাত্রা। ('সুখু আর দুখু')

ঞ. কাঠুরে-বাবাকে ফিরিয়ে আনতে রাজার কাছে দেড় আঙ্গুলের গমন। ('দেড় আঙ্গুলে')

ট. রাজত্বের দক্ষিণে নীল সমুদ্রে সন্তানের জন্য রানীদের ধর্ণা, রাজপুত্রের কাঠকন্যার রাজ্যে যাত্রা।
('রাজকন্যা')

ঠ. রাজকন্যার দুধসায়রে যাত্রা। ('চাঁদের দেশ')

ড. রাজপুত্রের কমল সায়রে যাত্রা। ('কমল সায়র')

ঢ. রাখালের বাঁশীর টানে রাজপুত্রের যাত্রা। ('মুকুট')

ণ. অক্ষয়ফুল আর অক্ষয়মূল আনতে রাজকুমার-রাজকুমারীর যাত্রা। ('চিরদিনের রূপকথা')

৫. ভাষা ব্যবহার, দক্ষিণারঞ্জনের রচনাশৈলী:

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র ভাষা লক্ষ করলে দক্ষিণারঞ্জনের সচেতন, সযত্ন প্রয়াস চোখে পড়ে। তাঁর ভাষা-ব্যবহার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পূর্ব অভিপ্রেত।

ক. **পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব:—** *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র ভাষা ব্যবহারে পূর্ববঙ্গের প্রভাব যথেষ্ট। যেমন— কূটাটুকু, পাকশাল, রূপার থালে, আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া, দেও, আমাদিগে, খেদাইয়া, নায়ে, থুইয়া, ঠোনা, হুলুধ্বনি, সোয়ামী, আলস, কচ্‌লাইয়া, সূতা, উনন, দুইটা, নাওয়াইয়া, গম্‌গমা,

ছিটাও, থোবা থোবা, হুড়াহুড়ি, উগারিয়া, চিবাইও, আইলি, নিবে, আরসুলা, হুড়াহুড়ি, গিয়াছে, টুক্‌রা, দুইখানা, আগ্‌লাইয়া, নিয়া, দিয়াছে, খাবল, পিটা, হৈলা, সিকা, চুমা, কুড়াল, ঘাট্‌লা, থু'য়েছে, কয়, রও, দিয়া ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের স্বরধ্বনিপ্রবণ ভাষা ব্যবহার করে তিনি লোককথার নিজস্ব রূপটাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

খ. **সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ:—**

- দক্ষিণারঞ্জন ইচ্ছা করে সাধু-চলিত ভাষা মিশিয়ে দিয়েছেন। যেমন
- ''এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।'' ('কলাবতী রাজকন্যা')
- রাজপুত্র ধীরে ধীরে ফুলবনের কাছে গেলেন। ('ঘুমন্ত পুরী')
- শীত বসন্ত দুই ভাই চলেন, চলেন, বন আর ফুরায় না। ('শীত বসন্ত')
- পরদিন এক গ্রামের মধ্যে গিয়া রাজপুত্র এক বিড়ালের ছানা নিয়া আসিলেন। ('ডালিমকুমার')
- সোণাঢাকা অঙ্গ নিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া দুখু খাবার ঘরে গেল। ('সুখু আর দুখু')
- ''রাজার কাণা রাজকন্যা— ইহাই নিয়া রাজকন্যার কাণা চোখ ফুটাইও।'' ('দেড় আঙ্গুলে')

বলাই বাহুল্য এই ভাষা বেশ শ্রুতিমধুর।

গ. **উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রয়োগ: —**

উক্তি-প্রত্যুক্তিতে দক্ষিণারঞ্জন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

- শুক বলে— ''সারি, সারি! বড় শীত!''
  সারি বলে—''গায়ের বসন টেনে দিস্!''
  শুক বলে— ''বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূর,
  খান, সারি, ন-দীর কূল?'' ('শীত-বসন্ত')
- খোক্কসরা ঘরে কে জাগে জিজ্ঞেস করায় লালকমল উত্তর দেয়—

“নীলকমলের আগে লালকমল জাগে

আর জাগে তরোয়াল,

দপ্ দপ্ ক’রে ঘিয়ের দীপ জাগে—

কা’র এসেছে কাল?” (‘নীলকমল আর লালকমল’)

- ব্রাহ্মণ চোর এসেছে মনে করায় ব্রাহ্মণী বলেন—

“চোর কোথায় তোমার মাথা,—

ওই দ্যাখ না মতির গাধা খুঁটিতে বাঁধা।” (‘ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী’)

কথোপকথনে চলিত ভাষা প্রয়োগ দক্ষিণারঞ্জন সচেতন ভাবেই করেছেন মনে হয়। হয়ত বর্ণনার ভাষা আর কথোপকথনের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আনতে চেয়েছিলেন, যাতে ভাষাগত বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

ঘ. **যতিচিহ্নের ব্যবহার:—**

ঠাকুরমা’র ঝুলি-র গল্পগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য “রূপকথার পরিমণ্ডল ও মোহ সৃষ্টি করতে গল্পগুলির তুলনা নেই। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে যাদুকরী ভাষা আর ‘ছেদ্’, ‘হাইফেন’ ও ‘হরফ’ চিহ্ন ব্যবহারের আশ্চর্য দক্ষতা। দ্বিতীয়টির কৃতিত্ব একান্তভাবে দক্ষিণারঞ্জনেরই প্রাপ্য। তিনি ‘রূপকথা’ কথকের বাচনভঙ্গির উত্থান-পতনের ছন্দটিকেও গল্পে যথাযথ রক্ষা করেছেন।”[৫৪]

‘বুদ্ধু ডাকিল,— “মা!”

ভূতুম্ ডাকিল,— “মা!” ’

“বুদ্ধুর মা, ভূতুমের মা, পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া গিয়া দুইজনে দুইজনকে বুকে নিলেন।”

(‘কলাবতী রাজকন্যা’)

‘হরফ’ চিহ্নের নিজস্ব ব্যবহারের দ্বারা দক্ষিণারঞ্জন সন্তানের এই ‘মা’ ডাকের আবেগ শুধু বুদ্ধু ভূতুমের মায়ের মনেই নয়, সেদিনের বাংলার সমস্ত পাঠক-পাঠিকার মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।

আবার, ‘‘আহা, ছেলে-মেয়েগুলি যে ——— চাঁদের পুতুল ——— ফুলের কলি।”

(‘সাত ভাই চম্পা’)

অতি দীর্ঘ হাইফেন বা ‘ড্যাশ’ চিহ্নের ব্যবহারে সাত ভাই বোনের কুসুম-কোমল শরীর, তাদের উজ্জ্বলতা স্পষ্টতা পেয়েছে। এ একেবারেই দক্ষিণারঞ্জনের নিজস্ব সৃষ্টি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, প্রলম্বিত হাইফেন, ছেদচিহ্ন সহযোগে রূপকথার মোহজাল সৃষ্টিকারী উপযুক্ত পরিবেশ, ধ্বনিসাম্য, অনুষঙ্গ তৈরিতে দক্ষিণারঞ্জন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

করতাল ঝন্ ঝন্—
খরতাল খন্ খন্—
ঢাক ঢোল— মৃদঙ্গ কাড়া—
ঝক্ ঝক্ তরোয়াল, তর্ তর্ খাঁড়া— (‘কিরণমালা’)

অথবা,

‘‘হাম্ — — — হুম্!— — — হাঁই!
‘‘হুম্ — — — হম্ — — — হঃ!”
‘‘হুম্!— — — হাম্ — — —!”
‘‘ঘঁঃ! — — —” (‘কিরণমালা’)

কিংবা, ‘সাত পৃথিবী থর থর কম্পমান,— বাজ, বজ্র, — শিল, — চমক — — — — —!’

(‘কিরণমালা’)

প্রত্যেকটা যতিচিহ্নের সচেতন ব্যবহারে মায়া-পাহাড়ের উপযুক্ত ও ভয়ানক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আবার,

‘রাক্ষসী বলিল— ‘‘খাঁব না, খাঁব না, রাঁখ্ রাঁখ্!! তোঁর পাঁয়ে পঁড়ি!”— রাণীর মূর্ত্তি কোথায়, দাঁত-বিকটী রাক্ষসী!!—’ (‘সোনার কাটী রূপার কাটী’)

—এক্ষেত্রে যতিচিহ্নের (!) দ্বিগুণ প্রয়োগে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর মূর্তি নির্মিত হয়েছে।

‘চিরদিনের রূপকথা’-তেও যতিচিহ্নের প্রয়োগ এমনই। ‘রট্ খটা রট্ ঝনক্ ঝন্ আরেক ঘোড়া ঝড়মিশেলী পায়ে— পলক না ফেলতেই বাঁশ বনে— শান তরোয়াল ঝিলিক্ ঝনন্— ঝনন্ — — — কার হাতে?’

কিংবা, ‘...বাঁশ বন, উচর মাঠ, নদীর জল, পহর, পবন ম...ম...ম...ম...ম...ম... সুরে।’ (‘মুকুট’) এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দীর্ঘ হাইফেন চিহ্নের ব্যবহারে, কখনো একই বর্ণের বারংবার ব্যবহারে রূপকথার জগতের ছবি ‘সত্যকারটির মত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।’ দক্ষিণারঞ্জন লিখিত ভাষাকে বাচনের স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যতিচিহ্নের এই নিজস্ব ব্যবহার কল্পনা উদ্রেককারী মৌখিক পরম্পরার অনুগত।

৬. **<u>শব্দ ব্যবহারের নিজস্বতা/ বর্ণনাভঙ্গি</u>:—**

শব্দ বা ভাষা ব্যবহারেও দক্ষিণারঞ্জনের নিজস্বতা লক্ষণীয়। অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর এ প্রচেষ্টা।

- ‘রাণীরা সকলে কিল্ কিল্ করিয়া উঠিলেন—’ (‘কলাবতী রাজকন্যা’)
- ‘রাগে রাক্ষসীর দাঁতে-দাঁতে কড়্ কড়্ পাঁচ পরাণ সর্ সর্।— / রাণীর পা’ উছল, রাণীর চোক ‘উখর’/ রাণীর মন ছন্‌ছন্/ পথে পথে হাড়ের জাঙ্গাল!/ ‘অছিন্ অভিন্’ পুরী রাক্ষসে রাক্ষসে কিল্‌বিল্।/ পচায়, গলায়, পুরী দগ্ দগ্ থক্ থক্’ (‘নীলকমল আর লালকমল’)

অথবা, করম্ খাম্ গরম খাম্

মুড়্‌মুড়িয়ে হাড্ডি খাম্!

হম্ ধম্ ধম্ চিতার আগুন

তবে বুকের জ্বালা যাম্!! (‘নীলকমল আর লালকমল’)

- ঘরে প্রদীপ দপ্‌দপ্, রাজপুত্রের মন — ছব্ ছব্ (‘ডালিমকুমার’)
- ইলিস-খলিসের চচ্চড়ি, রূই-কাতার গড়্‌গড়ি, চিতল-বোয়ালের মড়্‌মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখ (‘শিয়াল-পণ্ডিত)
- ‘চোখ টানিয়া মুখ বাঁকাইয়া— তিন ঝাক্‌না ভিরকুট্টি,’ (‘সুখু আর দুখু’)

- ‘কোটর চোক অস্‌গস্‌, জিভ বার বার খস্‌-খস্‌’ (‘নীলকমল আর লালকমল’)
- ‘দেড় আঙ্গুলে’ হটিং হটিং করিয়া হাঁটে, ফটিং ফটিং করিয়া নাচে।/ ভাঁটার মতন ছোটে, কুতুর্‌ কুতুর্‌ হাঁটে/ খোনা, খুন্তি, পোলো, থোলো, রায়বাঁশ, গলফাঁস, সকল নিয়া রাজ্যের যত চোর অলিতে গলিতে খাড়া হইল, চোরের রাজা ‘চ্যাং-পিছ্‌লে’ (‘দেড় আঙ্গুলে’)
- ‘মায়ের পেটের রক্তের পোম্‌, আপন বলতে তিনটি বোন্‌’ (‘কিরণমালা’)
- ‘শীত বসন্তের পাতে আলুণ আতেল কড়্‌কড়া ভাত সড়্‌সড়া চা’ল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।/ সতীনতো ‘উরী পুরী দক্ষিণ-দু’রী’ (‘শীত-বসন্ত’)
- ‘নিওর-ভেজা শিউলি’ (‘উমনো ঝুমনো’)
- ‘হিক্‌সিকে ধনুক, চিকচিকে বাণ কাঁধে, ঝন্‌ ঝনন্‌ তরোয়াল খাপে, ঘাম-অঙ্গ ঘোড়ায় দগবগ ধগবগ আসেন’। এছাড়াও ‘হল হলন্ত সৈন্য’, ‘উচর মাঠ/ চল্‌মন্‌ সৈন্য’, ‘নেঙ্গা তরোয়াল’ (‘মুকুট’)।)
- পরীর ছোঁয়ায় কালো জল উস্‌নুস্‌ (‘চিরদিনের রূপকথা’)/ জোস্নালী বাতাস (‘চিরদিনের রূপকথা’)

কখনো বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— ‘সিপাই লস্কর’ (ফারসি), ‘পরেশান’ (ফারসি), দরবার (ফারসি), হায়রাণ (আরবি) ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন বড় অদ্ভুত ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। রানীদের বিরক্তি, রাক্ষসীর রাগ-লোভ, রাজপুত্রের ভয়, দেড়-আঙ্গুলের পদচালনা, শীত বসন্তের বঞ্চনা, কুমীরের রসনা ইত্যাদি ভাব বেশ সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। এই ধরনের শব্দ প্রয়োগে প্রত্যেকটা ক্রিয়া অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ফলে দৃশ্যমানতা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটা বর্ণনা চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছন্দময়তাও সৃষ্ট হয়েছে। এতে রূপকথার স্বাদ-গন্ধ বেশ গাঢ়ত্ব পাচ্ছে, একটা বিশেষ ধ্বনিঝংকার তৈরি হয়েছে। এছাড়া এখানে নানাধরণের স্বরভঙ্গি সমান্তরিত হয়েছে বলা যেতে পারে। এই যে মৌখিক ভাষাভঙ্গি, খুব জীবন্ত ভাষা, ‘ইঙ্গিতপূর্ণ বিশেষত কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা’, ছেদ, হাইফেনসহ বিভিন্ন যতিচিহ্নের সচেতন ব্যবহার, সাধু-চলিত ভাষার ইচ্ছাকৃত মিশ্রণ আসলে রূপকথার কথক বা বক্তার ‘কণ্ঠস্বরের উচ্চারণভঙ্গিকে’ ছুঁতে বা ধরতে চাওয়ার কামনা। শ্রোতাদের যাতে মনে হয় তারা শুধু গল্প পড়ছে না, তারা গল্প শুনছেও। লেখার ভাষাকে তিনি প্রায় বাচনের স্তরে নিয়ে

যেতে চেয়েছিলেন। এই heteroglossia বা ‘‘সমান্তরিত স্বরাগম সম্মিলিত স্বর নয়, সমান্তরাল স্বরের সমাপতন। এখানে কেউ কারো স্বরকে অস্বীকার করছে না।’’[৫৫] দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ ভাষাভঙ্গির দ্বারা তাঁর সমকালের মধ্যে থেকেও সুদূর অতীতের কোন সময় অর্থাৎ রূপকথার জগৎকে ছুঁতে চাওয়ার চেষ্টা এখানে লক্ষ করা যায়—

হাঁউ মাঁউ! কাঁউ!

মনিষ্যির গঁন্ধ পাঁউ!!

ধঁরে ধঁরে খাঁউ!!!

এ একেবারেই রূপকথা— রাক্ষস-খোক্কসের দেশের উপযুক্ত পরিবেশ। একদিকে পিছুটান, অন্যদিকে সমকালের জাতীয়তাবাদকে ধরার চেষ্টায় এগোনোর প্রবণতা।

যাদুকরী ভাষার সাহায্যে দক্ষিণারঞ্জন পাঠক-পাঠিকাদের নিয়ে যেতে চান ‘মৌখিক বাচন বা skaz-এর ভাষিক স্তরে।’ ‘‘...‘স্কাজ’ শব্দটি রুশ। মৌখিক কাহিনিধর্মী রচনার ভাষাবৈশিষ্ট্য হল skaz।’’[৫৬] বাখতিনের মতে যেকোন গল্প কথন বা বলার ক্ষেত্রে skaz-এর একটা উপাদান সর্বদা অন্তর্নিহিত থাকেই। *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র ক্ষেত্রেও আমরা গৃহীত কথ্যভাষা বা স্কাজের উপাদান দেখে থাকি। ‘‘ভাষার মধ্যে যে বহু বিচিত্র ভঙ্গি ও বুলি থাকা সম্ভব, একেই একটি নির্দিষ্টতা দান করে তৈরি হয় ‘মান্য ভাষা’। ‘স্কাজ’-কে হতে হয় মান্য ভাষার মতো সর্বজনবোধ্য। তা হয়ে ওঠে ‘stylization of various forms of oral everyday narration’ ’’[৫৭]

গল্পগুলো যেভাবে সংগৃহীত হয়েছিল *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র প্রথম সংস্করণে দক্ষিণারঞ্জন হুবহু সেভাবেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে পূর্ববঙ্গীয় ভাষাগত আঞ্চলিকতার কারণে গ্রন্থের আস্বাদ যদি সকলে না নিতে পারে— সমালোচকদের এমন দুশ্চিন্তায় দক্ষিণারঞ্জন ভাষায় বেশ কিছুটা অদলবদল করেন। তবে এতে রূপকথার রসের ঘাটতি হয়নি। দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ কথনভঙ্গি, ছড়া, বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি রূপকথার স্বাদ গ্রহণে বাধা না হয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ফলে আপামর জনসাধারণ রূপকথার রসগ্রহণে সক্ষম হয়। দক্ষিণারঞ্জন লক্ষ রেখেছিলেন, ‘‘শত ঝাড়াই-বাছাই মাজা-ঘষা সত্ত্বেও উৎসভাষা-উপভাষার টান-টোন যেন অনেকদূর বজায় থাকে, তখন নিশ্চয় তাঁর আন্দাজেও আসেনি, গ্রামীণ ওই

‘ধ্বনি-যুক্তি’ স্মৃতিবিধুর কোন মনন-ক্রিয়া জাগাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজে।”[৫৮] এই ভাষা-প্রসঙ্গে আরও বলা যায়— ‘‘সমান্তরিত স্বরাগম বা হেটেরোগ্লসিয়ার ফলে ঐতিহাসিক বা সামাজিক প্রসঙ্গ যখন উপন্যাসে মুখোমুখি এসে পড়ে, মিশে যায় নানা প্রকার স্বর— তখন উপন্যাসে দ্বি-বাচনিকতা বা ডায়ালগিজম্-এর জন্ম হয়।”[৫৯] রূপকথার ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। কারণ ‘ভাষার চরিত্রই দ্বিবাচনিক’।

ঘ্যাঁঘর্ চরকা ঘ্যাঁঘর্,

রাজপুত্র পাগল!

হটর্ হটর্ পবনের না’,

মণিমালার দেশে যা।

এখানে মান্যভাষা অর্থাৎ শহুরে ভাষার মান্যতার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার কথনভঙ্গির প্রভাব (tonal effect)-এর আশ্চর্য সমাপতন লক্ষ করা যায়। মান্যতা ও কথনভঙ্গি মিলে মিশে যাচ্ছে, যার দ্বারা একই ভাষার মধ্যে ‘বহু বিচিত্র ভঙ্গি ও বুলি’ উঠে আসছে। বহু কণ্ঠস্বর যুক্ত হচ্ছে। গ্রাম-শহর সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এর সঙ্গে আবার চরিত্র বা পাঠকের উদ্দেশ্য যুক্ত হতে পারে। ফলে সাহিত্যের হাটেও ‘ঝুলি’র কদর হয় অপরিসীম।

সমালোচকদের আপত্তিতে দক্ষিণারঞ্জন ‘ঝুলি’র ভাষাকে পরিশীলিত-পরিমার্জিত-সংস্কৃত করা চেষ্টা করলেন। অথচ এতে রইল রূপকথার বিশেষ রীতি-বিশেষ ভাষা-বিশেষ ভঙ্গি। ফলে এর মধ্যে মিশে গেল মান্য ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা। পরিণামে দেখা যায় তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত সমাজ এর রসগ্রহণ করতে পারছে। আবার গ্রাম-বাংলার পাঠকও রূপকথার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় না।

৬. **আদল/Structure:**

ঠাকুরমা’র ঝুলি-র গল্পগুলোর আদল বা গঠন যাই বলা হোক না কেন এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচ্য হল এদের ক্রিয়াশীলতা। এই ক্রিয়াশীলতা বা “Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its significance for the cause of the action”[৬০]। এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ‘‘The names of the dramatis personae

change (as well as the attributes of each), but neigher their actions nor functions change."[৬১] অর্থাৎ ‘‘কাহিনীতে দুটো প্রধান প্রবাহ বিদ্যমান— একটি পরিবর্তনীয় এবং অপরটি অপরিবর্তনীয়।’’[৬২]

প্রপ কথিত এই ক্রিয়াশীলতাগুলো হল যথাক্রমে—

১. **পরিবারের কোন সদস্যের অনুপস্থিতি অথবা উপস্থিতি**। যেমন—

- পাঁচ রাজপুত্র ও বুদ্ধু-ভূতুম্ কলাবতীর পুরে যান। (‘কলাবতী রাজকন্যা’)
- রাজপুত্র দেশভ্রমণে যান। (‘ঘুমন্ত পুরী’)
- মায়া-পাহাড়ে যান অরুণ-বরুণ-কিরণমালা। (‘কিরণমালা’)
- রাজা রাজসভা থেকে ফিরে শোনেন ছোটরানীর ব্যাঙের ছানা - ইঁদুরের ছানা সন্তান জন্মেছে। (‘সাত ভাই চম্পা’)

  বাইরে থেকে ঘরে উপস্থিতির ফলে কাহিনি নাটকীয় গতি লাভ করেছে।

২. **সাবধানবাণী/ নিষেধাজ্ঞা**।

- নীলকমল লালকমলকে শেখান তিনি যেন নিজের নাম আগে না করেন। (‘নীলকমল আর লালকমল’)

৩. **নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন**।

- লালকমল নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে নিজের নাম করে ফেলেন। (‘নীলকমল আর লালকমল’)

৪. **খলনায়কের অনুসন্ধান**।

- ডালিম কুমারের আয়ু কিসে আছে জানার জন্য রাক্ষসী সন্ধান চালায়। (‘ডালিমকুমার’)

৫. **খলনায়কের তথ্যসংগ্রহ শেষ**।

- রাক্ষসী জেনে নেয় ‘ডালিম কুমারের আয়ু ডালিমের বীজে’। (‘ডালিমকুমার’)

৬. **খলনায়ক নায়ককে নিজের করায়ত্ত করে**।

- রাক্ষসী রাজপুরীর হাজার সিঁড়ির ফাটলে ডালিমের বীজকে রেখে দেয়। (‘ডালিমকুমার’)

৭. নায়ক না বুঝেই নিজের শত্রুকে সাহায্য করে।

- তিনবুড়ির পেটের মধ্যে বন্দী পাঁচ রাজপুত্রকে বুদ্ধু ভুতুম্ মুক্তি দেয়। ('কলাবতী রাজকন্যা')

৮. ক) **খলনায়ক পরিবারের কোন একজন ব্যক্তি কিংবা প্রাণীর ক্ষতি করে।**

- রাজপুত্রদের পরামর্শে মাঝিরা বুদ্ধু-ভুতুম্‌কে জলে ফেলে দেয়। ('কলাবতী রাজকন্যা')
- সুয়োরানী দুয়োরানীর মাথায় ওষুধের বড়ি টিপে টিয়া বানিয়ে দেন। ('শীত বসন্ত')

খ) **পরিবারের একজনের কোন কিছুর অভাববোধ হয় অথবা সে কোন কিছু পেতে চায়।**

- ভালোবাসার অভাব বোধ করে রাজপুত্র তিনবন্ধুসহ বেরিয়ে পড়েন। ('সোনার কাটী রূপার কাটী')
- প্রথমে অরুণ, তারপর বরুণ, সবশেষে কিরণমালার মায়া-পাহাড়ে যাত্রা। ('কিরণমালা')

৯. দুর্ভাগ্যের কথা সকলে জানে; নায়ক অনুরুদ্ধ বা আদিষ্ট হয়।

- সৎ-মা শীত-বসন্তকে তাড়িয়ে দেন। রাজা জল্লাদকে আদেশ দেন শীত-বসন্তকে কেটে সুয়োরানীকে রক্ত এনে দিতে। জল্লাদ তাদের প্রাণে না মেরে বনের পথে চলে যেতে বলে এবং দুটো শিয়াল-কুকুর কেটে রানীকে রক্ত দেয়। ('শীত বসন্ত')

১০. সন্ধানকারী ব্যক্তি প্রতিরোধ অথবা প্রতিশোধের চেষ্টা করে।

- ঝড় থম্‌কে বিদ্যুৎ চমকে তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়ে ওঠেন। ('কিরণমালা')
- মন্ত্রীপুত্র পেঁচোর রূপ ধরেন। ('পাতাল-কন্যা মণিমালা')

১১. নায়ক গৃহত্যাগ করে।

- আট রাজপুত্র দেশভ্রমণে বেরোন। ('ডালিমকুমার')
- রাজপুত্রের রাক্ষসীর দেশে যাত্রা ('সোনার কাটী রূপার কাটী')

১২. **নায়ক পরীক্ষিত, আক্রান্ত হয় এবং এই সব পরিস্থিতি নায়কের অলৌকিক সাহায্য লাভের পথ প্রস্তুত করে।**

- দৈত্য, দানব, বাঘ, ভালুক, সাপ, হাতি, সিংহ, মোষ, ভূত-পেত্নী কিরণমালাকে ঘিরে ধরে। বৃষ্টি, বজ্রপাত, মেঘের গর্জন, ভূকম্পন কিছুই বাদ যায় না। ('কিরণমালা')

১৩. **নায়কের প্রতিক্রিয়া।**

- কিরণমালা কোন দিকে ফিরে তাকান না। ('কিরণমালা')

১৪. **নায়ক অলৌকিক নিমিত্ত লাভ করে।**

- বসন্ত শুক-সারীর কাছ থেকে গজমোতির কথা শুনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শুক-সারী বলে শিমূল গাছের থেকে বস্ত্র আর রাজমুকুট এবং মুনির কাছ থেকে ত্রিশূল নিতে। বসন্ত সেগুলো লাভ করেন। ('শীত বসন্ত')

১৫. **নায়ক আকাঙ্খিত বস্তুর সন্ধান লাভ করে।**

- রাক্ষসী-রানী সহ সব রাক্ষসদের মৃত্যু কিসে হবে তার এবং হাসনচাঁপা নাটন কাটী চিরণ দাঁতের চিকণ পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির সন্ধান পায়। ('সোনার কাটী রূপার কাটী')

১৬. **নায়ক এবং খলনায়ক সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়।**

- খোক্কসেরা নীল লালের নখের ডগা, থুথু দেখতে চায়। নীল তার মুকুট তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে বাইরে বের করে দেন, তরোয়ালে প্রদীপের ঘি গরম করে ছিটিয়ে দেন। ('নীলকমল আর লালকমল')

১৭. **নায়ক চিহ্নিত হয়।**

- লালকমল নিজের নাম করায় দরজা ভেঙে খোক্কসরা লালকমলের ওপর এসে পড়ে। ঘিয়ের দীপ উল্টে যায়, লালের মাথার মুকুট পড়ে যায়। নীলকমলের ঘুম ভাঙে। ('নীলকমল আর লালকমল')

১৮. নায়কের জয়লাভ এবং খলনায়কের পরাজয়।

- নীলকমল সব খোক্কসদের নিধন করেন। ('নীলকমল আর লালকমল')

১৯. প্রাথমিকভাবে দুর্ভাগ্য দূর হয়।

- নীলকমল লালকমল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন, মরা খোক্কসের স্তুপ দেখে রাজা ধন্য ধন্য করেন। ('নীলকমল আর লালকমল')

২০. নায়ক প্রত্যাবর্তন করে।

- নীল ও লাল জোড়া রাজকন্যা আর রাজার রাজত্ব লাভ করেন। তাঁরা সে রাজ্যে থেকে যান। ('নীলকমল আর লালকমল')

২১. নায়ককে আবার তাড়না করা হয়।

- 'খোক্কসের মরণ-কথার খবর' আই-কাই রাক্ষস রাক্ষসী-রানীকে দেয়। রাক্ষসী বলে, 'ঝাড়ে বংশে উচ্ছন্ন দিয়া আয়।' ('নীলকমল আর লালকমল')

২২. তাড়না থেকে নায়ক মুক্ত হয়।

- আই-কাই সিপাইয়ের মূর্তি ধরে নীল লালের রাজসভায় গিয়ে বলে রাক্ষসের মাথার তেল না হলে তাদের রাজার অসুখ সারবে না। নীল লাল তেল এনে দিতে রাজি হন। ('নীলকমল আর লালকমল')

২৩. নায়ক অপরিচিত অবস্থায় নিজের বা অন্য দেশে উপস্থিত হয়।

- বেঙ্গম-বাচ্চাদের সাহায্যে নীল লাল দু'ভাই রাক্ষসের দেশে হাজির হন। ('নীলকমল আর লালকমল')

২৪. নকল-নায়ক নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে।

- *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র গল্পে নকল-নায়কের দাবি প্রতিষ্ঠা নেই বললেই চলে। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বুদ্ধু ভূতুম্‌কে জলে ফেলে দিয়ে পাঁচ রাজপুত্র কলাবতীকে দাবি করেন। ('কলাবতী রাজকন্যা')

২৫. **নায়কের কাছে কঠিন কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়।**

- রাক্ষসী-বুড়ি লালকমলকে লোহার কলাই খেতে বলে। ('নীলকমল আর লালকমল')

২৬. **পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।**

- লালকমল লোহার কলাই কোঁচড়ে পুরে রেখে আসল কলাই চিবিয়ে খান।

('নীলকমল আর লালকমল')

২৭. **নায়কের সনাক্তকরণ।**

- কলাবতী রাজকন্যা পাঁচ রাজপুত্রকে জানান ''ঢোল ডগর যা'র'' রাজকন্যা তাঁর।

('কলাবতী রাজকন্যা')

২৮. **নকল-নায়কের মুখোশ খুলে যায়।**

- রাক্ষসী-রানীর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

('সোনার কাটী রূপার কাটী', 'নীলকমল আর লালকমল')

২৯. **নায়ক নতুন চেহারা লাভ করে।**

নায়কের নতুন চেহারা লাভ *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে বিশেষ নেই।

- কলাবতী ও হীরাবতী বুদ্ধুর বানরের ছাল ও ভূতুমের পেঁচার পাখ্ পুড়িয়ে ফেলায় তাদের দেবতার মত চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ('কলাবতী রাজকন্যা')
- সূঁচরাজা সূঁচের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ('কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা')
- সাত ভাই চম্পা ফুল থেকে মানুষ হয়। ('সাত ভাই চম্পা')
- দুয়োরানী টিয়া থেকে মানুষ হন। ('শীত বসন্ত')

৩০. **খলনায়কের শাস্তি।**

- রাক্ষসদের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী-রানীও মারা পড়ে।

('নীলকমল আর লালকমল', 'সোনার কাটী রূপার কাটী')

৩১. **নায়কের বিবাহ এবং সব বাধা-বিপত্তি দূর হওয়া।**

- রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিবাহ হয় ('কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্ত পুরী', 'সোনার কাটী রূপার কাটী' ইত্যাদি)।

কাহিনির ক্রিয়াশীলতার দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে প্রপের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে লেভি-স্ট্রস বলেছেন:

> In the first place, the number of functions is very limited: thirty-one altogether. In the second place, the functions implicate one another "with logical and artistic necessity''; they belong to the same axis so that any two functions are never mutually exclusive (p.5[8],P.[6]4).
>
> On the other hand, some functions can be grouped in Pairs ("prohibition" – "violation"; "struggle" – "victory"; "persecution" – "deliverance", etc.) and others in sequences (e.g., the group "villainy" – "dispatch" – "decision for counteraction" – "departure from home")[৬৩]

প্রপ যে ক্রিয়াশীলতা বা function-এর কথা বলেছেন তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে খলনায়ক বা villain-এর ভূমিকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে এই খলনায়ক ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা'য় পাঁচ রাজপুত্র, 'ঘুমন্ত পুরী'তে নায়কের দিক থেকে কোন খলনায়ক নেই তবে নায়িকার দিক থেকে দৈত্যকে বলা যেতে পারে। 'কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা'-য় দাসী কাঁকণমালা, 'সাত ভাই চম্পা'-য় বড় ছয় রানী, 'শীত বসন্ত'-তে সুয়োরানী, 'কিরণমালা'-য় রানীর বড় ও মেজবোন, 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার' ও 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পে রাক্ষসী রানী। 'পাতাল-কন্যা মণিমালা'য় সেই অর্থে খলনায়ক অনুপস্থিত। 'শিয়াল পণ্ডিত', 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী' ও 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পেও খলনায়ক নেই, 'সুখু আর দুখু'তে খলনায়িকা হল সুখু আর তার মা।

আর একটা বিষয় উল্লেখ্য— নায়ক দু-একটা ক্ষেত্রে অলৌকিক সাহায্য লাভ করছে। যেমন— 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে অলৌকিক উপায়ে ছোটরানী ও তাঁর সন্তানরা খলনায়িকার হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। বসন্ত শুকসারীর কাছ থেকে গজমোতির কথা জানতে পারেন এবং সন্ন্যাসীর ত্রিশূল ও শিমূল গাছের কাছ থেকে রাজবস্ত্র লাভ করেন ('শীত বসন্ত')। বেঙ্গম-বাচ্চাদের চোখ ফোটাতে সাহায্য করায় তারা পিঠে করে নীল লালকে রাক্ষসের দেশে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সব নায়কই

আসলে জয়লাভ করেছেন তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস ও মনোবলের সাহায্যে। এই যে 'মানসিক শক্তি'— এর কথা প্রপ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এর সাহায্যেই রাজার কাছে পাঁচ রানী ও রাজপুত্রদের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ('কলাবতী রাজকন্যা'), একটা মানুষ রাজাকে কে রানী আর কে দাসী— এই প্রকৃত সত্য চিনতে সাহায্য করে (কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা), 'সুখু আর দুখু'র স্বভাবসিদ্ধ আচরণই তাদের জীবনের পরিণতি ঠিক করে দেয়, বোকা ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে রাজপণ্ডিত হয়ে বসেন ('ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী'), 'দেড় আঙ্গুলে'-র মত একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব পিপ্পলকুমার হয়ে রাজার কাছ থেকে পিতাকে মুক্ত তো করেই, সেই সঙ্গে রাজকন্যাও লাভ করে।

> এইভাবে বাংলা 'রূপকথা'য় আমরা প্রপের নির্দেশিত function-কে ছাড়িয়ে অপর এক 'উন্মোচন'-এর সন্ধান পাই যেখানে প্রতারক নায়কের মুখোশ খুলে যাওয়ার উন্মোচন নয়, কেন্দ্রীয় চরিত্রদের আপন জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ বা বাহ্যিক জীবনের ক্লেদ থেকে মুক্তিলাভ ঘটছে।
>
> আর এখানেই সন্ধান পাওয়া যায়, আভাস পাওয়া যায় *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র কাহিনীর একটি নিজস্ব গঠনের, নিজস্ব আঙ্গিকের।[৬৪]

আর কোন বহির্জগতের ঘটনা নয়, মনোজগতের একান্ত অনুভবই এই বিশেষ আঙ্গিকের ঠিকানা দিতে পারবে।

ক্রিয়াশীলতা ছাড়াও *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট হয়। যেমন—

- চোদ্দটা 'কথা'র মধ্যে বারোটাতেই রাজা, রানী, রাজপুত্রের কথা, একটাই পশুকথা, আর একটাতেই কেবল তাঁতী-তাঁতীবউ ও তাদের মেয়েদের কথা। একটা গল্পেই শুধুমাত্র মন্ত্রী, সওদাগর আর কোটালপুত্র—সকলের সামান্য উল্লেখ আছে ('সোনার কাটী রূপার কাটী')। আর 'পাতাল কন্যা মণিমালা' গল্পে মন্ত্রীপুত্রের সক্রিয় ভূমিকার কথা আছে।

- প্রত্যেক গল্পের শুরুতে নায়ক-নায়িকার চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা বা অবস্থানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন— "হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা সোনার মোহর রাজার সব ছিল" ('কলাবতী রাজকন্যা')।

> এক যে ছিল ব্রাহ্মণী, আর তার যে ছিল পতি,—
>
> ব্রাহ্মণীটি বুদ্ধির ঘড়া, ব্রাহ্মণ বোকা অতি! ('ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী')

- কনিষ্ঠের জয়লাভ— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কিরণমালা'।

- সাধারণের অবদান আছে বেশ কয়েকটা গল্পে। দেড় আঙ্গুলেকে রঙ্‌সুন্দর ব্যাঙ সাহায্য করে; এক সাধারণ গৃহস্থবধূ রাজপুত্রের 'হাসন সখী' হয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁকে আশ্রয় দেয়, গরু-ঘোড়া-শেওড়াগাছ-কলাগাছ — সবাই দুখুকে সাহায্য করে, সামান্য মানুষ সূঁচরাজাকে তাঁর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়, আমগাছ ও বোয়ালমাছ রাজপুত্রের সহায়ক হয়।

- অসমবন্ধুত্ব দেখা যায়। যেমন— রাখাল ও রাজপুত্রের বন্ধুত্ব। রাখাল ও রাজপুত্র পাশাপাশি বসে বাঁশি বাজায়। ('কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা', *চিরদিনের রূপকথা*-র 'মুকুট')

- রানীরা একদিকে যেমন 'সোনার খাটে গা, রূপার খাটে পা' দিয়ে সিঁথিপাটি করেন, পরক্ষণেই আবার গৃহকর্মও করেন। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকণমালা, কাঞ্চনমালা', 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্প। এ ক্ষণিকের অসঙ্গতি মনে হলেও হতে পারে ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশায় বর্তমানে কৃচ্ছ্রসাধন। অন্যভাবে লোক কথকদের দিক থেকে বলা যেতে পারে, ''যাদের হাতে তারা নিগৃহীত হয়— তাদের সঙ্গেই নিজেদেরকে সমীভূত করে ফেলেন লোককথকরা। ... লোককথায় তাই রাজপুত্তুর কোটাল পুত্তুরদের যে বিজয় বর্ণিত হয় দৈত্য-দানোদের সঙ্গে লড়াইতে, সেটা আসলে চেতনার অন্তর্লোকে রাজপুত্তুর-মন্ত্রীপুত্তুরদের জীবনের লড়াইতে হারিয়ে দেবার অনিরসিত বাসনারই রূপক: শুধু বিপ্রতীপভাবে প্রতিফলিত, এই যা''[৬৫] তাই বাস্তবের রাজপুত্র-রাজকন্যাদের কঠোর পরিশ্রম বা দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়।

- জলের শক্তিশালী জীব কুমীরকেও স্থলভাগের সামান্য শিয়ালের কাছে অপদস্থ হতে হয়। দুর্বলের হাতে সবলের নিগ্রহ আসলে ইচ্ছাপূরণের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

- রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেম/ রোমান্টিকতার লেশমাত্র নেই।

- শিয়াল পণ্ডিতকে কপট হিসাবে দেখা যায়। ''অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আমাদের বাংলা উপকথার শৃগাল চরিত্রটিও কোল মুণ্ডাদের নিকট থেকে এসেছে। তাই আমাদের উপকথায় শৃগাল অধিকাংশ স্থলেই বিশ্বাসঘাতক।''[৬৬] 'শিয়াল-পণ্ডিত' তো আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

- ‘শিয়াল পণ্ডিত’ গল্পে শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় ‘‘ছেলেরা আঞ্জি ক খ পড়ে।’’ এই ‘আঞ্জি’ শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ‘‘বাংলা পুথির একটি বড় অংশ মঙ্গলাচরণের পূর্বে আঞ্জী চিহ্ন (অনেকটা ৭-এর মতো) দিয়ে লেখা শুরু করেছে। বাংলার বিদ্যাশিক্ষার শুরু হয় আঞ্জী-চিহ্ন দিয়ে। আঞ্জী হল পরাশক্তির অবান্তর রূপ। মহাদেবের ‘উর্ধ্বস্থা ব্যাপিকা শক্তি’ আঞ্জী কলা। সৃষ্টিক্রমের এই সূচনা। আমাদের বিদ্যাশিক্ষার শুরুতে আঞ্জী কলা বাংলায় তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক প্রভাবের প্রমাণ।’’[৬৭] ‘শিয়াল-পণ্ডিত’ গল্পটাও তার ব্যতিক্রম নয়। শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালার পড়ুয়ারাও তাই বিদ্যাশিক্ষার শুরুতে ‘আঞ্জি ক খ পড়ে’।

- মায়ের খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মে একটি শিশু বামন বা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাতে পারে ‘দেড় আঙ্গুলে’-কে দেখলে বোঝা যায়।

- বহুবিবাহ প্রচলিত সমাজ এবং বহুবিবাহের কুফলের ছবিও পাওয়া যায়।

- নারীর সতীত্ব, পত্নীত্ব, সেবাপরায়ণতা, সহনশীলতার দেখা মেলে।

- ‘‘প্রায় প্রতিটি কাহিনীতেই বৌদ্ধযুগের সেই ক্ষমার আদর্শ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কর্মফল দ্বারা সংসার সমুদ্র উত্তরণ করার আদর্শ’’[৬৮] অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হয়।

- *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন বলেছেন ‘ঘুমন্তপুরী’ গল্পে আর্য-অনার্য প্রভাব আছে।

- আবার ‘‘জনশূন্য রাক্ষসপুরীতে রাজপুত্রের গমন মৃত্যুলোকে অন্ধকারে গমনের প্রতীক, সোনা ও রূপার কাঠি দ্বারা রাজকন্যার নিদ্রা ও জাগরণ জন্ম-মৃত্যুর প্রতীক, রাজকন্যাকে উদ্ধার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পুনর্জন্ম লাভের রূপক’’[৬৯] বলে অনেকে মনে করেন।

- বাইরের বস্তুর সাহায্যে সুপ্তি ও জাগরণ বিশেষ করে রূপোর কাঠি ও সোনার কাঠি, কখনো সাপের মাথার মণির ছোঁয়ায়। যেমনটা ‘ঘুমন্তপুরী’ বা ‘পাতালকন্যা মণিমালা’ ইত্যাদি গল্পে ঘটেছে।

- ‘‘ডালিমকুমারের গল্প আমাদের দেশি রূপকথার মধ্যে একটা অনন্য স্থান নিয়ে রেখেছে। একটা অদ্ভুত কাব্যিক আবেদন আছে গল্পটার। এখানেই মানুষের সেই অদ্ভুত মিনতি গাছপালা, সিঁড়ি, বাড়ি ইত্যাদি অমানুষী বস্তুর কাছে।’’[৭০]

- দরিদ্রের দুর্ভোগ, ধনলিপ্সা, অতিথিসেবা, দান-ধ্যান।

- রাজার কোন সক্রিয়তা নেই। রাজা মৃগয়ায় বেরোন বটে তবে গল্পে তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। উল্টে রাক্ষসীর মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রাজা তাকে বিয়ে করে ফেরেন (সোনার কাটী রূপার কাটী)। সন্তান-জন্মের বৃত্তান্ত ('সাত ভাই চম্পা', 'কিরণমালা'), রাক্ষস-খোক্কস ধ্বংস ('নীলকমল আর লালকমল', 'সোনার কাটী রূপার কাটী') ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বা যেকোন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সঠিক বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রেও তিনি নিষ্ক্রিয় ('কলাবতী রাজকন্যা')।

- ''মেয়েরাই মুখ্যা যেন কথার ভিতরে। দুর্লভ্যা রাজকন্যারা, রানীদের আলোড়নেই কাহিনীর যত মুখরতা, তাঁরা অনায়াসে রাজ্যনাশ করারও ক্ষমতা রাখেন।''[৭১] 'কলাবতী রাজকন্যা'য় পাঁচ রানীই ন'রানী ও ছোটরানীকে বঞ্চিত করেছিল বলে কাহিনি গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। 'সাত ভাই চম্পা' ও 'কিরণমালা' গল্পে ছয় রানী ও দুই বোন রাজাকে বোকা বানিয়ে কাহিনির মোড় ঘুরিয়ে দেন। কাঁকণমালা দাসী থেকে রানী হয়ে বসে। 'শীত বসন্ত' গল্পের রাজা সুয়োরানীর কথায় ওঠেন আর বসেন। 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পে রাজা রাক্ষসীরানীদের হাতের পুতুল। তবে এই নারীদের সক্রিয়তার মূলে রয়েছে সতীনের প্রতি হিংসা, সহোদরার প্রতি ঈর্ষা, লোভ।

- নারীর অসম্মান বা অবমাননার ছবিও আছে। যেমন 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পের রাজার বক্তব্য চোরেরা যদি রাজপুরী ছেয়ে যায় তাহলে তিনি দেড় আঙ্গুলেকে রাজকন্যা দান করতে পারেন। কারণ 'কাণা কন্যা গেলেই কি, থাক্‌লেই কি।' আবার রাজকন্যাদের মতামতের তোয়াক্কা না করেই রাজারা নিতান্ত সম্পদের মতই পূর্ণ বা অর্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যাও দান করে দেন। যেমন 'নীলকমল আর লালকমল', 'পাতাল কন্যা মণিমালা'। 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পে শিয়াল ভাঙা হাঁড়ির বিনিময়ে কনেকে চাইলে বর বিনা বাক্য ব্যয়ে কনেকে দিয়ে দেয়।

- লোককথার অন্তর্গত রূপকথায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন চরিত্রের নাম থাকে না। অধিকাংশই 'এক যে ছিল রাজা'র কাহিনি। কিন্তু ব্যতিক্রম 'শীত বসন্ত', 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কিরণমালা' গল্পগুলো।

- কোন গল্পেরই বিয়োগান্ত পরিণতি নেই। শুরু ও শেষটা অনেকটা একই ধরনের।

- দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন— গল্পগুলোর মূল কথা।

- গল্পগুলো পড়তে গেলে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে। গল্পের চরিত্ররা কোথায় ছিল? কখন ছিল? সমুদ্র অরণ্য প্রান্তর রাজ্যের কোন মানচিত্র নেই। শুধু সংখ্যাতত্ত্বের সূচক— তিনবুড়ির রাজ্য, তেপান্তরের মাঠ, সাতসমুদ্র পার। মিখাইল বাখতিন তাঁর *Dialogic Imagination* গ্রন্থে 'chronotope' বা 'কালক্রমচিহ্ন'-এর কথা বলেন যার অর্থ স্থান ও কালের বিশেষ আয়তন। কিন্তু ''রূপকথা শুরু হয় এক অনির্দিষ্ট কাল ও স্থানের ইশারা দিয়ে। একদেশে এক রাজা ছিল।''[৭২] রূপকথার ভৌগোলিক অবস্থান বা কালক্রম চিহ্ন বোঝা যায় না। রূপকথা দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন: ''রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে। সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই।''[৭৩] আজকের সমালোচক বলেন সচেতনভাবেই দূরত্ব তৈরি হয় রূপকথায়। ''সমকাল থেকে দূরত্ব। বাস্তব থেকে দূরত্ব। রূপকথা হয়ে ওঠে প্রত্নকাহিনি।''[৭৪]

অথচ রূপকথার গল্পে অন্তর্নিহিত থাকে সমাজের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক অবস্থা বা অবস্থান। যেমন— রূপকথার গল্পে মাতৃপ্রধান সমাজের ছবি পাওয়া যায়। রাজপুত্ররা বড় বেশি মায়ের সন্তান (নীলকমল আর লালকমল, শীত-বসন্ত)। কিন্তু কখনো কখনো সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পাঁচ রাজপুত্র মানুষের পেটে পেঁচা আর বানর সন্তানের জন্মলাভ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে সিপাই জবাব দেয় যে ন-রানীর পেঁচা আর ছোটরানীর বানর সন্তান জন্মানোয় রাজা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। 'ভূতুম্ আর বুদ্ধু জানিল, তাহারাও রাজার ছেলে!' তারা পিতার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ছবি উঠে আসে। কোথাও কোথাও আবার পিতৃত্ব স্পষ্ট নয়। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'দেড় আঙ্গুলে'। সন্তানের জন্ম কীভাবে হল তা নিয়ে কোন সমস্যা দেখা যায় না।

বড় রানীদের সন্তানেরা দুর্বৃত্ত হলেও তাঁরাই যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী। ছোট রানীদের সন্তানেরা সুবোধ, শক্তিশালী হলেও রাজপুত্রের সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের বুদ্ধু-ভূতুম। 'শীত বসন্ত' গল্পে শীত ও বসন্ত দুয়োরানীর সন্তান বলে রাজভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ইঙ্গিত থাকলেও আবার কাহিনির শেষে যে রানীরা বা নারীরা শঠতা বা প্রতারণা করেন তাঁদের 'হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া' শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'সাত ভাই চম্পা', 'কিরণমালা'।

"পৃথিবীর অধিকাংশ রূপকথায় রয়েছে, রাজপুত্র অনেক বাধা পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল, তারপর বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পেল। সে আর পিতৃরাজ্যে ফিরে আসে না। রাজকন্যা পায় পিতার রাজ্য। তাহলে কি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্র রয়েছে রূপকথায়? রাজপুত্রের পিতৃরাজ্য পাবে অন্য এক রাজকুমার যে তার বোনকে বিয়ে করবে। এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে।"[৭৫]

রাজপুত্ররা সম্পূর্ণ বা অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভ করেন। এখানে রাজত্ব বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী কে হন— রাজকন্যা, নাকি তাঁকে যে রাজপুত্র বিবাহ করলেন তিনি, তা বোঝা যায় না। ('ঘুমন্ত পুরী', 'নীলকমল আর লালকমল')

> রূপকথার মধ্যে যথার্থই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সাংস্কৃতিক উপাদানের একত্র সমাবেশ হয়। ...চরিত্র ও ঘটনাস্থলের যে নামগোত্র বা পরিচয়-হীনতা... তাহার ফলে ইহারা অতি সহজেই দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছিল। ইহারা বিশেষ হইতে নির্বিশেষের স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল বলিয়াই, ইহারা প্রত্যেকের হইয়াও সকলের সামগ্রী হইতে পারিয়াছিল।[৭৬]

রাক্ষস-সমাজের দিকে তাকালেও রূপকথার অনেক বিশেষত্ব চোখে পড়ে। যেমন—

- রাজা যে পরমাসুন্দরী নারীকে বন থেকে এনে বিবাহ করেন সে এক রাক্ষসী। রাজা যেহেতু সাধারণ মানুষ তাই এই ছদ্মবেশ বুঝতে পারছেন না।

- মায়াবিনী রাক্ষসী রানী হওয়ার সূত্রে কখনো মানুষ কখনো বিভিন্ন প্রাণীর কাঁচা মাংস খেয়ে কোথাও যেন সভ্যতার ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়।

- রূপান্তরের ক্ষমতা রাক্ষস নয়, রাক্ষসীর আছে। কখনো হরিণীর মাথা, রূপসী নারী, কখনো পাশাবতী। যেমন— 'সোণার কাটী রূপার কাটী', 'ডালিমকুমার'।

- রাজার রাজত্ব রাক্ষসে ছেয়ে যাচ্ছে। ‘নীলকমল আর লালকমল’ গল্পে রাক্ষসী রানী অন্য রাক্ষসদের বলছে ‘আমি হেঁথা থাকি, তোঁরা দেশে যাঃ!’ হয়ত দেশটা একসময় রাক্ষসদেরই ছিল, কিন্তু পাকেচক্রে তারা বিতাড়িত হচ্ছে দক্ষিণে— সমুদ্রের ওপারে।

- রাক্ষসেরা কাছে থাকবে বলে দূরে আর দূরে যাবে বলে কাছে থাকে।

- ‘‘রাক্ষসীরা মারা যায় পেটের ছেলের হাতে। এই ছেলেরা অজেয় অবধ্য। দুর্ধর্ষ তাদের ব্যবহার। রাক্ষসরা কেন খোক্কসরাও এদের দেখে ভয় পায়। মানুষ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষস রক্তের এই যুবকের অভিযান মাতৃকুল ধ্বংসের মাধ্যমে শেষ হয়।”[৭৭] সেই মাতৃপ্রধান বনাম পিতৃপ্রধান সমাজের দ্বন্দ্ব এখানে বিদ্যমান। যেমন— ‘নীলকমল আর লালকমল’।

- ‘‘রাক্ষসী পরিচালিত সমাজ: আদি রাক্ষসী বুড়ি রয়েছেন। বন্দিনী রাজকুমারীকে সস্নেহে বলে— তোকেই সব দিয়ে যাবো। বর্তমান নেত্রী রাক্ষসী দূর দেশে মানুষের ঘর করছেন; রাত্রে স্ববেশ ধরে। যেন সে দেশ দখল করতে গোপনে গোপনে ষড় করে।”[৭৮] মূল ব্যাপার হল এরাই যে সমাজের নেত্রী তা বোঝা যায়। এদের অধীনে থাকেন কোন পরাজিত রাজ্যের রাজকন্যা। অথচ রাজকন্যা রাজপুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে রাক্ষসদের গোপন প্রাণ জেনে নিয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করছেন। যেমন— ‘সোনার কাটী রূপার কাটী’।

মাতৃতন্ত্রের ছবি এখানে থাকলেও দেখা যায় মেয়েরা ইচ্ছা করে মাতৃতন্ত্রকে ভেঙে দিচ্ছে। সমাজের ভেতরের ছবিটা দেখলে বোঝা যায় পশুপালক, পশুচারক, তারপর কৃষিকার্যের প্রচলক সমাজে নারীরা কৃষিকার্যে সক্ষম হচ্ছে না। এ দায়িত্ব নিচ্ছে পুরুষরাই। অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দিকে যাত্রা করছে। এখানে সমাজের সেই বিশেষ নৃতাত্ত্বিক কাঠামো পরিস্ফুট হয়।

তাই রূপকথার গল্পের শুরু ও শেষে ভৌগোলিক বা কালক্রমগত অস্পষ্টতা থাকলেও সেই কালকে খোঁজার আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা আছে। এর মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক (anthropological) অন্তর্বয়ন, সমাজের একটা স্তর থেকে আর একটা স্তর অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়ে যায়।

<u>সাহিত্যকৃতি</u>:

‘রূপকথা’ শব্দটা উচ্চারণ করলেই মনে আসে রূপ ও কথা। আর তখনই ‘‘চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠবে কল্পনার রূপ। ভয়াল, উত্তেজক, করুণ, ঝলমলানো। সঙ্গে থাকবে কথা— অর্থাৎ

আখ্যান।"[৭৯] *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র প্রত্যেক গল্পেই রূপ আর কথা হাত ধরাধরি করে রয়েছে। একদিকে যেমন মনের আয়নায় প্রতিটা বর্ণনা স্পষ্ট রূপ পায়, অন্যদিকে গল্প শুনতে শুনতে মন আবিষ্ট হয়ে যায়।

দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমা'র ঝুলি* রচনার পেছনে ছিল এক বিশেষ সময়ের বাঙালি, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার স্বরূপ সন্ধান ও দর্শন। তবে দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একথা ভাবতে হবে "যে যুগে তিনি এই রূপকথা সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন সেই যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সমস্ত বাঙলাদেশে, একটা 'উন্মত্ততা' চলছিল, সে উন্মত্ততা জন্ম দিয়েছিল স্বাদেশিকতার, উদ্বোধিত করেছিল নূতন সাহিত্য-সাধনাকে।"[৮০]

বাংলার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ 'মাতৃভাষার ভাণ্ডারে' উপহার দেওয়ার যে অপরিসীম উৎসাহ তার মূল উৎসধারা থেকে উৎসারিত হয়েছিল 'দেশজননীর স্নেহধারা'। ফলে সে যুগের 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-এর মূলেও ছিল আবেগের বন্যা। তাই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানের সংরক্ষিত সংকলিত সংরচিত সাহিত্যে যে আবেগপ্রবণতা - ভাবাবেগের অতিরঞ্জন থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

যাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়, যারা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত তারা যে চিরদিনই মুখ বুজে সব সইবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। তাই সেই সময় অধিকাংশ মানুষই রাজতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা— যাই বলা হোক না কেন তাকে ভেঙে ফেলার মধ্যেই 'আত্মশক্তির সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা' এমন ধারণা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বিগতগৌরব হতশ্রী দেশের অরাজক দিনগুলোতে কোন অভিযোগের তীর না ছুঁড়ে তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, "ছোট আরম্ভের" জন্য। সৌহার্দ্যের আদর্শকে পুঁজি করে সাহিত্য-আরাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যে অতি আবেগের প্রতিফলন, শেষ না হওয়া অনেক লড়াইয়ের রেশ, অতীতচারণ ও অগ্রগমন যতই থাক সেগুলোকে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখাটা ঠিক নয়।

ঠাকুরদাদার ঝুলি-র ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'রূপকথা' *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-কে বলেছেন 'শিশু-সাহিত্য'। 'দেশের ছেলে-মেয়েদের সহজ কল্পনার পূর্ণ বিকাশে' এর সৃষ্টি। 'রূপকথার কল্পনা— সদ্য ঊষার শিশির সিক্ত ফুলের মত মনোরথ'। "রূপকথা মায়ের আঁচলের সুলভ বাতাসের মত দেশের গৃহ সহজে শীতল করিয়া দেয়।" এ হল 'গল্পের অফুরন পুষ্পডালা' যা 'সর্ব্বজনকে উৎফুল্ল করে'।

> এক শিশুর নিজের কল্পনায় ভর করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেতে কতক্ষণ। বন্ধুত্ব করতে কতক্ষণ লাগে সাত ভাই চম্পা আর পারুল বোনের সঙ্গে? বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, চ্যাং-ব্যাং, শিয়াল পণ্ডিত, সুখু আর দুখু বা সাড়ে সাত চোরের সঙ্গে?
>
> বাঙালি শিশুর এই তো শিশু থাকা এবং বড় হওয়া। পৃথিবীর সব মানুষই তো শৈশবে এক, বয়সে বয়সে ভিন্ন। পৃথিবীর লোককথায় এক, শহুরে কথায় ভিন্ন।[৮১]

তাই দাদু-দিদা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, মা-মাসিদের গল্প বলার আসরকে ফিরে আসতেই হবে।

'*ঠাকুরমা'র ঝুলি*-তে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই, ভালোরা কষ্ট পাচ্ছে ও মন্দরা রাজত্ব, অধিকার— এসব ভোগ করছে। তবে এই ছবি দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ লেখকের উদ্দিষ্ট 'মা যা হইয়াছেন' নয়, ববং 'মা যা ছিলেন' এবং 'মা যা হইবেন'। তাঁর অভীপ্সা আজকের লাঞ্ছিতা ভারতমাতা, যিনি ছিলেন একসময়ের সম্পন্না দেশজননী তিনি আগামী দিনে হবেন জগদ্ধাত্রী। আর নীলকমল লালকমল এই পরিবর্তনের—আগামীর স্বপ্ন পূরণের রূপকার। নীলকমল আর লালকমল, কিরণমালা, বুদ্ধু-ভূতুম্ এঁরা যেন বাঙালির সুপ্ত চেতনার দাঁড়ে দোল দেয়; দেশবাসীকে বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসাহিত্যের জোয়ারে ভাসতে আবাহন জানায়। সাত ভাই চম্পা ''কি ডাক দেয় পলাশীর রক্তভেজা আমকুঞ্জে দাঁড়িয়ে— ডাক দেয় কি শত সিপাহী বিপ্লব অথবা শত দুর্দিনের শত বিপর্যয়ের ওপার থেকে? ডাক দেয় কি বাহান্নের ভাষা আন্দোলনে— রক্তপিছল একাত্তরে? যেন কোন দূর অতীত থেকে— আমাদের কোন সুবর্ণ শৈশব থেকে— কারা যেন ডাকে— ডাকে 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে'।''[৮২]

বোনের করুণ ডাকে সকল ভারত-ভ্রাতা যদি সাড়া দেয় তাহলে হয়ত যুগান্তর সঞ্চিত লজ্জার ইতিকথা চাপা পড়তে পারে।

তাই 'ঝুলি'র কাঠামো নড়বড়ে হলেও একথা মানতেই হবে 'কথা'র 'ঘুম ঘুম ঘুম,/— সুবাস কুম্ কুম্' যাদুকরী পরিবেশ সৃষ্টিতে *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র জুড়ি মেলা ভার। 'বাঙ্গালার রূপকথা'র প্রসাদপুষ্ট হয়ে বঙ্গবাসী ধন্য হয়ে গেছে। বাংলার শিশুরাও 'ঝুলি'কে অবলম্বন করে 'শয়ন-রাজ্যে পুনর্ব্বার' নিজেদের কল্পলোকের অধিকার নিয়ে সগৌরবে বিরাজ করতে থাকুক।

তথ্যসূত্র ::

১. Stith Thompson, *The Folk tale*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977, p. 21

২. Maria Leach edited *Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*, Vol. I, Funk & Wagnalls Company, New York, 1949, pp. 408-409

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪

৪. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৯

৫. Stith Thompson, *The Folk tale*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977, p. 415

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৬৮

৭. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal*, Calcutta, 1920, p. 232

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯-১০

৯. Sankar Sengupta, *Folklorists of Bengal*, Indian Publications, Calcutta-1, India, First Print February 1965, p. 115

১০. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমা'র ঝুলি : অতীত না ভবিষ্যপুরাণ?', আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২১শে মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯

১২. Sankar Sengupta, *Folklorists of Bengal*, Indian Publications, Calcutta-1, India, First Print February 1965, p. 115

১৩. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৪৫

১৪. বারিদবরণ ঘোষ, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১৫. সুনন্দা শিকদার, *দয়াময়ীর কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮,পৃ. ৬৪-৬৫

১৬. Ashraf Siddiqui, *Folkloric Bangladesh*, Bangla Academy, Dacca, First edition December 1976, p. 18

১৭. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৫

১৮. মলয় বসু, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৪০

১৯. মাধবী দে, *শান্তা দেবী ও সীতা দেবী / জীবন সাহিত্যে আধুনিকতা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৮৪

২০. তিমির বরণ চক্রবর্তী, *বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৭শে মার্চ ২০০২, পৃ. ১৩০

২১. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতি চর্চা*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯

২২. তদেব, পৃ. ১৩

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১

২৪. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমার ঝুলি', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৪৫-১৪৬

২৫. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমা'র ঝুলি ঃ অতীত না ভবিষ্যপুরাণ?', আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২১শে মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯

২৬. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৪৪৬

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২

২৮. উইলিয়াম কেরী সংকলিত *ইতিহাসমালা*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮১২; গাঙচিল সংস্করণ জুন ২০১১, পৃ. ১৯

২৯. Rev. Lal Behari Day, *Folk Tales of Bengal*, Book Society of India Limited, Calcutta, First Edition 1883; Reprint 1970, p. 24

৩০. Ibid, p. 71

৩১. Ibid, p. 93

৩২. Ibid, p. 260

৩৩. Ibid, p. 67

৩৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ক্ষীরের পুতুল', *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৪, পৃ. ৩২

৩৫. লীলা মজুমদার সম্পাদিত *উপেন্দ্রকিশোরসমগ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২৮শে আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১৯৫

৩৬. শান্তা দেবী সীতা দেবী, *হিন্দুস্থানী উপকথা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪১-৪২

৩৭. তদেব, পৃ. ৬৩

৩৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা*, ১ম সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩-২৬; প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩০৯

৩৯. তদেব, পৃ. ১১

৪০. Ashraf Siddiqui, compiled and edited *Tales from Bangladesh* (collected by A.Britisher), Bangladesh Books International Limited, Dhaka, First published in February 1976, p. 5

৪১. Ibid, p. 13

৪২. Ibid, p. 14

৪৩. Ibid, p. 5

৪৪. লীলা মজুমদার সম্পাদিত *উপেন্দ্রকিশোরসমগ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২৮শে আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১৯৭

৪৫. তদেব, পৃ. ১৯৫

৪৬. Maria Leach edited *Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*, Vol. II, Funk & Wagnalls Company, New York, 1950, p. 1137

৪৭. Ibid, p. 753

৪৮. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৯৩

৪৯. Stith Thompson, *Motif Index of Folk-literature,* Vol. I, Indiana University, Bloomington, Revised and Enlarged Edition, September 1955, p. 10

৫০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৬৬

৫১. Sir James Frazer, *The Golden Bough/ A History of Myth and Religion,* Chancellor Press, London, 1994, p. 679

৫২. Ibid, p. 681

৫৩. মানস মজুমদার, *লোকসাহিত্য পাঠ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬৬

৫৪. মলয় বসু, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথাচর্চা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৭৯

৫৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মিখাইল বাখতিন ঃ উপন্যাসতত্ত্ব*, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৫

৫৬. তদেব, পৃ. ৫৭

৫৭. তদেব, পৃ. ৮৩

৫৮. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমা'র ঝুলি : অতীত না ভবিষ্যপুরাণ?' আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২১শে মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯

৫৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মিখাইল বাখতিন ঃ উপন্যাসতত্ত্ব*, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬৩

৬০. V. Propp, *Morpholgy of the Folktale*, The American Folklore Society and Indiana University, University of Texas Press, Austin & London, Second Edition 1968, p. 21

৬১. Ibid, p. 20

৬২. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি*, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮২, পৃ. ১১

৬৩. Claude Levi- Strauss, *Structural Anthropology,* Vol. II, Penguin Books, First Published in the U.S.A., 1976, p. 121

৬৪. ঈশা পাল, 'রূপকথার সংগঠন ঃ একটি বৈশ্বিক তত্ত্ব বনাম ঠাকুরমার ঝুলি', কথক-৭, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৪

৬৫. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১২৮

৬৬. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা সংস্করণ আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৫০

৬৭. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *শাক্ত পদাবলী*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১১০

৬৮. আশ্রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা সংস্করণ আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৭৫

৬৯. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলি,* গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৭

৭০. বাণী বসু, 'রূপোকথা নয় সে নয়', শিলাদিত্য, মাসিক সাহিত্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩২

৭১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমার ঝুলি', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৫০

৭২. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *মিখাইল বাখতিন ঃ উপন্যাসতত্ত্ব,* বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৫০

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজপুত্তুর', *লিপিকা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ; সংস্করণ পৌষ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪

৭৪. অভীক মজুমদার, 'বিশ্বরূপকথা', শিলাদিত্য, মাসিক সাহিত্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ২৩

৭৫. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *লোককথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃ. ১৩১

৭৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৭৬

৭৭. অচিন্ত্য বিশ্বাস, *লোকসংস্কৃতি বিদ্যা,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১১২

৭৮. তদেব

৭৯. অভীক মজুমদার, 'বিশ্বরূপকথা', শিলাদিত্য, মাসিক সাহিত্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ২২

৮০. মলয় বসু, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথাচর্চা,* কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৭৮

৮১. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, 'ঠাকুরমার ঝুলি', আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ৩০শে মে ২০১৫, পৃ. পত্রিকা ১ ও ৩

৮২. আশ্রাফ সিদ্দিকী, *বাংলার মুখ,* নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২

৮. অষ্টম অধ্যায়

রসকথা

বাংলা শিশু-সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের এক অভিনব সৃষ্টি *দাদামশা'য়ের থলে* (১৯১৩) যাকে তিনি 'বাঙ্গালার রসকথা' বলেছেন। এটা 'হাস্যরসের রূপকথা বা লোককথাধর্মী কাহিনী সঞ্চয়ন'।

দাদামশা'য়ের থলে-কে দক্ষিণারঞ্জন 'রসকথা' কেন বলেছেন একথা আলোচনার পূর্বে 'রসকথা' বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। 'রসকথা' হল রসের কথা, বৈঠকী গল্প, খোশগল্প বা শুধু গল্প। ‘‘পশ্চিমী সংস্কৃতি বলয়ে এই ধরনের গল্পের নানান্ অভিধা প্রচলিত: হিউমারাস টেল, নামস্কালস টেল, টলটেল, ট্রিকস্টার টেল ইত্যাদি। বাংলায় এগুলিকে সভাকথাও বলা হয়ে থাকে। ...রসকথার উপাদান মূলত তিনটি : বোকামি, লোভ এবং যৌনতা । মিথ্যাভাষণ, আলসেমি, ন্যাকামি প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও হাসির গল্পের মশলা জোগায়।’’[১] 'রঙ্গকথা' বা 'রসকথা' নামে লোককথার কোন স্বতন্ত্র বিভাগ থাকার প্রয়োজন নেই—এমন ধারণাও অনেকে পোষণ করেন। তাঁদের মতে বেশিরভাগ উপকথা বা Animal Tale হাস্যরসে পরিপূর্ণ। পশু-পাখির নির্বুদ্ধিতা বা কোন নীতি প্রচারক উপকথাতেও হাস্যরস থাকে। তাই Humorous Tale বা রঙ্গকথাও উপকথারই অংশ। তবে যেসব কাহিনিতে পশুপাখির চরিত্র নেই সেখানে নরনারীর চরিত্রের মাধ্যমেই হাস্যরস উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই বোঝা যায় উপকথার সংজ্ঞা Animal Tale-এর মত সংকীর্ণ নয়, বরং বহু বিস্তৃত। ‘‘ইংরেজিতে লোক-কথার এই বিশেষ অংশের জন্য Animal Tale-এর মত একটি সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই Humorous Tale সংজ্ঞা দ্বারা ইহার অবশিষ্ট অংশটি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু উপকথা সংজ্ঞাটি ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক বলিয়া ইহা দ্বারা Animal Tale ও Humourous Tale উভয়ই বুঝাইতে পারে; অতএব রঙ্গকথার জন্য বাংলায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগের কোনও প্রয়োজন নাই।’’[২] যাইহোক দক্ষিণারঞ্জন যখন স্বয়ং 'রসকথা' নামে লোক-কথার পৃথক বিভাগ করেছেন, তখন তাই-ই আমাদের আলোচ্য।

আচার্য দীনেশচন্দ্র বাংলার রসকথা সম্পর্কে বলেছেন—

> …folk-tale in Bengal consists of those in which there is an attempt at humour. These may not be often too pointed and subtle, but they show the power of appreciating humorous situation by the rural-folk in their own simple way. They call up associations of merry laughter of children and smiles on the bashful lips of youthful women.[৩]

—এই উদ্ধৃতি থেকে রসকথার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উঠে আসে— রসকথা তির্যক বা দুর্বোধ্য নয়, বরং বাংলার লৌকিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সহজ-সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই এই রসের উৎসার। 'বাংলার হাসির সায়র', 'বাঙ্গ্লা মা'র — ভোরের হাসির ফুল' *দাদামশা'য়ের থলে* নির্মল হাস্যরসের আধার।

কারো মতে ''বাংলায় একরূপ গল্প আছে, যাকে 'গাঁজাখোরী গল্প', ইংরেজিতে 'Tales of lying' বলা যায়।''[৪] রসকথাকে তারা গালগল্পের পর্যায়ে ফেলেছেন। যাই হোক রসকথা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেছে। এই 'কথা'র বিষয়বস্তু বিশ্বাস্য হোক বা অবিশ্বাস্য হোক একটা ব্যাপারে সকলেই একমত যে এই গল্পগুলো হাস্যরসোদ্দীপক, নির্ভার। এই রসকথায় 'বিশ্বজনীন প্রকরণ' ও উদ্দেশ্য তেমন থাকেনা বললেই চলে। একটা ব্যাপারে সবাই সহমত— ''A very considerable proportion of the legendary stories among any people is made up of simple jests and anecdotes, sometimes of human beings and sometimes of animals, and consisting of but a single motif.''[৫]। জাতি, বসতি, পেশা, ভাষা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রসকথার জন্ম হয়ে থাকে। অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ টমসনের টাইপ-সূচিতে এই রসকথার মোট ৯০০ প্রকার কাঠামোর কথা উল্লেখিত, তবে বাংলা রসসাহিত্যে এছাড়াও কিছু ধরনের খোঁজ মিলেছে।

কেন রচনা :

বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণের আকাশ জুড়ে হাসির রোল তোলার জন্যই দক্ষিণারঞ্জনের *দাদামশা'য়ের থলে* রচনা। তিনি বঙ্গবাসীর মুখে মধুর হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থে তাই তিনি হিতোপদেশকে রসকথার সরস মোড়কে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালিকে তিনি

রসকথারূপ ‘নানা ফুল পল্লবের তোড়া’ উপহার দিয়েছেন। ‘‘সভায়, বৈঠকে, মজলিশে, অন্দরে, পাঠশালে, খেলাঘরে, ক্ষেত্রে, পথে, বিপণিতে বাঙ্গালীর শিশু-কিশোর, নৃপতি, শ্রমী, যুবা, বৃদ্ধ, পুরমহিলা, দেশের সব বয়সের ও সব শ্রেণীর নরনারীর দিন রাত্রি ছিল সেই ফুলের গন্ধে বিভোর, ফুল-গন্ধে জাগা।’’[৬] বোঝা যায় এই গন্ধে সর্বসাধারণের অধিকার ছিল। দক্ষিণারঞ্জন এ রস থেকে কাউকে বঞ্চিত করেননি। এই রসকথার মাধ্যমে তিনি ‘নিত্যোৎসময় ক্রীড়াক্ষেত্র’ রচনা করে দিয়েছেন। বাঙালির হৃদয়ে হাসির স্বর্গ রচনা করতে, বাংলার ‘লাল টুক্ টুক্ মুখগুলিতে’ ‘হাজার অমল চাঁদের হাসি কমল’ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর সবচেয়ে বড় কারণটা ‘উৎসর্গ’ অংশে জানিয়েছিলেন—

> ‘দাদামশা’র থলে’ ভরা অমল হাসির রাশি,
>
> চাঁদের দেশের ঢেউয়ের হাসা ক্ষীর-সায়রের বাঁশি!
>
> হাসিতে দেয় ভ’রে দেশ; হেসে জুড়ায় প্রাণ!
>
> ভাসিয়ে দে’ যায় সুধার ধারায়— যতেক অভিমান।’

<u>উৎস</u>:

দাদামশা’য়ের থলে-র গল্পগুলোও ঢাকা ও ময়মনসিংহের গ্রাম-গঞ্জের বৃদ্ধাদের অভিজ্ঞতার আঁচড়ে, গ্রাম-বৃদ্ধদের কথকতার অসামান্য ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কত শত বছরের পুরনো যেসব গল্প-কথা, ঠাট্টা-রসিকতা মৌখিক পরম্পরায় নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছিল দক্ষিণারঞ্জন এই গ্রন্থেও তাকেই বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

<u>নামকরণ</u>:

বাংলার রসকথা পরিবেশন করতে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন গ্রন্থনাম দিলেন *দাদামশা’য়ের থলে*। ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা, ঠানদিদি— কারো নয়, এই থলে দাদামশায়ের। যেহেতু রঙ্গ-রসিকতার ব্যাপার, তাই বোধহয় দাদামশায়ের ওপরে সেই রস বণ্টনের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘দাদামশায়’ নামটার সঙ্গেই অম্ল-মধুর, ঠাট্টা-হাসির সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

<u>গ্রন্থ-বিভাগ</u>:

দাদামশা'য়ের থলে-র চারটে বিভাগ— রসগোল্লা, আ'ক, গুড়-তেঁতুল আর চুমো। 'রসগোল্লা' অংশে তিনটে গল্প আছে— 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী', 'সওদাগরের সাত ছেলে', 'নূতন জামাই'। 'আ'ক' অংশে আছে তিনটে গল্প— 'বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান', 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী', 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো'। 'গুড়-তেঁতুল' অংশে রয়েছে 'সরকারের ছেলে' আর 'চুমো' অংশে 'রাজপুত্র'-এর গল্প'। মোট আটটা গল্প আছে।

<u>বিষয়বস্তু</u>:

'**হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী**': একদেশে হবুচন্দ্র রাজা আর তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিলেন। দুজনের 'বুদ্ধির চোটে' রাজ্যশুদ্ধ লোক অস্থির। রাজার মন্ত্রী শূকর দেখে বলেন মাহুত বেটারা খেতে না দেওয়ায় রাজার হাতি শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, কখনো বলেন রাজবাড়ির ইঁদুর রাজভাণ্ডার লুটে খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। কতগুলো বিদেশি রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে রান্নার জন্য উনুন খুঁড়তে বসলে মন্ত্রী বলেন তারা পুকুর চুরি করছে। মন্ত্রীর কথায় রাজা মাহুত, রাজবাড়ির সিপাই, বিদেশিদের সকলকে শূলে দিলেন। এক সন্ন্যাসী আর তাঁর শিষ্য সেই দেশে এলে 'মুড়ি-মিশ্রির সমান দর' দেখে সন্ন্যাসী সেখান থেকে চলে যান। কিন্তু সস্তায় ভালো খাওয়ার লোভে গুরুর নিষেধ অমান্য করে শিষ্য সে দেশে রয়ে যায়। একদিন সিঁদ কাটতে গিয়ে দেয়াল চাপা পড়ে এক চোর মারা যায়। এই ঘটনায় কোতোয়াল একে একে যার বাড়িতে চোর চুরি করতে গিয়েছিল সেই গৃহস্থ, তার বাড়ির দেওয়াল তুলেছিল যে মালী, মাটি ছেনেছিল মালীর যে মামাত ভাইয়ের পিসতুতো ভাই, কলসী গড়েছিল যে কুমোর, কলসী পোড়ানো হয়েছিল যে কাঠে সেই কাঠকুড়ানি বুড়ি, বুড়ি আবার যে কাঠুরের কাঠ বেচে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। প্রত্যেকেই নিজের ঘাড় থেকে দোষ ঝেড়ে ফেলে। শেষপর্যন্ত কাঠুরেকেই প্রকৃত অপরাধী বিচার করে তাকে শূলে দেওয়া হবে ঠিক হয়। কিন্তু কাঠুরের গায়ে একটুও মাংস না থাকায় সে শূলে বেঁধে না। মন্ত্রী পরামর্শ দেন রাজ্যের সবচেয়ে মোটা মানুষকে শূলে দিতে হবে। কোতোয়াল আর জল্লাদ তখন গুরুর সেই শিষ্যকে ধরে আনে। ভয়ে আধমরা শিষ্য গুরুকে স্মরণ করে। কোথা থেকে সন্ন্যাসী এসে বলেন মাহেন্দ্রক্ষণে পোঁতা শূলে সশরীরে স্বর্গবাস হবে, তাই তিনিই শূলে চড়বেন। কিন্তু এমন সুবর্ণসুযোগ রাজা হারাতে চান না। তিনিই শূলে

চড়বেন ঠিক করেন, মন্ত্রী যারপরনাই দুঃখিত হয়। রাজাকে 'বিকট বিষম মূর্তি' ধরে স্বর্গে যেতে দেখে ভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে মন্ত্রী এক অন্ধকূপে পড়ে যান এবং নীচে মাথা উপরে পা করে কূপের তলায় নামতে নামতে ভাবেন স্বর্গ না হোক তিনি পাতালে চলেছেন। শিষ্য নিজের ভুল বুঝতে পারে।

'সওদাগরের সাত ছেলে':এক সওদাগরের সাত ছেলে ছিল। তারা সকলেই মূর্খ, শত চেষ্টাতেও সওদাগর তাদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন না। 'রাজা রাজা' খেলতে গিয়ে রাখালেরা তাদের বোকা বানায়, সাত ভাই-ই কেবল চোর হয়। রোজ রোজ কানমলা খেয়ে তারা ঠিক করে তারা পাঠশালাও যাবে না, খেলবেও না, গাছে পাখির ছানা পাড়বে। কিন্তু খুব আগডালে ছানা পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে একে অপরের ঘাড়ে পড়ে নাকাল হয়। এরপর একদিন সওদাগর মারা যান। সাত ভাই ঠিক করে ঘোড়ার ব্যবসা করবে। ঘোড়ার ডিম কিনবে, ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে বড় হলে বাজারে বিক্রী করবে। তারা বাজারে ঘোড়ার ডিম কিনতে যায়। সেখানে এক সেয়ানা লোক ঘোড়ার ডিম বলে কতগুলো চালকুমড়ো তাদের বিক্রী করে এবং বলে জঙ্গলে গিয়ে পুঁতলে পাঁচদিন পর বাচ্চা হবে। জঙ্গলে পুঁতলে পাঁচ দিন যেতে না যেতে কুমড়ো পচে গন্ধ বেরোলে শিয়ালেরা মজা করে খেতে থাকে। নির্বোধ সাত ভাই মনে করে ডিম থেকে ঘোড়ার বাচ্চা হয়েছে। তারা বাচ্চাগুলোকে ধরতে গেলে শিয়ালের দল পালিয়ে যায়। নদীর পাড়ে সাত ভাই তখন কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে বাদ দিয়ে বাকিদের গুণতে গিয়ে ভাবে এক ভাই হারিয়ে গেছে। সেখানে এক চতুর কৃপণ ভদ্রলোকের বাড়ি। তিনি বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেবেন বলে তাদের বাড়িতে নিয়ে যান। বাগান পরিষ্কার করতে দিলে তারা ভাল-মন্দ সব গাছ পরিষ্কার করে ফেলে, বাগানে আর একটাও গাছ থাকে না। বিতাড়িত সাত ভাই তেলের ব্যবসা করবে ঠিক করে এবং কলুবাড়িতে তেল কিনতে যায়। ফেরার পথে কার কলসীতে তেল বেশি আছে দেখতে গিয়ে সব কলসীতে ঠোকাঠুকি লেগে সব তেল পড়ে যায়। তারা আবার ধার করে তেল কেনে। তারা রোজ তেল বিক্রী করে, ফলে তেল কমে। কিন্তু সাত ভাই ভাবে চোরে তেল চুরি করে, তাই তেল পাহারা দেয়। কিন্তু তেলের মধ্যে নিজেদের ছায়া পড়ে। তাই দেখে চোর মনে করে তাকে মারতে গিয়ে কলসী ভেঙে যায়, তেলে ঘর ভাসে। পথে এক চোরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় চোর বলে সে তেল চুরি

করেনি, ইঁদুরেরা খেয়েছে। ইঁদুর ধরে মারতে গিয়ে 'সাত লাঠি সাত ভাইয়ের ঘাড়ে'। হাড়গোড় ভেঙে গিয়ে তারা শয্যাশায়ী হয়। তেলের ব্যবসা করবে না জানাতে গেলে কলু তাদের চোখে ঠুলি দিয়ে ঘানিগাছে জুড়ে দেয় আর ঘানির বলদ বেচে তেলের দ্বিগুণ দাম আদায় করে। ঘানিঘরে মশা মারতে গিয়ে কলু তাদের মারছে মনে করে একে অপরকেই প্রহার করে বসে, ঘানি ভেঙে যায়। ক্রুদ্ধ কলু তাদের তাড়িয়ে দেয়। রাজবাড়ির ঘেসেড়ার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে তাদের কাজ দেয়। সাত ভাই মনের সুখে ঘাস কাটতে শুরু করে।

'নূতন জামাই': এক 'নূতন জামাই'। দিব্যকান্তি চেহারা, কিন্তু বুদ্ধিতে রসগোল্লা। আমন্ত্রিত জামাই শ্বশুরগৃহে যাবে, তাই মা তাকে বললেন 'কিছু মিছু' উপহার নিয়ে যেতে। আর শিখিয়ে দেন উঁচু আসনে বসতে, কোকিলের মত মিষ্টি স্বরে কথা বলতে, হেঁট মুখে বসে থাকতে, চেয়ে না খেতে, যা দিতে আসবে সবেতে 'না' বলতে। ছেলে সেসব কথা মুখস্থ করতে করতে যায়। পথে এক বাজারে 'কিছুমিছু'র খোঁজ করলে অবশেষে এক চালাক দোকানী জামাইকে মানকচু দেয়। জামাইও গোটা বাজারে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে দোকানীর কাছে পাওয়ায় ভাবে না জানি 'কিছুমিছু' কত ভালো জিনিস! সাতদিন পর্যন্ত মুখ চুলকোবে শুনে সে আরও খুশি হয়। কিছুমিছু নিয়ে জামাই ক্লান্ত হয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছালে 'শ্যালা-শ্যালী'রা ভাবে 'নূতন জামাই' বেশ রসিক। সকলে তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে থাকে। জামাইকে সদর ঘরে পরিষ্কার বিছানায় বসতে দেওয়া হলে মায়ের কথামত উঁচু আসনে বসবে ভেবে বাড়ির ধারের মাঠে শটির জঙ্গলের কাছে উই-ঢিবিতে গিয়ে বসে। সকলে তখন খুঁজতে খুঁজতে জামাইকে সেখানে দেখে জামাইয়ের উপযুক্ত আসন দেওয়া হয়নি মনে করে লজ্জিত হয় এবং এক ঘরে পালঙ্কের ওপর তোশক, বালিশ দিয়ে উঁচু আসন করে দেয়। সেখানে নূতন জামাই ভালো করে বসতে না পেরে মাচার ওপর গিয়ে বসে থাকে। রান্না হয়ে যাওয়ায় সকলে জামাইকে খুঁজতে এসে কোথাও খুঁজে পায় না, শুধু কোকিলের ডাক শোনে। তারপর দেখতে পেয়ে ভাবে জামাই খুব 'আমুদে'। খেতে বসে পেটে ক্ষিধে থাকা সত্ত্বেও জামাই কিছুই বেশি খায় না, চায়ও না। থালায় সব পড়ে থাকায় শাশুড়ি অবশেষে মিষ্টি নিয়ে আসেন। জামাই মায়ের কথামত 'না না' করতে থাকে। শাশুড়ি জোর করে থালায় একটু দেন। জামাই মুখে দিয়ে দেখে খাসা! কিন্তু চাইতেও পারে না। রাত্রিবেলায় সকলে ঘুমিয়ে পড়লে জামাই ঠিক করে সেই অপূর্ব জিনিস

আর একটু খেয়ে দেখবে। ভাবে এ নিশ্চয়ই ‘কিছুমিছু’ দিয়ে তৈরি। রান্নাঘরে গিয়ে সেই মিষ্টির হাঁড়িতে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। মিষ্টি না পেয়ে ভারি রাগ করে মাথা বের করতে যায়, কিন্তু বেরোয় না। হাঁড়ি-ঢাকা মুখে অন্ধকারে কিছু না দেখতে পাওয়ায় সব বাসনপত্র ধাক্কা লেগে পড়ে যায়। সকলে চোর মনে করে লাঠি নিয়ে এসে একটা তার পিঠে আর একটা হাঁড়ির ওপর আঘাত করায় হাঁড়ি ভেঙে যায়। সকলে ‘নূতন জামাই’কে দেখে লজ্জিত হয়ে পালায়, জামাইও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে রওনা দেয়।

‘**বাইশ-জোয়ান আর তেইশ জোয়ান**’: এক ছিল বাইশ-জোয়ান। সে বাইশ মণ চালের ভাত খায়, তার গায়ে বাইশ জন জোয়ানের জোর। আর এক ছিল তেইশ-জোয়ান। সে তেইশ মণ চালের ভাত খায়, তার গায়ে তেইশ জন জোয়ানের জোর। দুজনেই ভাবে তাদের মত জোয়ান আর নেই। একদিন বাইশ-জোয়ান, তেইশ-জোয়ানের সন্ধানে বেরিয়ে জলযোগ সারার পর এক পুকুরের জল খেয়ে ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। এক বুনো হাতি রোজকার মত সেই পুকুরে জল খেতে এসে জল না পেয়ে বাইশ-জোয়ানের পাহাড়ের মত ভুঁড়ির ওপর দুই পা তুলে রাগে গর্জন করতে থাকলে বাইশ-জোয়ানের পেটের সব জল বেরিয়ে যায়। বিরক্ত বাইশ-জোয়ান এক চাপড়ে হাতিটাকে কাৎ করে ফেলে। তারপর তেইশ-জোয়ানের বাড়িতে ছোটে। সেখানে গিয়ে তর্জন-গর্জন শুরু করে। কিন্তু তেইশ-জোয়ানের মেয়ে, হুমো বিড়াল মাটি আঁচড়াচ্ছে মনে করে। বাইশ-জোয়ান তালগাছ ধরে দাঁড়িয়ে তা দিয়ে লাঠি বানাবে বললে মেয়েটা বলে তার বাবা তা দিয়ে দাঁত খড়্‌কে করে। তারপর দুই জোয়ানের দেখা হয় এবং তারা লড়াই শুরু করে। পথে এক বুড়ি তাদের দেখে ছোকরারা খেলা করছে ভেবে তাদের সরে যেতে বলে। কিন্তু তারা লড়াই করছে শুনে বুড়ি তাদের কাঁধের ওপর তুলে রাখে। বুড়ির ছেলে মোষ চরাচ্ছিল। বুড়ি সেই মোষগুলোকে ট্যাঁকে রেখে দিয়ে জ্বরে কাতর ছেলেকে আঁচলের কোণে বেঁধে পিঠে নিয়ে চলতে থাকে। এক চিল ওপর থেকে ইঁদুরের বাচ্চা মনে করে সব শুদ্ধ বুড়িকে আকাশে তুলে নিয়ে যায়। এক দেশের রাজকন্যা সখীকে নিয়ে ছাদে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে কি যেন পড়াতে সখী দেখে বলে ধুলোবালি নয়, পোকা-টোকা হবে। চোখ থেকে বের করে সে-ই চিল, বুড়ি, তার ছেলে, দুই জোয়ান, গরু আর মোষগুলোকে দেখতে পায়। তারা রাজকন্যার চোখের জলে সাঁতার কেটে ক্লান্ত। এদিকে

সেই থেকে রাজকন্যার চোখের অসুখ সারে না। একজন বলে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে কপিলা গাইয়ের দুধ এনে চোখ ধোয়ালে অসুখ সারবে। প্রকাণ্ড এক ঢাল আর বল্লম নিয়ে রাম সিং সিপাই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গিয়ে পার করার জন্য হাঁক ছাড়লে সেদেশের মশা মাঝি এক তুষের নৌকায় তাকে পার করে দেয়। অবাক সিপাই কপিলা গাইয়ের দুধ নিয়ে আবার পার হয়ে ফিরলে তা দিয়ে চোখ ধোয়াতে রাজকন্যার চোখ ভাল হয়। রাম সিং জানায় সেখানে সে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি দেখে এসেছে। রাজা সৈন্যসামন্তসহ সেই কাঁকুড় আনতে যান, সেই তুষের নৌকায় পার হন। তারপর কাঁকুড়ের চারদিক ঘুরে দেখতে সন্ধ্যা হয়। বিচি আর দেখা হয় না। সকলের ক্ষিধে পাওয়াতে একটু কাঁকুড় কেটে সকলে পেটভরে খান, রাতে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা কাঁকুড়ের মধ্যে শুয়ে পড়েন। রাত্রে ঝড়ে কাঁকুড় সমুদ্রে পড়লে এক রাঘব-বোয়াল কাঁকুড় গিলে ফেলে। সেই থেকে রাজা সৈন্য সামন্ত সহ কাঁকুড়ের মধ্যেই থাকেন। ক্ষিধে পেলে কাঁকুড় খান। একদিন এক জেলে মাছটা ধরে বাড়ি নিয়ে গেলে জেলেনী মাছ কেটে দেখে কাঁকুড়! কাঁকুড় কাটতেই রাজা সৈন্যসামন্ত সহ বেরিয়ে পড়লে জেলে জেলেনী পিঁপড়ে ভেবে ফেলে দেয়। রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে সত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশ সাতষট্টি বছরে দেশে ফিরে যান।

'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী': এক ছিলেন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেও খুব অলস ছিলেন। ফলে খুব দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁদের দিন কাটে। ব্রাহ্মণী ছিলেন খুব ঝগড়াটে। ব্রাহ্মণ রোজ রাজপণ্ডিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ব্রাহ্মণীর চিৎকারে সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। পাড়ার লোক দুজনের ঝগড়ার চোটে তিষ্ঠোতে পারেনা। একদিন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েন। অলস ব্রাহ্মণ অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন। এমন সময় আকাশ-পথে শিব-পার্বতী চলতে চলতে দুঃখী ব্রাহ্মণকে দেখতে পান। পার্বতী ব্রাহ্মণের দুঃখে কাতর হয়ে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানালে শিব বলেন ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেও অদৃষ্টে না থাকার জন্য তিনি পাবেন না। এই কথা বলে ব্রাহ্মণের সামনে পথের ওপর এক থলে মোহর ফেলে রাখেন। ব্রাহ্মণ ইঁট, পাথর বা ডেলা মনে করে লাথি দিয়ে থলেটাকে সরিয়ে বিশ্রামের জন্য এক আমগাছের ছায়ায় বসেন। এমন সময় শিব-পার্বতী তাঁকে দর্শন দেন এবং একটা সোনার কাঁকন দিয়ে সেটা মাটিতে ফেলে তিন বর

চাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ মহা খুশি হয়ে বাড়ি যান। ব্রাহ্মণী তো কুঁড়ের দরজায় খ্যাংরা নিয়ে বসে আছেন। কাঁকন দেখে ব্রাহ্মণী বেজায় খুশি। কিন্তু কি বর চাইবেন এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কলহ শুরু হয়। ব্রাহ্মণী চান গয়না, ব্রাহ্মণ চান রাজ্য। ব্রাহ্মণী রাগ করে কাঁকন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—'হোক তোমার মাথা!' ব্যস্, বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গে বিশ গণ্ডা মাথা গজিয়ে ওঠে। এক বরও চাওয়া হয়ে যায়। ব্রাহ্মণী তখন পাড়াপড়শির পরামর্শে আর এক বর চান—'ব্রাহ্মণের মাথা যাক্'। এর ফলে ব্রাহ্মণের একটা মাথাও থাকে না, ব্রাহ্মণের নিজের মাথাটাও যায়। ব্রাহ্মণী তখন তৃতীয় বর চেয়ে কাঁকন ফেলেন 'ব্রাহ্মণের আপন মাথাটি হোক'। ব্রাহ্মণ নিজের মাথা ফিরে পান। বর ফুরিয়ে যাওয়ায় 'কুঁড়ে' ব্রাহ্মণ রাজ্য আর 'কুঁদুলে' ব্রাহ্মণী গয়না পান না। তাঁরা যেমন ছিলেন তেমনি থাকেন।

'**ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো**': এক ছিলেন ধার্মিক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পুজো করে কোনরকমে তাঁর দিন কাটে। একদিন ব্রাহ্মণ অনেক দূরের এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যান। ভয়ানক রোদে মাঠের পথে চলতে চলতে শ্রান্ত ব্রাহ্মণ এক আমগাছের ছায়ায় এক ইঁদারার পাশে বসেন এবং বিশ্রাম নিতে নিতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে থাকেন। এমন সময় ইঁদারার ভেতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনে ইঁদারার ভেতরে বসবাসকারী সাতটা ভূত একঘড়া মোহর ব্রাহ্মণকে দিতে যায়। ব্রাহ্মণ ঘড়া নেবেন কি—ভয়েই আধমরা হয়ে যান। ভূতেরা তাঁকে আশ্বস্ত করলে ব্রাহ্মণ ঘড়া নিয়ে বাড়ি যান। সাত ভূতও মুক্তি পেয়ে স্বর্গে চলে গেল। ব্রাহ্মণ বেশ আছেন। নানান সৎকর্ম করেন। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ ভাবেন তিনি 'ভূতের ধন' খাচ্ছেন, তাই তীর্থ করে আসবেন। প্রয়োজনীয় ধন নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট মোহর ব্রাহ্মণ তাঁর এক বেণে-ভাইপোর কাছে গচ্ছিত রাখেন। ওদিকে ব্রাহ্মণের ভাইপো, ব্রাহ্মণ আর ফিরবেন না মনে করে সেইসব মোহর নিজের সিন্দুকে তোলে। দেড় বছর পর তীর্থ থেকে ফিরে ব্রাহ্মণ বেণে-ভাইপোর কাছে মোহর ফেরৎ চাইতে গেলে ভাইপো তাঁকে না চেনার ভান করে এবং ব্রাহ্মণকে তাড়িয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে চলতে থাকেন। এমন সময় সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ভূতেদের মধ্যে বড় ভূত কার্যোপলক্ষ্যে মর্ত্যে এসে আবার স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণকে দেখতে পায়। মানুষের মূর্তি ধরে ব্রাহ্মণের দুঃখের কারণ জানতে চায়। সব শুনে সে ব্রাহ্মণকে সেই ইঁদারার পাড়ে যক্ষ-দেবতার কাছে নিয়ে যায়। যক্ষ-দেবতা ব্রাহ্মণকে এক ঘড়া

দিয়ে বলেন বেণের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে বাড়ি যেতে। যথাসময়ে বেণে, ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে আরো ধন পাওয়ার লোভে খাতির করে ব্রাহ্মণকে বাড়িতে নিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ এবার ঘড়াটা নিজের কাছে রাখেন। গভীর রাতে বেণে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় ঘড়াটা চুরি করে এবং ঘড়ার মুখের বাঁধন খুলে সব মোহর সিন্দুকে ঢালতে যেতেই তার ভেতর থেকে এক রাশি ভূত বেড়িয়ে বেণেকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করতে থাকে। ব্রাহ্মণ জেগে উঠে সব শুনে বোঝেন ঘড়া নিয়েই ভাইপোর বিপদ ঘটেছে। ঘড়াটা সোজা করতেই সব ভূত ঘড়ার মধ্যে ঢুকে যায়। বেণে তখন ব্রাহ্মণের আগেকার ঘড়া এবং আরও পাঁচ সাত ঘড়া মোহর ব্রাহ্মণকে দেয়। ব্রাহ্মণ শুধু তাঁর দুটো ঘড়া নিয়ে ফিরে যান। ভূতের কিলের কথাটা বেণে কোনদিন ভুলতে পারে না।

‘**সরকারের ছেলে**’:এক সরকারের ছেলে, নাম তার রামধন। তার পিতা ছিল গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান আর খুব বুদ্ধিমান। পিতার মত না হলেও রামধনের বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল। পিতার মৃত্যুর পর নানা ভাবে বিপন্ন রামধন দরিদ্র হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা তার দারিদ্র্য নিয়ে ঠাট্টা করাতে ক্রুদ্ধ রামধন ভিটে, দেশ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। অনেক গ্রাম, দেশ ছাড়িয়ে রামধন এক রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। তার পরণে ছেঁড়া কাপড়-চটি থাকায় তার কাছে যা ছিল সব দিয়ে নতুন কাপড়, জামা, জুতো, ছাতা, লাঠি কিনে ভদ্রস্থ হয়। তারপর রাজার সঙ্গে দেখা করে কাজ চাইতে যায়। কি কাজ করতে পারবে এবং বেতন কত দিতে হবে— রাজা এই প্রশ্ন করায় রামধন বলে রাজা যে কাজ দেবেন তাই সে পারবে। আর বেতনও রাজা যা দেবেন তাতেই চলবে। রাজা মন্ত্রী আশ্চর্য হয়ে রামধনকে পরীক্ষা করবেন ঠিক করেন। তাঁরা বলেন রামধনকে বিনা মাইনেয় কাজ করতে হবে। রামধন তাতে সম্মত হয়ে বলে যেকোন কাজ থেকেই সে নিজের অন্ন সংস্থান করে নিতে পারবে। রাজা মন্ত্রী পরামর্শ করে ঠিক করেন তাকে এমন কাজ দিতে হবে যাতে সে কিছুতেই অর্থোপার্জন করতে না পারে। তাই তাকে রাজবাড়ির ঘড়িখানার সর্দার করে দেওয়া হয়। রাত্রি দুই প্রহরের সময় রামধন দেখে যে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। তাই বুদ্ধি করে সে ঘড়িয়ালকে হুকুম দেয় তিন প্রহরের জায়গায় চার প্রহরের ঘড়ি বাজিয়ে দিতে। ভোরের ঘড়ি বেজে যাওয়ায় দেশের সবচেয়ে নামকরা চোর টাকার তোড়া হাতে পালাতে গিয়ে রামধনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। বীরপুরুষের মত পোশাকে রামধনকে দেখে চোর, কোতোয়াল ভেবে ভয়ে কাঁদতে থাকে এবং টাকার থলে রামধনের

পায়ে রেখে নাকে খৎ দিয়ে ছুটে পালায়। রামধন দশ হাজার মোহর রাজভাণ্ডারে জমা দেয়। রাজা এরপর রামধনকে শহরের মোট রাস্তা, তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সংখ্যা, রাস্তার ওপর অবস্থিত বাড়ির সংখ্যা, তাদের আয়তন মাপার কাজ দেন। রামধন লোকজন, দড়াদড়ি, মাপার জিনিসপত্র নিয়ে শহরের যেদিকে বিশাল বাজার আর প্রচুর ঘরবাড়ি সেদিক থেকে উত্তর দিকে মাপ শুরু করে। এর জন্য সে পসরা, জিনিসপত্র, ভাঙা দেওয়াল সব সরিয়ে ফেলতে থাকে। দোকানদার, মহাজন সকলে দেখে তাদের বেচাকেনা, কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাই তারা বলে রামধন যেন বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে ঘুরে মাপে, বিনিময়ে তারা প্রচুর পারিশ্রমিক দেবে। রামধন সারা রাত্রি খেটে পরের দিন সকালে পনের হাজার টাকা রাজভাণ্ডারে জমা দেয়। রাজা এবার রামধনকে শহরের সামনের নদীতে দিনরাত যত ঢেউ ওঠে তার সংখ্যা গোনার কাজ দেন। রামধন রাজ-নৌকার কাছি এপার ওপার ধরে লোকজন নিয়ে ঢেউ গুনতে শুরু করে। ফলে মহাজনী নৌকাসহ প্রচুর নৌকা সীমানার কাছির কাছে এসে আটকে পড়ে। তাদের বিস্তর ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে রামধন তাদের একধার দিয়ে একটু জায়গা করে দেয়। সকলে খুশি হয়ে রামধনকে টাকা উপহার দেয়। রামধন পরের দিন ভোরে বিশ হাজার টাকা রাজভাণ্ডারে জমা দেয়। রাজা মন্ত্রী এরপর রামধনকে রাজসভায় তাঁদের পাশে চুপ করে বসে থাকার কাজ দেন। রামধন মাথায় একটা বিরাট পাগড়ি বেঁধে চুপচাপ বসে থাকে, মাঝে মাঝে পাগড়ি শুদ্ধ মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ে, চোখ কটমট করে তাকায়, গম্ভীর হয়ে বসে। আর সভা যখন খুব জমে যায়, রাজা-মন্ত্রী কেউ দেখতে না পায় এমনভাবে তাঁদের কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করার মত ভঙ্গি করে। তার ফলে বিচারাধীন ব্যক্তিরা রামধনকে রাজার খুব প্রিয়পাত্র ভেবে তাকে এক টাকা করে নজর দিতে থাকে। রামধন যত নিষেধ করে নজরানা তত বাড়ে। সভা ভঙ্গ হলে রামধন দুই তোড়া টাকা রাজভাণ্ডারে ঢেলে দেয়। রাজা মন্ত্রী কিছুতেই রামধনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না। মন্ত্রী ভয়ানক চটে গিয়ে শহরে যত বাড়ি আছে তার সব ইঁদুর তিনদিনের মধ্যে রামধনকে মারার কাজ দেন, না পারলে গর্দান। রামধন পাঁচশ লোক নিয়ে বাঁশ, বল্লম, লাঠি, সড়কি, কোদাল, শাবল ইত্যাদি দিয়ে 'খটাখটি', 'ঠনাঠনি' সহকারে ইঁদুর নিধন যজ্ঞ শুরু করে দেয়। সকলে অস্থির হয়ে পড়ে। বাড়ি যায় যায় দেখে গৃহকর্তারা হাজার মোহর, প্রয়োজনে আরও মোহর রামধনকে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ কাজ বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। এমনকি তারা এও লিখে

দেবে যে তাদের বাড়িতে আর একটাও ইঁদুর নেই। এভাবে দু-দিন পর তিনদিনের অর্ধেক বেলায় রামধন মন্ত্রীর বাড়িতে যায়। সেখানেও একই ঘটনা। সব যায় দেখে মন্ত্রী রামধনকে পঞ্চাশ হাজার মোহর দিয়ে 'আর ইঁদুর নেই' লিখে দেন। এবারে রাজার পালা। ইঁদুর নিধন পালার ভয়াবহতায় ভীত রাজা রামধনকে শেষপর্যন্ত পরওয়ানা লিখে দেন যে ভবিষ্যতে রামধনকে ইঁদুরের বিষয়ে কোন কিছু বলা হবে না। শহর আর রাজপুরী রক্ষার ভার রামধনকে দেওয়া হয়। লক্ষ মোহর মূল্যের হার রামধনের গলায় পরিয়ে রাজা রামধনকে প্রধানমন্ত্রীত্বে বরণ করেন। রামধন এবার ইঁদুর নিধন করতে গিয়ে সংগৃহীত টাকা, মোহর এমনকি লক্ষ মোহরের হার মহারাজের ধন হিসাবে রাজার পায়ে সমর্পণ করে। রাজা সেসবই রামধনকে ফিরিয়ে দিলে রাজ্যের গরীব দুঃখীকে সে অর্ধেক টাকা দান করে আর বাকি অর্ধেক দিয়ে অন্নসত্র খোলে। কয়েক বছর সুখে শান্তিতে কাটানোর পর রাজার অনুমতি নিয়ে রামধন কয়েকদিনের জন্য দেশে যায়। সেখানে গিয়ে রামধন পুকুর কাটায়, পাঠশালা খোলে, হাল-গরু কেনে, হাট-বাজার বসায়। তারপর চোখের জলে গ্রামবাসীরা রামধনকে বিদায় দেয়। রামধনের গ্রামে আর একজনও দুঃখী, মূর্খ আর হিংসুটে থাকে না।

'**রাজপুত্র**': এক রাজা, তাঁর এক মাত্র পুত্র। রাজপুত্র আমোদ-প্রমোদে দিন কাটান। রাজার ইচ্ছা তিনি জীবিত থাকতে রাজপুত্রের রাজকার্য পরিচালনা দেখে যাবেন। কিন্তু রাজপুত্র দায়িত্বভার নেওয়ায় রাজভাণ্ডার শূন্য হতে থাকে। একদিন রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। রাজপুত্র যে রাজকার্য চালাতে অপারগ সেকথা উপলব্ধি করে রাজা রাজপুত্রকে উপদেশ দেন—প্রত্যহ প্রতি গ্রাসে মুড়ো খেতে, টাকা ধার দিয়ে ফেরৎ না নিতে, প্রজাকে সব সময় শাসনে রাখতে আর তিন ঠেঙে তে-মাথার কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে। রাজার মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পর রাজপুত্র ঠিক করেন পিতার উপদেশ মত কাজ করবেন। তাই রাজ্যের সব জেলেদের প্রতিদিন দু'শ করে বড় মাছ যোগাতে হুকুম দেন। রাজপুত্র-রাজা প্রতিদিন 'প্রতি গ্রাসে মুড়া' খেতে থাকেন। আর মন্ত্রী, পারিষদেরা বাকি মাছ ভাগাভাগি করে খেতে থাকেন। এভাবে চলতে চলতে রাজভাণ্ডারের এক কোণ খালি হয়ে যায়, রাজাও 'প্রতি গ্রাসে মুড়া' খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুড়ো খাওয়া ছেড়ে দিয়ে রাজা পিতার দ্বিতীয় উপদেশ অনুযায়ী রাজভাণ্ডার থেকে যার যত প্রয়োজন তত টাকা ধার দিতে থাকেন। আর টাকা ফেরৎ না চাওয়ায় রাজভাণ্ডার একেবারে

শূন্য হয়ে যায়। রাজা এবার তৃতীয় উপদেশ পালন করার জন্য প্রজা শাসন শুরু করেন। শাসনের বাড়াবাড়িতে রাজ্যের সব প্রজা পালিয়ে যায়। চিন্তিত রাজা এবার ঠিক করেন চতুর্থ উপদেশ পালন করবেন। তাই 'তিন ঠেঙ্গে তে মাথা'র খোঁজে লোক পাঠান। রাজার লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হয়ে 'তে-মাথা' না পেয়ে 'তিন-ঠেঙ্গে' শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া ও গাধা ধরে আনে। রাজা যোড়হাতে তাদের প্রণাম করেন এবং প্রাণীগুলোর কাছে সুবুদ্ধি চা ন। কিন্তু সেগুলো ছুটে পালাতে যায়, ফলে সকলে একে অপরের ঘাড়ে পড়ে। রাজা আবার ব্যর্থ। রাজার শুক পাখি একদিন রাজাকে দেশভ্রমণে বেরোতে বলে। এক দেশে গিয়ে দূর থেকে 'তিন-ঠেঙ্গে' দেখতে পান। কাছে আসতে 'তে-মাথা'ও দেখতে পান। আসলে বৃদ্ধের হাতের লাঠি সমেত তিন-ঠেঙ্গে। আর উপবিষ্ট অবস্থায় বৃদ্ধের হাঁটু দুটো তাঁর দুপাশ দিয়ে উঁচু হয়ে ওঠাতে তিন মাথার মত দেখায়। চিন্তিত রাজাকে আশ্বস্ত করে বৃদ্ধ বলেন তিনিই রাজার উদ্দিষ্ট। তারপর তিনি রাজাকে তাঁর পিতার উপদেশের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। রাজার রাজভাণ্ডার প্রজার জন্য। রাজা হবেন নির্লোভ, তিনি প্রয়োজনে ছোট মাছ খাবেন আর তাতে অসুখও করবে না। রাজা প্রজাকে ধার দেবেন আর এমন জিনিস রেখে ধার দেবেন যাতে টাকা ফিরে না পেলেও ক্ষতি হবে না। প্রজা শাসনের অর্থ প্রজারা যাতে সুখে-শান্তিতে থাকে, তারা যাতে দারিদ্র-অশিক্ষা-অন্যায়ের শিকার না হয় রাজা তা দেখবেন। রাজা গুণীর সমাদর করবেন। তবেই রাজা প্রজার আশীর্বাদ পাবেন। আর 'তিন-ঠেঙ্গে তে-মাথা' বৃদ্ধরা আসলে বহুদর্শী। তাই তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করলে রাজ্যের কল্যাণ হবে। রাজা বৃদ্ধের উপদেশ মত প্রজাদের সুখী করেন। রাজ্য 'অজয় অক্ষয়' হয়।

তুলনা:

দক্ষিণারঞ্জনের *দাদামশা'য়ের থলে* গ্রন্থের সঙ্গে কয়েকটা গ্রন্থের তুলনা খোঁজার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন—

ইতিহাসমালা— 'ব্রাহ্মণ পরিবারের বরত্রয়ের ব্যর্থতা' গল্পে আছে যোগী পরমেশ্বর-প্রদত্ত তিন বর চাওয়ার কথা ব্রাহ্মণকে বলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী নবযৌবন ও বসন-ভূষণ-সৌন্দর্য কামনা করে প্রথম বর হিসাবে সব পান। তখন এক যবন রাজা তাঁকে অপহরণ করে। তখন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করে তার মা যেন শূকরী হয়ে যান। তাই হয়। যবন রাজা তাঁকে ত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মণ তখন তৃতীয় বর প্রার্থনা করেন: ‘‘আমার জায়া যেমন ছিল, তেমত হউক!’’[৭] ‘ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী’ গল্পে প্রথম বরে ব্রাহ্মণের গায়ে বিশগণ্ডা মাথা গজিয়েছিল, দ্বিতীয় বরে ব্রাহ্মণী ‘ব্রাহ্মণের মাথা যাক্’ বলাতে ব্রাহ্মণের নিজের মাথাটাও চলে যায়। আর তৃতীয় বরে দুঃখিত ব্রাহ্মণী বলেন: ‘ব্রাহ্মণের আপন মাথাটি হোক’। (*দাদামশা’য়ের থলে*, পৃ. ৮১) দুটো গল্পেই দেখা যায় কারো অদৃষ্টেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তবে বৈসাদৃশ্য আছে। *ইতিহাসমালার* গল্পে ব্রাহ্মণের পূর্বকৃত দানধর্মাদির পুণ্য নেই বলে তাঁর ভাগ্যে বর টেকেনি। ভাগ্যে না থাকলে যে ধনসম্পদ অর্জন করা যায় না তা *ইতিহাসমালা*-র ‘সুবর্ণ মশক ও কুষ্মাণ্ড’ গল্পেও আছে। বিষয়বস্তু আলাদা হলেও মূল শিক্ষণীয় বিষয় এক।

‘ইতিহাসমালা’র ‘রাজকুমার অতি কৃশ, শাল অতি স্থূল’ গল্প আর ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’ গল্পের বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের। সামান্য পার্থক্যও আছে। চোর যে গৃহে চুরি করতে গিয়েছিল সেই গৃহনির্মাতা, সে আবার কর্মকারকে, সর্বশেষে কর্মকার রাজপুত্রকে দোষারোপ করে এবং বলে: ‘‘প্রভো, আমি অপরাধী নহি। যখন আমি ইহারদের অস্ত্র প্রস্তুত করি, তখন রাজপুত্র অপূর্ব যানারোহণ করিয়া উত্তম হস্তী ও অশ্ব ও অনেক সৈন্য লইয়া নগর-ভ্রমণে যাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যমনা হইয়াছিলাম। এ-প্রযুক্ত সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল না।’’[৮] অন্যদিকে ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’ গল্পে দেয়াল চাপা পড়ে চোরের মৃত্যুর কারণে পাহারা না দিয়ে ঘুমোনোর জন্য রাজা কোতোয়ালকে দায়ী করেন। কোতোয়াল এরপর গৃহস্থকে, গৃহস্থ মালীকে, মালী মাটি ছানার লোককে, সে কুমোরকে, সে কাঠকুড়ানি বুড়িকে, বুড়ি কাঠুরেকে দোষী সাব্যস্ত করে। তবে *ইতিহাসমালা*-য় রাজপুত্রকে দোষী চিহ্নিত করাটা বেশ অদ্ভুত। কারণ রাজকুমারের কৃশতা নিয়ে বেশ সংশয় আছে। তবে উভয় অপরাধীই কৃশ হওয়ায় সন্ন্যাসীর স্থূল শিষ্যকে যথাক্রমে শালে ও শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে রাজা শাল বা শূলে চড়েন।

‘ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণ সর্প’ গল্পের সঙ্গে ‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’ গল্পের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর প্রদত্ত সর্প পাক করার পর ব্রাহ্মণীর রন্ধনপাত্র ‘স্বর্ণস্থালি’তে পরিণত হয়। রাজা তা দূতের মাধ্যমে হরণ করেন। ব্রাহ্মণ তখন আবার একইভাবে সর্প আনেন। পরিপাক করার পর হাঁড়ির সরা খোলামাত্র ব্রাহ্মণীর শরীরে ‘মুষ্ট্যাঘাত’ হতে থাকে। ব্রাহ্মণ ও তার পুত্রের ক্ষেত্রেও একই

ঘটনা ঘটে। রাজা এই হাঁড়িও হরণ করে প্রহৃত হন। রাজা তখন দুই হাঁড়িই ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো' গল্পে ঈশ্বর নয়, ভূতের দেওয়া একঘড়া ধন বেণে-ভাইপোর কাছে গচ্ছিত রেখে ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে যান। তীর্থ থেকে ফিরে এসে সেই মোহর ফেরৎ চাইলে বেণে-ভাইপো ফেরৎ দেয় না। তখন ব্রাহ্মণ আবার পূর্বস্থান থেকে একটা ঘড়া পেলে মোহর ভেবে বেণে তা চুরি করে এবং উত্তম-মধ্যম প্রহৃত হয়। তখন ব্রাহ্মণ সব মোহর ফেরৎ পান।

হিন্দুস্থানী উপকথা—*হিন্দুস্থানী উপকথা*-র 'দুই বোকার কথা' গল্পের দ্বিতীয় বোকার কাহিনির সঙ্গে *দাদামশা'য়ের থলে*-র 'নূতন জামাই' গল্পের সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় বোকা শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রিত হলে তার বন্ধুরা শিখিয়ে দেয় ‘‘খুব সামলে চলিস। জামাই-মানুষকে বেশী খেতে-টেতে নেই, কিম্বা খিদে পেয়েছে তা লোককে জানতে দিতে নেই। খাবার সময় খুব সাবধান হয়ে থাকিস।’’[৯] দ্বিতীয় বোকা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপাদেয় খাবারও খায় না, এমনকী শাশুড়ির কাছে অসুস্থতারও ভান করে। রাত্রে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে রান্নাঘরে যায়। কোন খাবার খুঁজে না পেয়ে সেখানে ডিম দেখতে পায় এবং দুহাত ভরে ডিম নিয়ে যাবার সময় চৌকাঠে আছাড় খায়। বাড়ির সকলে শব্দ শুনে ছুটে আসে এবং দেখে জামাইয়ের মুখটা ফুলেছে। হাকিম ডাকা হয়। হাকিম বলে তার ভয়ানক 'গালফোলা' রোগ হয়েছে। তখন ছুরি দিয়ে গাল ফুটো করে দিলে ডিমের ভেতরের সব অংশ গড়িয়ে পড়তে থাকে। হাকিম বলে, 'পুঁজ বেরচ্ছে'। জামাই রেগে গিয়ে বলে, 'ও-সব ডিমের রস'। এই গল্পে হাকিমের অংশ আলাদা। বাকিটা এক। 'নূতন জামাই' গল্পে জামাইয়ের মা শিখিয়ে দেয়—

উঁচু আসন দেখিয়া বসিস্,
বেশ মিষ্টি করিয়া কোকিলের স্বরে
　　কথা বলিস;
তবে, বেশি কথা যেন বলিস্ না,
হেঁট মুখে বসিয়া থাকিস,
খাইতে বসিয়া কিছু যেন
　　চাস্ না,
যা দিতে আসিবে, সবেতে

না না করিবি। (দাদামশা'য়ের থলে, পৃ. ৪৯)

'নূতন জামাই' শেষপর্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কারণে শ্বশুরবাড়িতে অপদস্থ হয়েঘরে ফেরে। দুটো গল্পই নির্বুদ্ধিতা বিষয়ক।

বাংলার উপকথা— লালবিহারী দে-র *Folk-Tales of Bengal* গ্রন্থের 'The Indigent Brahman' গল্পের সঙ্গেও 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো' গল্পের সাদৃশ্য আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিব-দুর্গার আশীর্বাদে এক মুড়কির হাঁড়ি পান যা উপুড় করলে অঝোর ধারায় মুড়কি পড়ে, আর সেই মুড়কির অতি অপূর্ব স্বাদ। ব্রাহ্মণ বিশ্রাম নিতে সরাইখানায় গেলে সরাইওয়ালা হাঁড়িটা চুরি করে। ব্রাহ্মণ ফেরৎ চাইতে গেলে "The innkeeper put on a fit of anger, expressed surprise at the Brahman's impudence in charging him with theft, and drove him away from his shop."[১০] বেণে-ভাইপোর কাছেও ব্রাহ্মণ তার গচ্ছিত মোহরের ঘড়া ফেরৎ চাইলে "বেণে তৎক্ষণাৎ লোকজনকে হুকুম করিল,— "বামনকে দূ—র করিয়া তাড়াইয়া দে!"

ব্রাহ্মণ তখন আবার শিব-দুর্গার কাছে গেলে দুর্গা দ্বিতীয় হাঁড়ি দেন যা উপুড় করলে বিশ-পঁচিশটা বিকট দৈত্য বেরিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে। দ্বিতীয় হাঁড়ির দ্বারা ব্রাহ্মণ সরাইওয়ালার কাছ থেকে প্রথম হাঁড়ি উদ্ধার করেন। এরপর ব্রাহ্মণের সুখে দিন কাটতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে-মেয়েরা খেলতে খেলতে হাঁড়িটা ভেঙে ফেললে শিব-দুর্গা তাঁকে তৃতীয় এবং শেষ হাঁড়ি দেন যা উল্টোলে সন্দেশ পড়ে। এই সন্দেশের লোভে পড়ে জমিদার তৃতীয় হাঁড়িও হস্তগত করলে ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় হাঁড়ির মাধ্যমে সন্দেশের হাঁড়ি উদ্ধার করেন।

ওদিকে ব্রাহ্মণও তাঁর দ্বিতীয় ঘড়ার চপেটাঘাতের দ্বারা প্রথম ঘড়া উদ্ধার করেন। তবে দুটো গল্পের বৈসাদৃশ্য হল বরদাতারা আলাদা। একদিকে ভূত, অন্যদিকে শিব-দুর্গা। দ্বিতীয়ত হাঁড়িতে ছিল খাদ্যদ্রব্য, অন্যদিকে ঘড়ায় ছিল মোহর। তৃতীয়ত দুজন ব্রাহ্মণের হাঁড়ি চুরি করে। আর এদিকে ব্রাহ্মণ নিজে বেণের কাছে ঘড়া রেখেছিলেন। আর এখানে ঘড়া ভাঙার প্রসঙ্গও নেই। বাকি বিষয়বস্তু প্রায় এক।

টুনটুনির বই — উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *টুনটুনির বই*-এর ‘পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর’ গল্পের সঙ্গে *দাদামশা’য়ের থলের* ‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’ গল্পের মিল পাওয়া যায়। ‘পিঁপড়ে’র প্রসঙ্গ দক্ষিণারঞ্জনে নেই। এক পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর খুব ভাব ছিল। একদিন পিঁপড়ী মরে যাওয়ায় তার ইচ্ছানুযায়ী পিঁপড়ে তাকে গঙ্গায় নিয়ে যায়। পরিশ্রান্ত পিঁপড়ে যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল সেখানে রাজার পাটহাতি বিশ্রাম নিচ্ছিল। হাতির পায়ের চাপে পিঁপড়ে হাতির পায়ের তলার গর্তে ঢুকে যায় আর হাতির পায়ের মাংস খেতে থাকে। এভাবে হাতি অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তাকে গঙ্গায় নিয়ে যেতে রাজার তিনশো লোক হাঁপিয়ে যায়। তখন রাজার বামুনের চাকর দুমণ চালের ভাত, দুটো খাসি, এক মণ দই খেয়ে নেয় এবং নিজের গামছা দিয়ে হাতিটাকে পুঁটুলি বেঁধে লাঠির আগায় ঝুলিয়ে গণ্ডা দশেক পান মুখে গুঁজে গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। জলতেষ্টা পাওয়ায় সে এক পুকুর জল খেয়ে নেয়। সে জল তার পেটে থাকতে না চাওয়ায় একটা বটগাছ গিলে ছিপির মত আটকায়। পুকুর ধারের এক মেয়ে হাতিসুদ্ধ পুঁটুলি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে। মেয়েটার বাবা চাকরের পেটে লাথি মারায় সব জল বেরিয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাকি থাকে মেয়েটার বাবা আর চাকর। তাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি জোয়ান এই নিয়ে দুজনে কুস্তি শুরু করলে এক মেছুনী তার ঝুড়িতে তাদের তুলে নেয়। অন্যদিকে এক গোয়ালা এক সর্বনেশে চিলের ভয়ে সাতশো মোষ তার ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। সেই চিল মেছুনীর ঝুড়ি তুলে নিয়ে পালাতে গিয়ে রাজকন্যার চোখের মধ্যে পড়ে।

‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’ গল্পে বাইশ-মণ চালের ভাত খানেওয়ালা বাইশ-জোয়ানও এক পুকুর জল খেয়ে ফেলে। হাতির পায়ের চাপে সব জল বেরিয়ে গেলে বাইশ-জোয়ান এক চাপড়ে তাকে মেরে ফেলে। তেইশ-জোয়ানের বাড়িতে গেলে তার মেয়ে বাইশ-জোয়ানের গর্জনকে বিড়াল মনে করে এবং জানায় তালগাছ দিয়ে তার ‘বাবা দাঁত-খড়কে’ করে। এরপর দুই জোয়ানে লড়াই করে এবং এক বুড়ি গরু চরাতে যাওয়ার সময় তাদের কাঁধে তুলে নেয়। বুড়ির ছেলের জ্বর হওয়ায় তার মোষগুলোকে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। বুড়ি তাকে আঁচলের কোণে বেঁধে পিঠে ফেলে নিয়ে চলে। এখানেও এক চিল সকলকে মুখে নিয়ে উড়ে যায় এবং রাজকন্যার চোখে পড়ে। দুই জোয়ান, বুড়ি, মোষ, গরু রাজকন্যার

চোখের জলে সাঁতার কেটে ক্লান্ত। রাজকন্যার চোখও খারাপ হয়। চোখ ভালো করার জন্য রাম সিং কপিলা গাইয়ের দুধ আনতে সাত সমুদ্র তের নদীর ধারে গেলে মশা মাঝি খেয়া পার করে। রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেই নৌকা পার হয়ে বার হাত কাঁকুড়ের ভেতরে থেকে যান, কয়েকদিন খুঁজেও তাঁরা তের হাত বিচি খুঁজে পান না। এক রাঘব বোয়াল কাঁকুড় গিলে ফেলে। এক জেলে মাছটি ধরে জেলেনীকে কাটতে বলে। সে কাঁকুড় দেখে তরকারি করবে বলে সেটা কেটে রাজা ও তার সৈন্যসামন্তদের পিঁপড়ে ভেবে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে সত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশ' সাতষট্টি বছর কেটে গেছে। রাজকন্যার চোখের জলে সাঁতার প্রসঙ্গ থেকে বাকি অংশ 'টুনটুনির বই'তে নেই। তবে দুটো গল্পেই বাহুবলের বাড়াবাড়ি অথবা বিভিন্ন বিষয়ের অতিকথন-অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে।

Tales from Bangladesh — *দাদামশা'য়ের থলে*-র দু-একটা গল্পের সঙ্গে *Tales from Bangladesh* গ্রন্থের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন— 'The Marchant and the Demon' গল্পের রাখাল-রাজা বণিক-রূপী দৈত্যকে বুদ্ধি করে নলখাগড়ার সরু নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আসল বণিককে বাঁচান। 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো' গল্পে যক্ষ-দেবতার দান করা দ্বিতীয় ঘড়ার সাহায্যে ব্রাহ্মণ বেণে-ভাইপোকে শাস্তি দেয়। বিষয়বস্তু হুবহু এক না হলেও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। 'The Two Ganja-Smokers' গল্পের সঙ্গে *দাদামশা'য়ের থলে*-র 'বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান' গল্পের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষত অতিকথনের ক্ষেত্রে। আর বৈসাদৃশ্য হল প্রথম গল্পে রয়েছে গাঁজাখোর আর দ্বিতীয় গল্পে রয়েছে জোয়ানেরা। তাছাড়া প্রথম গল্পে রাজকন্যা ভেবেছেন চোখে খড় পড়েছে। গল্পের এখানেই শেষ। আর দ্বিতীয় গল্পে রাজকন্যা মনে করেছেন চোখে ধুলোবালি পড়েছে। কাহিনি এরপরও অনেক এগিয়েছে। 'The Farmer who outwitted the Six Men' গল্প ও 'সরকারের ছেলে' গল্পদুটোর বিষয়বস্তু এক না হলেও দুটো গল্পই বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় দেয়।

<u>লোকসাংস্কৃতিক উপাদান বিন্যাস</u>:

১. টাইপ ও মোটিফ:

টাইপ বা লোককথার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মোটিফ বা ছোট ছোট কাহিনি *দাদামশা'য়ের থলে*-তেও অল্পবিস্তর রয়েছে—

ক. 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী'

টাইপ— শূলে চড়া থেকে মুক্ত-মানুষ।

মোটিফ— ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজা শূলে-যাওয়ার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির স্থান নেনে, বিচক্ষণ গুরু।

খ. 'সওদাগরের সাত ছেলে'

টাইপ— মূর্খ সাত ভাই।

মোটিফ— চালকুমড়োকে ঘোড়ার ডিম ও শিয়ালকে ঘোড়ার বাচ্চা মনে করা, বাগানের মন্দ গাছের সঙ্গে ভালো গাছও কেটে ফেলা, তেলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখে চোর মনে করা, কলসীর মধ্যে থাকা চোরের ওপর লাঠির ঘা দিতে গিয়ে তেলে ঘর ভাসাভাসি, ঘেসেড়ার সঙ্গে ঘাস কাটে ইত্যাদি।

গ. 'নূতন জামাই'

টাইপ— বোকা জামাই।

মোটিফ— মা বলে দেয় কিছুমিছু নিতে, ছেলে মানকচু কেনে শ্বশুরবাড়ির জন্য, মায়ের কথামতো উঁচু আসন খুঁজতে উই-ঢিবির ওপর বসে, পেটে ক্ষিধে থাকতেও জামাই বেশি খায় না, রাত্রিবেলা মিষ্টান্ন খুঁজতে গিয়ে হাঁড়ি ভেঙে গিয়ে কাণাটা গলায় আটকে যায়, সকলে চোর ধরতে গিয়ে দেখে জামাই।

ঘ. 'বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান'

টাইপ— মহাশক্তিশালী কুস্তিগীর।

মোটিফ— অস্বাভাবিক শক্তিশালী মানুষ, অসম্ভব ক্ষমতা, অতিশয়োক্তি, শক্তিমান ও অতি শক্তিমান।

ঙ. 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী'

টাইপ— অদৃষ্টে বর নেই।

মোটিফ— শিব-পার্বতীর মোহরের ঘড়া দান, ইঁট-পাথর ভেবে ব্রাহ্মণ লাথি দিয়ে সরিয়ে দেন, তিনবার তিন বর চেয়ে কাঁকন মাটিতে ফেললে ইচ্ছাপূরণ, ব্রাহ্মণী বলেন হোক তোমার মাথা, ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গে বিশ গণ্ডা মাথা, ব্রাহ্মণের মাথা যাক্ বলাতে ব্রাহ্মণের নিজের মাথাও যায়, ব্রাহ্মণ তৃতীয় বরে আপন মাথা ফিরে পান।

চ. 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো'

টাইপ— গচ্ছিত ঘড়া ফেরৎ না পাওয়া।

মোটিফ— ভূতেদের দেওয়া মোহরের ঘড়া, দ্বিতীয় হাঁড়ির ভেতরের ভূতেরা ঘড়া-মালিকের অপরাধী ভাইপোকে প্রহার করে।

ছ. 'সরকারের ছেলে'

টাইপ— বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভাগ্যান্বেষণ।

মোটিফ— রাজবাড়ির ঘড়িখানার সর্দার, শহরের রাস্তার সংখ্যা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার পরিমাপকের কাজ, শহরের সামনের নদীতে দিনরাতের সমস্ত ঢেউ গোণার কাজ, রাজসভায় চুপ করে বসে থাকার কাজ, শহরের সমস্ত ইঁদুর মারার কাজ, সবক্ষেত্রেই অদ্ভুতভাবে অর্থোপার্জন।

জ. 'রাজপুত্র'

টাইপ— পিতৃ-আদেশ পালন।

মোটিফ— রাজার উপদেশ, প্রত্যহ প্রতি গ্রাসে মুড়ো, টাকা ধার দিয়ে ফেরৎ না নেওয়া, প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখা, তিন-ঠেঙ্গে তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নেওয়া।

২. **ছড়া/ প্রবাদ/ লৌকিক অভিব্যক্তি:**

ছড়া:

দাদামশা'য়ের থলে-তেও নানা উদ্দেশ্যে ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের চারটে বিভাগেরই সূচনায় একটা করে ছড়া রয়েছে। এই ছড়ার মাধ্যমে প্রতি গল্পের কাহিনি-অংশ সূত্রাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

যেমন রাজা তেমন মন্ত্রী কে বা কাহার কম?
করে' ফেল্লে মস্ত বিচার — অদ্ভুত রকম!
দেখে' সবাই অবাক্ লোক, ভাবে, — 'কি সব এ!'
রাজা চল্লেন স্বর্গে। আর মন্ত্রী "হে! হে!" ('হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী')

- এখানে 'রসগোল্লা' বিভাগে 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্পের কাহিনি-সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার 'আ'ক্', 'গুড়-তেঁতুল' বা 'চুমো' বিভাগেও কাহিনিসূত্র বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান জোয়ান ছিল দুই,
মালসাটে এক এক জোয়ান কাঁপিয়ে দিত ভুঁই!
ভাব্‌তো দু'য়ে "আমার মত জোয়ান কি আর আছে!"
হো! হো!
কত হাজার জোয়ান তেমন গিলে ফেল্লে মাছে!

(বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান)

ছড়ার মাধ্যমে সূত্রাকারে কাহিনি-কথন এই গ্রন্থেরও প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী।

- প্রতি বিভাগের শেষে 'উপদেশ' অংশে গল্পগুলোর সারকথা বা মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছেন গ্রন্থকার। যেমন—

সময়ে না চিনে নিলে দোয়াত কলম বই,
ভবিষ্যতে, নেই পথ আর, মূর্খ হওয়া বৈ!

এখানে ‘রসগোল্লা’ বিভাগের সারাৎসার— মূর্খতার পরিণামে যে দুর্গতি প্রাপ্তি হয় সেই বক্তব্যই ছড়ার মাধ্যমে বলা হয়েছে।

‘আ’ক’ বিভাগের শেষেও ছড়ার মাধ্যমে উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। যেমন—

ভাল লোকে দুঃখে পড়ে ডাক্‌লে ভগবানে,
যা’ করে হ’ক ভগবান্, শুনেন তাহা কানে।

- গ্রন্থের সূচনায় ‘উৎসর্গ’ অংশে ছড়ার ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—

হরবোলা পাখীটি আবার, ফিরে এসেছে!
আকাশ জুড়ে হাসির লহর ভাসিয়ে দিয়েছে!
সোনার দেশে হাসির সাগর নাচিয়ে দিয়েছে,
প্রাণের মাঝের উছল হাসি জাগিয়ে দিয়েছে!

অথবা

এক একটি ওই হাসির সুর, এক এক হাসির কথা
ভরে’ দে’ যায় হাসির আলোয় দেশের লতাপাতা!
... ...
... ...
সন্ধ্যা দুপুর বসে’ যে যায় হাসির মহোৎসব,
উথ্‌লে উঠে সোনার মুখে হাসির কলরব!

এখানে ছড়ার মাধ্যমে বাংলার রসকথার বৈশিষ্ট্য, হাস্যরসের তাৎপর্য, হাস্যমুখরতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রবাদ :

দাদামশা’য়ের থলে-তে প্রবাদের ব্যবহার কম নয়। কারণ রসকথা মাত্রেই প্রবাদের জন্মদাতা। যেমন—

- মুড়ি মিশ্রির সমান দর। (‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’)
- মূর্খের মরণ। (‘সওদাগরের সাত ছেলে’, ‘উপদেশ’ অংশ)

- বাঘ মোষ এক ঘাটে নিয়া জল খাওয়ায়; ('বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান')
- বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি! ('বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান')
- যক্ষের ধন। ('ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো')
- যেমন কর্ম তেমনি ফল। ('ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো')
- গাঁয়ের ফকির সহজে গাঁয়ে ভিখ্‌ পায় না। ('সরকারের ছেলে')
- বিশ্বকর্মার পুত্র। ('সরকারের ছেলে')
- বাপ্‌কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া ('সরকারের ছেলে')
- প্রতি গ্রাসে মুড়া খাইও। ('রাজপুত্র')

গল্পগুলোতে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। যেমন—

- 'টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।' ('রাজপুত্র')
- 'দেখুন, আর কোন পথেই যাইবেন না।' ('ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো')
- 'শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পলাও। ... এদেশে আর এক মুহূর্তও থাকিতে নাই।'
('হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী')

৩. **কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদান**:

যেহেতু 'রসকথা' তাই *দাদামশা'য়ের থলে*-তে কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বলাই বাহুল্য কৌতুকময়তা এখানে যথেষ্ট। যেমন—

- 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্পে মূর্খ রাজা মন্ত্রী 'দুজনের বুদ্ধি দেখিয়া দুজনে বাহাবাহা করেন।' বুদ্ধির এমন আতিশয্যে 'রাজা রাজ্যের চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া দিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নাকে কানে তুলার ঢিবি দিয়া, মন্ত্রী, সভায় বসিতে লাগিলেন। কি—জানি!— এমন বুদ্ধি, তার একটুকুও বাহির হইয়া যায়!' মন্ত্রী শূকরকে দেখে একবার বলে রাজার হাতি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, আর একবার বলে রাজবাড়ির

ইঁদুর রাজভাণ্ডার লুটে খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। বিদেশি পথিকের দল রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে রান্না করবে বলে উনুন খুঁড়তে বসলে মন্ত্রী বলেন তাঁরা আসলে সিঁদ কেটে পুকুর চুরি করছে। চোর মারা গেলে মন্ত্রী, সেইসঙ্গে রাজাও চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাজ্য পাহারা না দেওয়ার জন্য প্রথমে কোতোয়াল, তারপর যার ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে চোর মারা গেছে সেই গৃহস্থ, মালী, মাটি ছানার লোক যে মালীর মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই, কুমোর, কাঠ কুড়ানি বুড়ি, কাঠুরেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সমস্ত বিচারটাই দারুণ হাস্যকর। কাঠুরের গায়ে মাংস না থাকায় রাজ্যের সব চেয়ে মোটা লোককে শূলে চড়ানো হবে ঠিক হয়। শেষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার লোভে রাজা শূলে চড়েন। মন্ত্রী দৌড়োতে গিয়ে অন্ধকূপে পড়ে পাতালে চলে যান। সন্ন্যাসীর শিষ্য 'যখন চলে, যেন হাতিটি; বসে যেন পাহাড়টি।'

- 'নূতন জামাই' গল্পে মা কিছুমিছু নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে বলায় ছেলে তার খোঁজ করে। দোকানী যখন তার হাতে মানকচু দিয়ে বলে, 'এই যে কিছুমিছু, এম—ন জিনিসটি দিলাম, যে, মহাশয়, খাইলে আর ভুলিতে পারিবেন না,— সা-ত দি-ন পর্যন্ত মুখ চুলকাইতে থাকিবে' তখন বেশ মজা লাগে। এরপর আরো হাসি পায় কারণ 'জামাইয়ের তো আনন্দে তখনি মুখ চুলকায় আর কি!' জামাই, দোকানীর বক্তব্য যখন শ্যালা-সম্বন্ধীর কাছে বলে তখন তারা জামাইকে উচ্চস্তরের রসিক হিসাবে ধার্য করে। এই গল্পে কৌতুকের উপাদানের অভাব নেই। মায়ের কথামত ছেলে উঁচু আসন হিসেবে উই-ঢিবিতে বসে। মাচার ওপর বসে কোকিলের মত কুহুস্বরে ডাকে। সকলে ভাবে 'জামাই তো—ভারি আমুদে!' খাওয়ার সময় চাইতে নিষেধ করায় সবেতে 'না' বলে অথচ রাত্রিবেলা মিষ্টি খুঁজতে গিয়ে হাঁড়িতে মাথা ঢোকায় এবং সে হাঁড়ি থেকে মাথা বেরোয় না। সকলে চোর মনে করে ছুটে এসে দেখে জামাই! নূতন জামাই একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে বাড়ি ফেরে।

- 'সওদাগরের সাত ছেলে' গল্পে রাখালদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে মূর্খ সাতভাই রোজই কানমলা খায়। তাই খেলা ছেড়ে রাঙা কান নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তারা ঠিক করে: 'ভাই, পাঠশালায়ও কানমলা, খেলিতে যাই সেখানেও কানমলা। খালি কানমলা খাইতে হয়। আর ভাই পাঠশালায়ও যাইব না, খেলিতেও যাইব না। আয় ভাই, এই গাছে পাখীর

ছানা পাড়ি।' এরপর আগডালে পাখির ছানা পাড়তে যায় এবং ডাল ভেঙে একজন আর একজনের ঘাড়ে পড়ে দম আটকে প্রায় মারা যাবার যোগাড়। আবার কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে। এক সেয়ানা লোকের কাছ থেকে চালকুমড়ো কিনে তারা ভাবে ঘোড়ার ডিম কিনেছে। তাদের মূর্খতার এখানেই শেষ নয়। পচা চালকুমড়ো খেতে আসা-শিয়ালদের ঘোড়ার বাচ্চা মনে করে। এক ভদ্রলোকের বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে ভাল গাছও কেটে ফেলে। তেল নিয়ে পথে সামনে পেছনে যেতে যেতে তারা ভাবে: ''তাইতো ভাই, সকলেই সমান সমান তেল আনিলাম—তা কেহ আগে আর কেহ পাছে হই কেন?'' এবং গোলমাল বাধে। প্রথমে যারা আছে তারা ভাবে: 'ভাই, পাছের ভাইদের কলসীতে বোধ হয় তৈল বেশি!' আর পেছনের ভাইরা ভাবে: 'ভাই, বোধ হয় ওরা আমাদিগকে সব ভারী কলসী দিয়া, মজা করিয়া এখন আগে আগে যাইতেছে।' এরপর কার কলসীতে তেল বেশি দেখতে গিয়ে ঠোকাঠুকি লাগে এবং সব কলসী ভেঙে তেলে পথ ভেসে যায়। তারা কাঁদতে থাকে। আবার তেল বিক্রী করতে গিয়ে যখন তেল কমে যায় সাত ভাই ভাবে: ''বাঃ! এখন আবার তেল কমে কেন?'' চোরে তেল চুরি করছে ভেবে কলসী পাহারা দিতে গিয়ে তেলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখে চোর মনে করে। তখন চোরকে মারতে গিয়ে কলসী ভেঙে গিয়ে তেলে ঘর ভেসে যায়। এবার প্রকৃত চোর যখন ইঁদুরকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং সাতজন সাত লাঠি দিয়ে ইঁদুর মারতে যায় তখন সে লাঠি তাদেরই ঘাড়ে পড়ে এবং হাড়গোড় ভাঙে। তাদের মূর্খতার এখানেই শেষ নয়। চোখে ঠুলি বেঁধে ঘানি টানতে গিয়ে মশার কামড় খায় এবং চাপড় মারতে গিয়ে একে অপরকে মারে আর ভাবে কলু তাদের মারছে। কলুকে ধরতে গিয়ে একে অপরের ঘাড়ে আবার পড়ে। এ গল্প অসাধারণ, মজাদার। মূর্খতাই এখানে কৌতুকের উৎস।

- 'বাইশ জোয়ান তেইশ জোয়ান' গল্পে বাইশ আর তেইশ জোয়ানের খাওয়ার পরিমাণ শুনলে যে কোন কারোর হাসি পায়। তারা বাইশ/তেইশ মণ চালের ভাত খায়। বাইশ-জোয়ান তেইশ-জোয়ানের মাথা নিতে যাওয়ার সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল বলে মাত্র মণখানেক চাল, অর্ধেকটা পুকুরের জল, চোদ্দমণ ছাতু খেয়েছে। বাইশ-জোয়ানের পদাঘাতে মাটি কেঁপে উঠলে তেইশ-জোয়ানের মেয়ে মনে করে বিড়ালে মাটি

আঁচড়াচ্ছে। তালগাছ দিয়ে তেইশ-জোয়ান দাঁত খড়্কে করে। তারপর লড়াইয়ে মত্ত দুই জোয়ানকে কাঁধে নিয়ে এবং পিঠে ছেলে ও ট্যাঁকে কতগুলো মোষ নিয়ে এক বুড়ি, সেসব শুদ্ধ মুখে নিয়ে উড়ে যাওয়া এক চিল, সেসব নিয়ে চিলের উড়তে উড়তে রাজকন্যার চোখে পড়া এবং রাজকন্যার চোখের জলে সাঁতার কেটে তাদের ক্লান্তি— সবই অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর। সাতসমুদ্র তের নদীর পাড়ের মশা মাঝি, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, রাজা ও সৈন্যসামন্তদের শুধু কাঁকুড় দেখতেই সন্ধ্যা হওয়া, এক বোয়াল কাঁকুড় গিলে ফেললে সসৈন্য রাজার মাছের পেটে অবস্থিতি— এসব বিবরণ পড়তে পড়তে পাঠক না হেসে পারবে না। অতি অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকেই এখানে হাস্যোদ্রেক হয়েছে।

- ‘ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী’ গল্পে ব্রাহ্মণী যখন হাতে কাঁকন নিয়ে বলেন: ‘হোক তোমার মাথা!’ তখন ব্রাহ্মণের বিশ গণ্ডা মাথা আর চল্লিশ গণ্ডা চোখ গজালে ব্রাহ্মণের দুর্দশা হলেও পাঠক বা শ্রোতা মজা পায়। এরপরের ঘটনা আরো মজাদার। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে ব্রাহ্মণী ‘ব্রাহ্মণের মাথা যাক্’ বলাতে ব্রাহ্মণের নিজের মাথাও চলে যায়। ব্রাহ্মণী তখন ‘ব্রাহ্মণের আপন মাথাটি হোক’ বলায় ব্রাহ্মণ নিজাবস্থায় ফিরে আসেন।

- ‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’ গল্পে ভূতের ভাষা—

  “—হেঁওঁ হেঁওঁ
  মেওঁ মেওঁ
  —নাঁও!”

  শুনলে যে কোন বয়সী পাঠক/ শ্রোতা বিশেষত শিশুদের খুব মজা লাগবে। তারপর ভূতের বিবরণ— ‘যেমন দাঁত, তেমন চোক, নাক, কান—কি চেহারা!’ বেণে-ভাইপো মোহরের ঘড়া ফেরৎ না দেওয়ায় ভূতেদের দেওয়া দ্বিতীয় ঘড়া থেকে ভূতেরা বেড়িয়ে বেণেকে ‘কিল, চড়,—ধাক্কা,—লাথি,—ঘুষি,—কানমলা,—চাপট,—দুমদাম্, —চটাস্, —পটাস্,—দ্রুম্!’ উত্তম-মধ্যম দিতে থাকে তখন আমাদের হাসি পায়। তারপর ঘরে যেতেই ভূতেদের সেই বিশেষ ভাষা: ‘হেঁওঁ মেঁ ওঁ! চীঁ ভীঁ চেঁই হুঁ!’ ভূতের কিলের কথাটা বেণে ভুলতে পারেনা।

- ‘সরকারের ছেলে’ গল্পে ঘড়িখানার সর্দার তিনপ্রহর সময়ে ভোরের ঘড়ি বাজিয়ে দেওয়ার হুকুম দেওয়াতে দেশের সবচেয়ে নামজাদা চোর ধরা পড়ার ভয়ে পালাতে যায় আর লাফিয়ে সর্দার অর্থাৎ রামধন সরকারের ঘাড়ে পড়লে ব্যাপারটায় বেশ হাস্যোদ্রেক হয়। এছাড়া শহরের রাস্তার সংখ্যা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরিমাপের সময় দোকানদার, মহাজনদের বিপাকে পড়া, দিবারাত্র নদীতে ঢেউ গোনার সময় বড় মহাজনদের নৌকা আটকে থাকা, রাজসভায় রামধন সরকারের চুপ করে থাকা, ইঁদুর-নিধন পর্বে রাজা-মন্ত্রীসহ রাজ্যবাসীর বিপদে পড়া—এই প্রত্যেক ঘটনা এবং তা থেকে সরকারের ছেলের অর্থ উপার্জন—সবক্ষেত্রেই শুধু পরিহাস বা কৌতুকময়তাই প্রকাশ পায় তা নয়, বিষয়গুলো যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্তও বটে। মন্ত্রী আর রাজার বাড়িতে ইঁদুর নিধন করতে যাওয়ায় যথেষ্ট রঙ্গ-রসের পরিচয় মেলে। যেমন—‘‘ও-ই দিকে এই সময় লোকজনেরা সব—‘‘ঐ যে ইঁদুর যায়, ঐ যে গেল!—মার্ মার্!!—!” করিয়া সকলে ছুটিয়াছে, —পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ, —একশ’ —দু’শ’ লাঠি একেবারে এক সঙ্গে খাট চৌকি বিছানা মেজে, ফরাস বাক্স, কাগজপত্রের ওপর... দমাদম!

  দেখিয়া শুনিয়া, মন্ত্রী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।”

  অন্যদিকে রাজার বাড়িতে ‘‘রাজা ছিলেন ঘুমে,—একধারে আরাম-কুঠুরিতে। জাগিয়া—থর থর করিয়া রাজা উঠিয়া বসিয়াছেন,— ‘‘এ কি এ!—ভূমিকম্প নাকি?—”...” গল্পগুলো পড়লে গ্রন্থটাকে ‘রসকথা’ নামে আখ্যায়িত করার কারণ স্পষ্টতই বোঝা যায়।

- ‘রাজপুত্র’ গল্পে ‘প্রতি গ্রাসে মুড়া খাইও’— পিতার এই উপদেশ বুঝতে না পেরে রাজা ‘‘প্রতিদিন দুইশত মুড়া দিয়া রাজা ‘প্রতি গ্রাসে মুড়া’ খাইতে লাগিলেন।” ফলে শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজভাণ্ডারও শূন্য হতে থাকে। তারপর টাকা ধার দিয়ে সে টাকা ফেরৎ না নেওয়াতেও রাজ-ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়। প্রজাদের শাসন করতে গিয়ে ভীষণ অত্যাচার শুরু করায় সব প্রজারা পালিয়ে যায়। তারপর পিতার চতুর্থ উপদেশ অনুযায়ী রাজা ‘তিন-ঠেঙ্গে’ ‘তে-মাথা’-র অর্থও উদ্ধার করতে পারেন না। ফলে ‘তিন-ঠেঙ্গে’ শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া আর গাধাকে রাজসভায় প্রণাম তাদের কাছে ‘সুবুদ্ধি’ চাইলে

‘তিন-ঠেঙ্গে’রা নিজেদের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না এবং সিংহাসন উল্টে দিয়ে ‘চিৎ-পাৎ’। এখানেও মূর্খতাই পরিহাসের জন্ম দিয়েছে। আর আমরা পাঠক/ শ্রোতারাও তাই প্রাণখুলে হাসতে পারি।

৪. অভিযান:

রসকথা হলেও *দাদামশা'য়ের থলে*-তেও কিছু কিছু অভিযানের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। যেমন—

- এক সন্ন্যাসী ও তাঁর শিষ্যের দেশভ্রমণে বেরিয়ে হবুচন্দ্র রাজার রাজ্যে আগমন। (‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’)
- ঘোড়ার বাচ্চার খোঁজে সাতভাইয়ের যাত্রা। (‘সওদাগরের সাত ছেলে’)
- ‘কিছু-মিছু’ নিয়ে ‘নূতন জামাই’-এর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। (‘নূতন জামাই’)
- তেইশ-জোয়ানের মাথা নিতে বাইশ-জোয়ানের যাত্রা। (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- কপিলা গাইয়ের দুধ আনতে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে রাম সিং-এর গমন। (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আনতে রাজার সসৈন্য গমন। (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা। (‘ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী’)
- ব্রাহ্মণের তীর্থস্থান ভ্রমণ। (‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’)
- রামধন সরকারের বিদেশ যাত্রা। (‘সরকারের ছেলে’)
- সিপাই শান্ত্রী চোদ্দ হাতির জৌলুস নিয়ে রামধন সরকারের স্বদেশে গমন। (‘সরকারের ছেলে’)
- তিন ঠেঙ্গে তে-মাথার খোঁজে সপরিবারে রাজার দেশভ্রমণ। (‘রাজপুত্র’)

৫. ভাষা ব্যবহার:

দক্ষিণারঞ্জন ভাষা ব্যবহারে যে নিজস্বতা দেখিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। এই ভাষা ব্যবহারের নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

ক. অনেক ক্ষেত্রে দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

- রাজা হো হো করিয়া হাসেন, মন্ত্রী খো খো করিয়া কাশেন; ....ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে রাজবাড়ির পাশ দিয়া এক শূকর যায়। ('হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী')
- খাইতেছে, খাইতেছে, খাইতেছে। দিন যায়। খাইতে খাইতে খাইতে, শিষ্যের ভুঁড়ির ওপর ভুঁড়ি বাড়িয়াছে। ('হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী')
- ঘেসেড়া, গান গাইতে গাইতে চলিল। ('সওদাগরের সাত ছেলে')
- ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে মার সঙ্গে বাড়ি চলিল। ('নূতন জামাই')
- বুড়ীর ছেলে মাঠ হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া মার কাছে আসিল ('বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান')
- "ষাঠ্ ষাঠ্" করিয়া ছেলেকে আঁচলের কোণে বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া নিয়া চলিল। ('বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান')
- ব্রাহ্মণ, বিশ্রাম করিতে বসিয়া ভাবিতেছেন আর ঘুমে ঢুলু ঢুলু হইয়া পড়িতেছেন ('ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী')
- সকলে তাহাকে "দূর্ দূর্" করিতে লাগিলেন। ('সরকারের ছেলে')
- যাহা যাহা দরকার, যাহা যাহা রামধন চাহিল, রাজা, সমস্তই রাজভাণ্ডার হইতে দিতে আদেশ করিলেন। ('সরকারের ছেলে')
- মার্ মার্!! ধর্ ধর্!!— গেল গেল!! ('সরকারের ছেলে')

সম্ভবত হাসি, কাশি, খাওয়া, গান গাওয়া, ক্রন্দন, কম্পন, আদর, তন্দ্রাচ্ছন্নতা— সবেরই দীর্ঘ স্থায়িত্ব বোঝাতে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দক্ষিণারঞ্জনের নিজের ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্নের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা— এ-সবই রসকথার উপযুক্ত সহাস্য পরিবেশ, কৌতুকময়তা, রসময়তা তৈরির সহায়ক হয়েছে।

খ. প্রচুর অনুকার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

পাকসাক, বিশ্রাম টিশ্রাম, জলটল, তল্পি তল্পা, মোটা সোটা, যুক্তি টুক্তি, ইঁদুর-টিদুর, ব্যবসা-ট্যবসা, বুদ্ধি শুদ্ধি, কিছুমিছু, দামীটামী, ঠকাও-টকাও, ভারীসারি, হাসি-টাসি, জিভ টিভ, মেকি টেকি, জুতা টুতা, রান্না-বান্না, চাইব-টাইব, আন্‌চান্‌, লাঠি ফাটি, খাওয়া দাওয়া, হাঁক ডাক, বাচ্চা টাচ্চা, নড়িয়া চড়িয়া, গরু-টরু, পোকা টোকা, হাবু-ডুবু, ভিক্ষা-সিক্ষা, ইঁট ফিট, অল্প স্বল্প, কাপড় চোপড়, পোঁটলা পুঁটলি, বিচার-আচার, বুদ্ধি-শুদ্ধি, পাগড়ি টাগড়ি ইত্যাদি।

লোককথার আস্বাদ বজায় রাখতে ও শিশু মনোগ্রাহী করতে এইধরণের অনুকার শব্দ বিশেষভাবে সহায়তা করে।

গ. নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— নুঁদি (পেট), দুনো (দ্বিগুণ), অর্ধেকটাক (অর্ধেকটা), হুমো (হুলো), চাপন (চাপ), ভাপ্‌না (ভাপ), তম্বি (হম্বিতম্বি), শিরদার (গর্দান নেয় যে), জৌলুস (সুসজ্জিত গজারোহী বাহিনী), কস্‌কস্‌ (সুড়্‌ সুড়্‌) ইত্যাদি।

কখনো দেশজ শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন— ঢেঙ্গা (লম্বা), তোলা (একফোঁটা), জৌলুস (সুসজ্জিত গজারোহী বাহিনী), সলুই (ছুঁচো) ইত্যাদি।

অথচ দক্ষিণারঞ্জনের ব্যবহৃত নিজস্ব ও দেশজ শব্দের মিশেলে অর্থোদ্ধারে কোনও অসুবিধা হয় না।

এই শব্দগুলো একেবারেই দক্ষিণারঞ্জনের নিজস্ব উদ্ভাবন। অথচ অর্থোদ্ধারে অসুবিধা হয় না।

ঘ. ধ্বন্যাত্মক শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— সপাসপ্‌, গপাগপ্‌, পুটুস্‌ পুটুস্‌, ফোঁস্‌ ফোঁস্‌, কড়্‌মড়্‌, সর্‌সর্‌, চিঁচিঁ, ঝির্‌ ঝির্‌, খল্‌ খল্‌, ছম্‌ ছম্‌, সন্‌ সন্‌, থর থর, ফিস্‌ ফিস্‌, গম্‌ গম্‌, ঠনা ঠন্‌, হৈ হৈ, রৈ রৈ, খট্‌ খট্‌, ঝর ঝর, ঝন্‌ ঝন্‌, পৈ পৈ, কল্‌ কল্‌ ইত্যাদি।

ঙ. কৌতুকময়তা তৈরিতে উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার। যেমন—

- একটা পড়িল একটার পিঠে,—কোনটা ‘‘চ্যাঁ—!’’ কোনটা ‘‘ভ্যাঁ—!’’

  (‘সওদাগরের সাত ছেলে’)

- তেলে ভিজিয়া সুবচনী হইয়া সাত ভাই কাঁদিতে লাগিল! (‘সওদাগরের সাত ছেলে’)

- রাজকন্যার চোকের জলে হাবু-ডুবু খাইয়া, বুড়ী, মোষগুলি, গরুগুলি, দুই জোয়ান, সাঁতার কাটিয়া কাটিয়া হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)

- অনেক কষ্টে কিছুমিছু আনিয়াছি। এ খুব ভাল। খাইলে সাতদিন পর্যন্ত মুখ চুলকাইতে থাকিবে।

  (‘নূতন জামাই’)

- ততক্ষণে ঘড়া লইয়া ভূত ইঁদারার উপরে আসিয়া বসিল। যেমন দাঁত, তেমন চোক, নাক, কান—কি চেহারা! (‘ব্রাহ্মণ ও বেণে ভাইপো’)

- ওরে বাবা রে! মা রে! ও রে! গেছি রে! অ্যাঁ! ওরে বাবা! ওরে মা! উ—হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ! ওঃ!—ওরে কে আছ রে! কোথায় যাই! ওরে মা গেছি! উ—হুঃ হুঃ হুঃ!—ভ্যা! উঃ! উঃ! গেলাম! মলাম! উ-হুঃ-হুঃ—ওঃ! অ্যাঃ! ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—! ওঃ!!—হা!— উঃ! মাঃ! বাবাঃ— ও হোঃ! উঃ হোঃ— (‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’)

- মোহর আনিতাম—ঠিক যেন এক একটা থালার মত! এখানে আনিয়া অত বড় মোহরের একটা পাহাড়ই বসাইয়া দিতাম! (‘সরকারের ছেলে’)

- শিয়াল বিড়াল ঘোড়া গাধাকে উদ্দেশ্য করে রাজা আর রাণী বলিতেছে,—‘‘আপনারা তিন-ঠেঙ্গে, আপনাদের মহিমা তো আমরা কিছুই জানি না। দেখুন, আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। তাই, আপনাদের শরণাগত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগে রক্ষা করুন, আমাদিগে সুবুদ্ধি দিন্।’’

  (রাজপুত্র)

কৌতুকময়তা তৈরিতে দক্ষিণারঞ্জনের এই বাক্যগুলোর ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

চ. দীর্ঘ বা প্রলম্বিত বা অতিরিক্ত যতিচিহ্ন ব্যবহার। যেমন—

- তখন সাত ভাইয়ে ভারি গোলমাল!— ‘‘কি!!’’—‘‘কি—!!’’— (‘সওদাগরের সাত ছেলে’)

- —পুটুস্!— — চটাস্।— (‘সওদাগরের সাত ছেলে’)

- ‘সে—ই মাঠে’, ‘খু—ব ভাল!’ ‘জামাই, যা—ন’, ‘স—ব কিছুমিছু’, ‘ভা—রি খুশী’, “এম—ন জিনিষ!— নিয়া গেলে তা কি খুশীই হইবে!!” (‘নূতন জামাই’)
- দেখিয়া ভাবিলেন,—“বাঃ—”— (‘নূতন জামাই’)
- —এ যা জিনিসটি দিলাম, মহাশয়, একেবারে—— ঝাঁকার সব জিনিসের সেরা! (‘নূতন জামাই’)

সবচেয়ে সেরা বোঝাতে প্রলম্বিত যতিচিহ্ন প্রয়োগ।

- ‘দু—ই চাড়া’ (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- ‘যায়।— — —’ (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- আজ এ সব কি! — — ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চোর রামধনের পায়ের ওপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। (‘সরকারের ছেলে’)
- পরদিন, — — — রাজসভা বসিয়াছে। (‘সরকারের ছেলে’)

এই ‘ড্যাশ’ চিহ্ন অথবা দীর্ঘ বা প্রলম্বিত যতিচিহ্ন দৃশ্যগুলোকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

ছ. বাক্য ব্যবহারে নিজস্বতা লক্ষণীয়। যেমন—

- জ্যোৎস্না যেন ফিনিক্ ফুটিতেছে। (‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’)
- রৌদ্র যেন আরও চম্ চম্ করিয়া উঠিতেছে। (‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’)
- বড় ভূত বলিল,—

“—হেঁওঁ হেঁওঁ
মেঁওঁ মেঁওঁ
কিঁ চাঁওঁ
ঠাঁকুঁরঁ ঠাঁকুঁরঁ, দুঃখী তুঁমিঁ,
এঁইঁ নাঁও।” (‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’)

জ্যোৎস্নার ফিনিক্ ফোটা, রৌদ্রের চম্চম্ করে ওঠা— এই বাক্যগুলোর ব্যবহার দক্ষিণারঞ্জনের একেবারেই নিজস্ব। তবে এতে দৃশ্যগুলো একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভূতেদের ভাষাও দক্ষিণারঞ্জন বেশ ভালোই রপ্ত করেছিলেন।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দক্ষিণারঞ্জনের নিজের ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্নের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা— এসবই রসকথার উপযুক্ত সহাস্য পরিবেশ, কৌতুকময়তা রসময়তা তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

৬. **<u>আদল (Structure</u>)**

দাদামশা'য়ের থলে-র গল্পগুলোর আদল আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্থবিভাগের নামকরণের কথা। প্রত্যেক বিভাগের নামকরণ দক্ষিণারঞ্জনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শুধু নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তার আবার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। প্রথম বিভাগ— 'রসগোল্লা'। এর অর্থ করা হয়েছে— 'যেমন নিরেট তেমন রসাল'। কঠিন অথচ রসে টইটম্বুর। গ্রন্থকারও বলেছেন— ''তাই তো''—নিজে অর্থ ব্যাখ্যা করে তাকে আবার নিজেই সমর্থন করেছেন। এবার গল্পগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী', 'সওদাগরের সাত ছেলে', 'নূতন জামাই'— প্রত্যেকটা গল্পেরই হাস্যরসের উৎস মূর্খতা। অথচ সে মূর্খতাকে কেন্দ্র করে গল্পে কোথাও তির্যক বাক্য প্রয়োগ বা ব্যঙ্গের শাণিত তীর বিদ্ধ করেনি। তাই রসগোল্লা— 'নিরেট' মূর্খতায় ভরা কিন্তু মিষ্টি পরিহাসে ঠাসা।

দ্বিতীয় বিভাগ— 'আ'ক' বা আখ। অর্থ— 'শক্ত আর মিষ্টি'। এরপর আবার বিস্ময় প্রকাশ করে দক্ষিণারঞ্জন বলেছেন—''অ্যাঁ''। আখের বাইরেটা শক্ত কিন্তু চিবিয়ে খেলে ভেতরটা একেবারে মিষ্টি। এই বিভাগে রয়েছে 'বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান', 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী' এবং ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো। প্রথম গল্পে আছে অতিকথন, অতিরঞ্জন। দ্বিতীয় গল্পে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দুর্ভাগ্য, তৃতীয় গল্পে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দূরীকরণ এবং তার ভাইপোর সাজা-প্রাপ্তি। আপাতভাবে প্রত্যেক গল্পেরই বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর মনে হলেও ভেতরে ভেতরে মিষ্টি হাসির ফল্গুস্রোত প্রবাহিত।

তৃতীয় বিভাগ—'গুড়-তেঁতুল'। অর্থ— 'টক মিষ্টি মেশানো' অর্থাৎ গুড়ের মিষ্টি আর তেঁতুলের টক স্বাদের মিশ্রণ। দক্ষিণারঞ্জন তারপর বলেছেন—''আচ্ছা''। এই বিভাগে রয়েছে— 'সরকারের ছেলে' গল্পটা। এই গল্পে দুটো ভিন্ন আস্বাদের কারণ— একদিকে রয়েছে

রামধনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি, রাজানুগত্য, অন্যদিকে রয়েছে এসবের আড়ালে সুমিষ্ট হাসির আভাস।

চতুর্থ বিভাগ—'চুমো'। অর্থ— 'হাসি ও স্নেহের ঝরণা'। এই বিভাগ কৌতুকময়তা ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের মিশেল। 'রাজপুত্র' নির্বোধ, তিনি প্রজাদের ওপর খামখেয়ালিপনার চূড়ান্ত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তবু কোথাও তাঁর প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের প্রশ্রয় নিহিত। তাই রাজপুত্র নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। আর এক্ষেত্রে রাজপুত্রের সংশোধন-পূর্ব ও সংশোধন চলাকালীন আচার-ব্যবহার এবং সংশোধন পদ্ধতি বেশ সরস হাস্যপূর্ণ। তাই দক্ষিণারঞ্জনও বলেছেন ''এতক্ষণে''।

- 'রসগোল্লা' বিভাগের গল্পগুলোতে হাস্যরস উৎপন্ন হয়েছে নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা বা অশিক্ষা থেকে। তবে এ একেবারে অকপট সরল হাসি (fun)। আর এই হালকা হাসি শ্রোতা বা পাঠকের মনকে ভারমুক্ত করে। হবুচন্দ্র রাজা, গবুচন্দ্র মন্ত্রী, সওদাগরের সাত ছেলে, নূতন জামাই-এর কাণ্ডকারখানায় পাঠককুল হেসে অস্থির হয়। এ হাসি আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরপুর, মজাদার। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকাভাবে নেওয়ার মনোভাব এক্ষেত্রে কাজ করে। তবে 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী' গল্প পড়ে অনেকের ধারণা হতে পারে রাজা মন্ত্রী যা খুশি তাই করতে পারেন— এই সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো বা বিচারব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন এই গল্পের মূল উপজীব্য। তবে দক্ষিণারঞ্জনের কঠোর জীবন-সমালোচনা এক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে মনে হয়না। উৎফুল্ল, সতেজ, চপল, রসময়, হাস্যমুখর পরিবেশ রচনাই এইসব গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'আ'ক' ও 'চুমো' বিভাগের গল্পগুলোতে হাস্যরসের উৎস হিসাবে অবাস্তব বর্ণনা, উদ্ভট কল্পনা, আলস্য ও শঠতার কথা বলা যেতে পারে। তাই 'আ'ক' ও 'চুমো' বিভাগের গল্পগুলোকে লঘু বা তরল হাস্যরসের গল্প বা humour বলা যায়। ''Popular notions of the Indian as stolid and unsmiling may still have currency, but are far from actuality, as the reports of many ethnographers and travelers attest. That Indians can dignified and serious when they consider the occasion demands is true, but repartee, jests, and laughter not only have their place in day to day living, but even during the performance of religious ceremonies''[১১] জীবনের নানা অসঙ্গতি,

নির্বুদ্ধিতা এক্ষেত্রে হাস্যরসের উৎস। ‘‘Humour বা কৌতুকহাস্য শুধু চতুর কথায় সীমাবদ্ধ নয়, তা পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র, বাক্যালাপ ইত্যাদি নানাজাতীয় বিষয়কে অবলম্বন ক’রে গড়ে উঠতে পারে। ... তা শিথিল, প্রশস্ত, আবেগপ্রবণ, প্রফুল্ল এবং হাস্যময়।’’[১২] জীবন সম্পর্কে কৌতূহল বা সংশোধনের ইচ্ছাকে হাস্যরস যে সংহত রূপ দেয়— তা এক্ষেত্রে বোঝা যায়। বিশেষত ‘humour’-এর ক্ষেত্রে একধরনের সহানুভূতি কাজ করে।

- তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ ‘গুড়-তেঁতুল’-এর গল্পকে wit বা বুদ্ধির তরবারির খেলা বলা হবে। ‘‘কোনো লেখক যখন বিভিন্ন বিচিত্র জাগতিক বিষয় ও বস্তুর মধ্যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর, অথচ বুদ্ধির আনন্দবিধায়ক কোনো সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন, তখনই wit-এর সৃষ্টি হয়।’’[১৩] এখানে হাস্যরসের উৎপত্তির ক্ষেত্রে রামধনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তার বিচক্ষণতার দ্বারা সে ‘সরকারের ছেলে’ থেকে মন্ত্রী হতে পেরেছে। তবে ‘‘wit যেমন বুদ্ধির থেকে উৎসারিত, তেমনি এর সংবেদনও প্রধানত বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়।’’[১৪] এই হাসি স্মিত, মাপা হাসি। সব মিলিয়ে হাস্যরসের সমর্থনে বলা যায়, কোন না কোন সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা থেকে হাস্যরস সৃষ্ট হয়। তাছাড়া ‘‘কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।’’[১৫] আর ভাষিক বিপর্যয়ের ফলে অর্থান্তর ঘটতে দেখা যায়। তখন লক্ষিত অর্থ ও প্রাথমিক অর্থ আলাদা হয়ে যায় এবং হাস্যকৌতুকের জন্ম হয়।

কোন গল্পই স্যাটায়ার-ধর্মী বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত নয়। দক্ষিণারঞ্জন কোন সমালোচনা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য নিয়ে ‘রসকথা’ রচনা করেননি বলেই মনে হয়।

- প্রত্যেকটা গল্পই নীতি বা উপদেশমূলক। ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’ গল্পের নীতিকথা— মূর্খের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই ভালো। ‘সওদাগরের সাত ছেলে’ আর ‘নূতন জামাই’ গল্পের উপদেশ— মূর্খতার ফলে প্রতি পদে পদে অপদস্থ হতে হয় এবং সর্বদা ‘মূর্খের মরণ’ হয়। এই হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী ও নূতন জামাই সম্পর্কে বলা যেতে পারে— ‘‘The fool lives in a mental world of his own, and he may endow objects or animals with any qualities that suit his passing fancy.’’[১৬] ‘বাইশ জোয়ান

আর তেইশ জোয়ান'— নিজেই নিজেকে সেরা মনে করে, যা মূর্খতার নামান্তর। 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী'— এই কুঁড়ে আর কুঁদুলের ঘরে সৌভাগ্য কখনো স্থায়ী হয় না। 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো'— যেমন কর্ম তেমন ফল। 'সরকারের ছেলে'— সৌভাগ্য, সৎ, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহায় হয়। শুধু তাই নয়, এই গল্পে পরোপকার, গুরুজনকে সম্মান, স্বদেশ প্রেমকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'রাজপুত্র'— গুরুজনের উপদেশ মেনে চললে কল্যাণ তার হবেই। এ ব্যাপারে বলা চলে, ''ধর্মোপদেশ কিংবা বক্তৃতার আকারে নীতির মহিমা লোকসমাজে কোনদিনই প্রচার লাভ করে নাই, কোন কোন লোক-কথার ভিতর দিয়া এই নীতি প্রচারিত হইয়াছে। নীতিগুলি সরস ও প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এইসকল নীতিকথা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।''[১৭]

তবে উপদেশ প্রচার করা হলেও গল্পগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

- দুটো গল্পকে সম্পূর্ণভাবে 'রাজকথা' বলা যায়। যেমন— 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী', 'রাজপুত্র'।

- সওদাগরের সাত ছেলে জন্মসূত্রে অভিজাত ছিল। সরকারের ছেলেরও জন্মগতভাবে আর্থিক কৌলীন্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উভয়ক্ষেত্রেই পরিশ্রম করার প্রসঙ্গ উল্লেখিত। সাত ভাই ব্যর্থ ও রামধন সফল। তবে রাজার হাত ধরে রামধনের সাফল্য এসেছে।

- 'বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান' সাধারণ মানুষের কথা হলেও (অবশ্য শক্তিমত্তায় সাধারণ নয়) গল্পের শেষে রাজার কথা আছে।

- ব্রাহ্মণের গল্প দুটো— একটা 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী', অন্যটা 'ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো'। তবে দুটো গল্পেই কোন না কোন অনুগ্রহের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম গল্পে দৈব-অনুগ্রহ, দ্বিতীয় গল্পে ভৌতিক তথা যক্ষ-দেবতার অনুগ্রহ। প্রথম গল্পে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সেই অনুগ্রহ লাভ করেও তার দ্বারা সৌভাগ্য রক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয় গল্পে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সৌভাগ্যশালী হয়েছেন। তবে ব্রাহ্মণের ভাইপো কিন্তু একজন বণিক ও বিত্তবান।

- প্রকৃত সাধারণী কথা হল 'নূতন জামাই'।

- অর্থাৎ সমগ্র রস-কথায় রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর, বণিক, ব্রাহ্মণ, কুস্তিগীর, জামাই, সন্ন্যাসী, তার শিষ্য, সরকারের ছেলে, কোতোয়াল— নানা চরিত্রের ভিড়।

- মালী বা ঘরামি, মাটি ছানার লোক বা যোগাড়ে, কুমোর, কাঠকুড়ানি বুড়ি, কাঠুরে ('হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী'), ঘেসেড়া, কলু ('সওদাগরের সাত ছেলে') প্রভৃতি শ্রমজীবীর দেখা মেলে।

- চোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোতোয়াল থেকে শুরু করে গৃহস্থ, মালী, মাটি ছানার লোক, কুমোর, কাঠকুড়ানি বুড়ি পর্যন্ত সকলেরই নিজের দায় অস্বীকার করে অপরকে দোষারোপ করার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের ছিদ্রান্বেষী মনোভাব চোখে পড়ে ('হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী')।

- নিজস্ব বিচার-বিবেচনাবোধ বা জীবনকে চালনা করার মত বুদ্ধির অভাব লক্ষ করা যায় হবুচন্দ্র রাজা, সওদাগরের সাত ছেলে, নূতন জামাই ও রাজপুত্রের চরিত্রের মধ্যে।

- যতই হোক রসকথা, হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, সওদাগরের সাত ছেলে আর নূতন জামাই চরিত্রগুলোর মূর্খতা বেশ বেশিই মনে হয়েছে।

- গ্রাম-পুনর্গঠনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। 'সরকারের ছেলে'- গল্পের রামধন মন্ত্রী হয়েও নিজের গ্রামকে ভুলতে পারেনি। সব সমস্যার সমাধান করে সে গ্রামকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছে।

<u>**সাহিত্যকৃতি:**</u>

দক্ষিণারঞ্জনের *দাদামশা'য়ের থলে* বা 'রসকথা' 'প্রিয় সখার মত প্রতি কার্য্যে সাথে সাথে' ফেরে। এই 'কথা' ক্রমশ ''ঘন হইতে ঘনতর, স্ফুট হইতে পরিস্ফুট— ঘটনার বহুলতা এবং ভাষার সমৃদ্ধিতে পর পর পরিপূর্ণ হইয়াছে'' আর এখানেই 'রসকথা'র সার্থকতা। তবে প্রত্যেক গল্পের শেষের উপদেশ বা সারকথা অংশ খুবই মূল্যবান। এই বিষয়ে আলোচনাও তাই দরকার।

- ‘হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী’—

  ১. মূর্খের সঙ্গে স্বর্গ-সুখেও কারো বাস করা উচিত নয়। একদিন তাতে মহা বিপদ ঘটতে পারে।

  ২. লোভ যে কোন পাপের কারণ, তাই লোভকে জয় করতে হবে। লোভ থেকে মরণ নিশ্চিত।

  ৩. গুরুর সদুপদেশ অমৃতসমান। যে তা শোনে না তার মরণ হবেই।

  ৪. গুরুজন চির ক্ষমাপরায়ণ, স্নেহশীল। তাঁদের সে ক্ষমা পেতে যত্ন করতে হবে।

  ৫. খারাপ কাজের শেষে যখন অনুশোচনা হয় তখন গুরু স্মরণ করলে ভয় ও পাপ দূরে যায়।

- ‘সওদাগরের সাত ছেলে’—

  ১. সময়মতন শিক্ষাগ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে মূর্খ হওয়া ছাড়া পথ নেই।

  ২. যারা মূর্খ, নির্বোধ সব দুষ্টু লোকই তাদের পেছনে জোটে।

  ৩. ফাঁকি দিয়ে কাজ করলে সকলকে ঠকতে হয়, ধিক্কৃত হতে হয়।

  ৪. তবু মূর্খদের সব কাজই পণ্ড হয়, তারা সর্বত্রই সাজা পায়।

  ৫. মূর্খ বলে সব কাজেই তাদের দুর্দশা। ‘মূর্খের মরণ’—সব কথার সার।

- ‘নূতন জামাই’—

  ১. উপদেশবাণী ভালো করে বুঝতে পারেনি বলেই জামাই প্রচুর শাস্তি পেয়েছে।

  ২. শুধু মুখস্থ করলেই হয় না, বুঝতেও হবে। তা না হলে সর্বদা বিপদ হতে পারে।

  ৩. জিভের লোভ সবক্ষেত্রেই আগে সামলে রাখতে হয়, তা না হলে সব স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যায়।

  ৪. বুদ্ধি খরচ করে ভেবেচিন্তে কাজ না করলে লজ্জা পেতে হয়।

৫. বুদ্ধি সামান্য পরিমাণে হলেও দরকার, নয়ত সব কাজে সকলের কাছে হাস্যকর হতে হবে।

- ‘বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান’—

১. যে নিজেকে বড় ভেবে নিয়ে গর্বিত হয়, বাইরে বেরোলেই সে নিজের পরিচয় পেয়ে যায়। তখন তার অহঙ্কার ধুলোর মত উড়ে যায়।

২. ঘরে বসে নিজেকে বড় না ভেবে খোঁজ করে দেখতে হবে ‘বড়’র কত রূপ কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

৩. বড়-র চেয়েও বড় আছে— এটাই সার। এই বড়-র শেষ কোথায় তার কোন ঠিকানা নেই।

- ‘ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী’—

১. যারা অলস তারা ভাবে ধন মান রাজ্য লাভ এমনিই হয়। কাজকে যারা ভয় পেয়ে ঘুমকে সুখ মনে করে সেই কুঁড়েরা কক্ষনো সুখের মুখ দেখতে পায়না।

২. এই পৃথিবীর ধুলোকণায় কত মণি মানিক ছড়িয়ে রয়েছে— কুঁড়েরা সেসব দেখতেও পায়না। দেবতারা যেচে তাদের ধন দিয়ে গেলেও তাদের দুঃখ ঘোচে না।

৩. যারা ঝগড়া ঝাঁটি করে তাদের কখনও মঙ্গল হয় না। তারা এক কাজ করতে যায়, আর ঠিক তার বিপরীতটা ঘটে। রাগে অন্ধ হয়ে যারা কোন কাজ পণ্ড করে শেষে তাদের মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয়। ঝগড়া মারামারি করতে গিয়ে অযাচিত ধন যারা হারায় ছাইপাঁশ ধুলো-বালিই তাদের সম্বল হয়। কুঁড়ে আর কলহপরায়ণরা নিজের সর্বনাশ করে। সৌভাগ্য কখনো তাদের ঘরে স্থায়িত্ব লাভ করে না।

- ‘ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো’—

১. ভাল লোকে দুঃখের দিনে ভগবানকে ডাকলে যেমন করে হোক ভগবান তা কানে শোনেন।

২. এ জগতের সবই ভগবানের দান। মন প্রাণ দিয়ে যারা সৎকাজ করেন তাদের কোন ক্ষয় নেই, কোন কিছু থেকে তাদের কোন ভয়ও নেই।

৩. পরের ধনে যারা লোভ দেখায় শেষে তাদের অবশ্যই বিপদ ঘটে। যারা অন্যকে ঠকিয়ে নেয়, পরের অহিত করে তাদের কোন কালেই শুভ হয় না। একদিন ঠিক তাদের অনুতাপের ভূত ধরবে এবং তারা অদ্ভুত ধরনের শাস্তিও পাবে। নিতান্ত পাপীরও যদি মন ফেরে, সে যদি সৎকাজ করতে চায়, তার যদি জাগরণ আসে তাহলে তার পাপমুক্তি হতে পারে। পুণ্যের মধ্যেই শান্তি ও সুখ, অন্যদিকে পাপে চোখের জল। যে যেমন কর্ম করে তেমন ফল পায়।

- ‘সরকারের ছেলে’—

১. যারা শত্রু তারাই আসলে মিত্র। যারা ধিক্কার দেয় পরোক্ষভাবে তারাই উপকার করে। মনে যার প্রতিজ্ঞা, বুকে সাহস আছে, চেষ্টা আর বুদ্ধি রয়েছে, মুখে যার হাসি তার কাছে যত কঠিন কাজই আসুক না কেন, সেই পুরুষের সব কাজে বিশ্বরাজ সহায় হন। কাজে কর্মে অনেক কৌশল থাকে। মনকে সত্যপথে নির্ভীক রাখতে হবে। নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে জগৎ কাজে লাগতে হবে, মনের মাঝে ঈশ্বরের নাম উজ্জ্বল রাখতে হবে, ভয়কে গ্রাহ্য না করে কর্তব্য করে যেতে হবে— তাহলে এসবের চিরপুরস্কার জয়মাল্য তার জুটবেই।

২. শত্রুরও উন্নতি দেখে যে খুশী হয় পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি দেবতার সমান। বড় হতে গেলে শত্রুকেও ক্ষমা করতে হবে, গুরুজনকে সম্মান দিতে হবে। তবে ভবে ধন্য হওয়া যায়। কেউ যতই বড় হোক তার কিন্তু স্বদেশ স্বগ্রামের কুঁড়েটা ভুললে চলবে না। নিজের দেশের ভাইয়ের দুঃখ মোচনের জন্য দূর দূরান্ত থেকে মন যেন কাঁদে। ভাইয়ের অভাব ঘুচিয়ে দিয়ে ধনের রাশি এলে সৎ অভিলাষে সৎপথে ব্যয় করা দরকার। কেউ ছোট নয়, কাউকে ছোট ভাবা ঠিক নয়। বুদ্ধিবলেই মানুষের পুণ্য আর জয়লাভ হয়।

- ‘রাজপুত্র’—

বিদ্বানেরও ভুল হয় আর বড়দেরও ভুল হয়; যদি সঠিক সময়ে সে ভুল শুধরে নেওয়া যায় তবে দোষের কিছু নেই। অদ্ভুত কাজকর্ম করার চাইতে সব কিছু বুঝেশুনে কাজ করলে কোন গোলমাল হয় না। অনেক সময় অনেক কথার অর্থ ঠিকমত বোঝা যায় না, তাই বলে যে কথাগুলো গুরুত্বহীন তা নয়। গুরুর কাছে গিয়ে সেসব কথার অর্থোদ্ধার করতে পারলে সেই কথার আলোতেই জগৎ উজ্জ্বল হবে। গুরুজনের উপদেশে প্রথমে ভুল হলেও শেষে ঠিক তাতেই ভালোর ফুল ফুটবে। যা কিছু প্রাচীন তাই বন্ধুর মত মহামূল্যবান হয়ে বিপদ বিপাক থেকে উদ্ধার করে। যে মনে প্রাণে ভালো হতে চাইবে তার কাছে চিরদিন কল্যাণ আসবেই।

উপরে উল্লেখিত সমস্ত উপদেশের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জনের গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, জীবন-বীক্ষা, মূল্যবান বাণী প্রকাশিত। জীবনের প্রকৃত সত্যগুলো গ্রন্থকার খুব সহজে, সরলীকৃত করে বলেছেন। এই উপদেশ সম্বলিত ‘রসকথা’ আপামর বাঙালির হৃদয়কে উৎসারিত করে দিয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরমার ঝুলি* গ্রন্থ থেকেই বাংলার পাঠকগোষ্ঠী তাঁর কৌতুকময় রচনাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাঁর *দাদামশা’য়ের থলে* শিশু-কিশোরের কাছে অফুরন্ত আনন্দের খনি। ‘‘বাঙ্গালীর বুক হাসির স্বর্গ। বাঙ্গালীর ভাষা রামধনুর দেশ। বাঙ্গালীর কথাসাহিত্য সে স্বর্গ আর রং-ধনু এ দুটিকে জীবন ও আনন্দের অজস্র শ্রাবণে গলাইয়া, ছড়াইয়া দিয়াছিল দেশময় পুষ্পবৃষ্টির মত।’’[১৮] হাসির জোয়ারে দেশ সেদিন ভরে উঠেছিল, অমল হাসি সবার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছিল। রসকথার সাগরে ভাসতে ভাসতে বাঙালির ‘প্রফুল্ল মন’ নানাদিকে যাত্রা করেছিল। বাঙালি সেদিন প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিল ‘রসকথা’র দ্বারা, আজও নেয়। গল্পের বিষয়বস্তু, ভাষা, ছড়া, কৌতুকময়তা, কল্পনার আতিশয্য, প্রাঞ্জল উপদেশ— সব মিলিয়ে ‘রসকথা’-র রস একেবারে উপচে পড়েছিল। সভা সাহিত্য হলেও শুধু তৎকালের নয়, এ হল বাঙালির ‘চিরস্থায়ী আনন্দের খনি’, অলীক হয়েও ‘অভাবনীয় সত্যসাহিত্য’।

তথ্যসূত্র ::

১. দুলাল চৌধুরী পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪; দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩; পৃ. ৫০

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২,পৃ. ৪৭২

৩. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, The Folk Literature of Bengal, Published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Calcutta, 1920, p. 240

৪. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা সংস্করণ আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৪৩

৫. Stith Thompson, The Folk tale, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977, p.188

৬. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ভূমিকা', দাদামশা'য়ের থলে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬

৭. উইলিয়াম কেরী সংকলিত ইতিহাসমালা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮১২; গাঙচিল সংস্করণ জুন ২০১১, পৃ. ১৫

৮. তদেব, পৃ. ২১

৯. শান্তা দেবী সীতা দেবী অনূদিত হিন্দুস্থানী উপকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯১২; প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ; অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৪

১০. Rev. Lal Behari Day, Folk Tales of Bengal, Book Society of India Limited, Calcutta, First Edition 1883; Reprint 1970, p. 54

১১. Maria Leach edited Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, Vol I, Funk & Wagnalls Company, New York, 1949, p. 510

১২. অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ১৬

১৩. তদেব, পৃ. ১৩

১৪. তদেব, পৃ. ১৫

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৌতুকহাস্যের মাত্রা, পঞ্চভূত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১

১৬. Stith Thompson, The Folk tale, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977, p. 191

১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৪৪

১৮. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ভূমিকা', দাদামশা'য়ের থলে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬

৯. নবম অধ্যায়

গীতিকথা

প্রকাশ

ঠাকুরদাদার ঝুলি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের দ্বিতীয় রূপকথা সংগ্রহের বই। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে অর্থাৎ *ঠাকুরমা'র ঝুলি* প্রকাশের ঠিক এক বছর পর এটা প্রকাশিত হয় ।

'গীতকথা' বলার কারণ

আচার্য দীনেশচন্দ্র 'গীতিকথা' নামে রূপকথার এক স্বতন্ত্র শাখার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-কে 'বাঙলার রূপকথা' বললেও *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-কে 'রূপকথা' বলেননি, বলেছেন 'বঙ্গোপন্যাস' 'গীতকথা'। দক্ষিণারঞ্জন বাংলার কথাসাহিত্যকে যে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, তার মধ্যে গীতকথা : ''...'পরাণকথা','প্রস্তাব', 'কেচ্ছা' (মুসলমান যুগের)' এক জিনিস।''[১]

গীতকথা হল পল্লীসাহিত্য যেখানে রূপকথা হল শিশু-সাহিত্য। গীতকথা হল সুন্দরভাবে গাঁথা মালা। বঙ্গোপন্যাস গীতকথার প্রাণ হল গান। কল্পনাগত ঔৎকর্ষ ও ঘটনাগত বৈচিত্র্য এতে দেখতে পাওয়া যায়। রূপকথা, ব্রতকথা, রসকথা ও গীতিকথা— বাংলার এই 'কথা' সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল গীতকথা।—

> They are the Gita Kathas, lit, tales interspersed with songs. In Eastern Bengal, old widows of the humbler classes, assisted by a chorus, used to recite them before ladies of high rank during the days of their confinement… These gitakathas are not merely nursery tales. For the education of women, according to the ideals of the East, there can not be anything more sublime or edifying.[২]

গীতকথার প্রতিটা কাহিনিতে, ধ্বনিতে, সংগীতে, শব্দচয়নে, ছড়া সৃজনে রয়েছে প্রাণের স্পর্শ, অপূর্ব উন্মাদনা। ভাষা, ভাব, কল্পনা ক্রমশ গীতকথার স্তরে স্তরে উত্থিত। তবে 'গীতকথা' নামকরণের ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। তিনি কয়েকটা কারণে 'রূপকথা' ও 'গীতকথা'র স্বতন্ত্র বিভাগ করেছিলেন: প্রথমত ''...'রূপকথা' শিশুসাহিত্য আর

‘গীতকথা’ পরিণত মনস্কের সাহিত্য। ‘রূপকথা’ দিদিমা ও গৃহিণীদের একচেটিয়া সম্পত্তি আর ‘গীতকথা’ প্রধানত পুরুষেরই অধিকারে। রূপকথায় ছড়া আছে, গীতকথায় আছে গান। আবার তিনিই বলছেন ‘গীতকথা’ বহু নারীও জানেন।’ আবার একথাও বলেছেন যে রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা ও গীতকথা, ‘শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে সমভাবে ক্রোড়ে ধরিয়া আসিতেছে’।”[৩]

এই ‘গীতকথা’র ‘গীত’ বাদ দিলে এও আসলে রূপকথা। আচার্য দীনেশচন্দ্রের মতে ‘গীতকথা’য় কথার সঙ্গে গীতেরও মিশ্রণ থাকে, যা বাংলা রূপকথা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র প্রত্যেক গল্পে রূপকথার সঙ্গে সঙ্গে গীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। ‘‘বিশেষতঃ রূপকথার ভাষা ব্যবহারিক গদ্যভাষা নহে, ইহা কাব্যধর্মী— ইহা গীতি ও গদ্যের মধ্যবর্তী রেখা ধরিয়া অগ্রসর হয়; সেইজন্য এই ভাষা অতি সহজেই গীত হইয়া উঠে, তাহার ফলে আপনা হইতেই দুই কথা গদ্য বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই কথা পদ্য আসিয়া যায়।”[৪] তাই কোন কোন রূপকথায় বাহ্যিকভাবে গীতিবহুলতা দেখে তাকে ‘গীত-ভারাক্রান্ত’ মনে হলেও রূপকথার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গীতকথার কোনও বিরোধ আসলে নেই।

অনেক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে তিনি ‘বাঙ্গ্লা মায়ের মাঠে’ ধুলো কুড়িয়ে বাঁশি পেয়েছিলেন। আর সে বাঁশির সুরে আপামর বঙ্গবাসী মোহিত হয়ে গিয়েছিল।

‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’ নামকরণ কেন?

দক্ষিণারঞ্জন স্বয়ং তাঁর *ঠাকুরদাদার ঝুলি* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন *ঠাকুরমার ঝুলি*-র সঙ্গে ‘সঙ্গতি’ রাখার জন্য এবং ‘গীতকথা’র সুরের বেশিরভাগই পুরুষকণ্ঠের বলে ‘‘কথাসাহিত্য বাঙ্গালার উপন্যাসের — বঙ্গোপন্যাস — ঠাকুরদাদার ঝুলি” নাম দিয়েছেন। ‘‘ঠাকুরদাদার ঝুলি-র কাহিনীগুলি কিন্তু একটু অন্য গোত্রের। এগুলি ঠিক গল্প নয়, গীতকথা— গাইতেন প্রধানত কিশোর-যুবক রাখালেরা। মেয়েরাও কখনো কখনো গলা মেলাতেন, কিন্তু কাহিনীগুলির স্রষ্টা প্রধানত পুরুষ। সেই কারণেই কি বইটির নামকরণ হল ‘ঠাকুরদাদা’ অর্থাৎ পুরুষের নামে?”[৫] সেকালে ঠাকুরমা-দিদিমাদের মত ঠাকুরদাদা-দাদামশাইরাও গল্প

শোনাতেন, তবে তাঁরা রূপকথার চাইতে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্পই বেশি বলতেন। তবে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর *ঠাকুরদাদার ঝুলি* গ্রন্থে শোনালেন 'চিরকালীন সামগ্রী'র কথা যা আসলে 'চাষীর গান, রাজার গান; শিশুর গান, বুড়ার গান; স্ত্রীর গান, পুরুষের গান।' তিনি নিজে ঠাকুরদাদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শোনালেন গীতকথা— যা সারা রাত্রিব্যাপী গীত হত। প্রতি রাত্রে বসত গীতকথার আসর। সময়সীমা সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর।

কেন ও কোথা থেকে সংগ্রহ?

ঠাকুরমা'র ঝুলি সংকলনের ক্ষেত্রে যে কারণ সক্রিয় ছিল, দক্ষিণারঞ্জনের অন্যান্য 'কথা' সাহিত্য সংকলনেও একই কারণ কাজ করেছিল। এককথায় বলতে গেলে তা হল বাংলার হারিয়ে যাওয়া 'কথা'গুলোকে সংকলন-সংরক্ষণের মাধ্যমে বঙ্গ জননীর তথা দেশমাতৃকার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার। এক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে কয়েকটা ভাবনা কাজ করেছিল। সেসব তিনি তাঁর 'বঙ্গোপন্যাস বাঙ্গালার গীতকথা'র (দ্বাবিংশ সংস্করণ) ভূমিকায় জানিয়েছেন—

- যাহা ছিল, আমার দেশ তাহাকে 'কথা', (১) নাম দিয়াছিল। এই 'কথা', বাঙ্গালীর আপন প্রাণের নিতান্ত নিজস্ব সুরে একান্ত সহজভাবে বাজিয়া যাইত। অথচ, উপন্যাস এক্ষণে যে ক্ষেত্রে যাহা করিতেছে, তাহারও অপেক্ষা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে, গুরু দায়িত্বরাশি এই 'কথা'গুলির উপর সংন্যস্ত ছিল"। বাংলার 'কথা' সাহিত্য নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গি-সুরের মোহময়তায় এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল।

- বাংলাভাষার তথা সাহিত্যের যে-সব চিরন্তন সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে বাংলার মৌখিক সাহিত্য- লোক সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ''ইহার 'নিরক্ষরা' ভাষা, লিখিত ভাষার ন্যায় সুরীতিতে শ্রেণীবিভাগ (২) করিয়া বাঙ্গ্লার আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তক্ষেত্রের উপর সাহিত্যের এক বিরাট মন্দির গড়িয়াছিল।" দেশের ছেলে-মেয়েদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটাতে, গৃহকর্ত্রীদের গৃহকর্মে একাত্ম করে তুলতে, যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের বহির্জগতের সদর্থক আলোচনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলাও তাঁর 'ঝুলি' রচনার উদ্দেশ্য ছিল।

- দক্ষিণারঞ্জন বাংলাদেশে গীত কথার সুরের মূর্ছনা আনতে চেয়েছিলেন, দেখেছিলেন 'পল্লীর আঁতুড়ঘর ঘিরিয়া (৩) এ জীবন্ত সুর।' চিন্তায়-চেতনায়-শয়নে-স্বপনে-জাগরণে

জননীর স্নেহধারার মত এ সুর বঙ্গবাসীর হৃদয়-মাঝে আসন করে নেওয়ার কাজে অংশ নিয়েছিল।

- তিনি 'গীত-কথা'র 'অমিত মনোমোহন সুর' শুনিয়ে বাংলার 'নক্ষত্রখচিত সন্ধ্যাকে ব্যগ্র-আনন্দে অধীর' করে তুলতে চেয়েছিলেন। যাতে সারাদিনের সকল শ্রান্তি শেষে কোন আবিলতা না থাকে, কৃষ্ণপক্ষ বা শুক্লপক্ষ যেকোন সন্ধ্যাই গীতের সুরে-আবেগে যেন মধুক্ষরা হয়ে উঠতে পারে— 'গীতকথা' সংরচনের এটাই অভীষ্ট। ''পৃথিবীর বিবিধ দেশ যাহা লইয়া আপনাদের কুটীর হইতে প্রাসাদ রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়, সুগৌরবগন্ধ ফুলের তোড়ায় সাজায়— আমরা অবাক দৃষ্টিতে দেখি, ঝরা পাপড়ি কুড়াই, তাহারই মত আমাদের গরিমা মহিমা, আমারই বাঙ্গালা মার অমর স্পর্শ, জাতির বেদনা - উল্লাসের মর্ম্মমর্য্যাদা— আপনতম আমাদের জিনিস,— অপরের মত এ জাতিও' (৪) তাহা জগতের বাহির করিতে পারে। আরব-পারস্যের 'একাধিক সহস্র রজনী' আসিয়া এ দেশ জুড়িয়া কত তারা-নক্ষত্র ফুটাইয়া গেল।" দক্ষিণারঞ্জনের বিশ্বাস ছিল বাংলার 'কথাসাহিত্য'ও বাংলার সাহিত্য-আকাশের প্রতিটা রজনীকে পবিত্র-সুন্দর-প্রাণোচ্ছল-গীতাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে।

- যতই লালবিহারী দে ইংরাজি ভাষায় লোককথা রচনা করুন, তাঁকে পূর্বসূরীর সম্মান জানিয়ে বলেছেন: ''কিন্তু ধন্য আমাদের লালবিহারী— আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক!— যিনি প্রাণের আহ্লাদে, অন্তরের আকুলতায়, দেশ-ধূলির এ ঝুলিকে দূরে না রাখিয়া সসম্মানে ঝাড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মজবুত বিলাতি ট্রাঙ্কে করিয়া বাঙ্গলার কথা-কাহিনী আধুনিক পৃথিবীতে স্বীয় সংলাপ জ্ঞাপন করিয়াছে।" (৫) দক্ষিণারঞ্জন স্বদেশি ট্রাঙ্কে বাংলার কথা-সাহিত্যকে সযত্নে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল—

''নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা— পুরে কি আশা?"

দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরদাদার ঝুলি* যে উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেছিলেন বলাই-বাহুল্য সে সবই সফল। 'উৎসর্গ অংশের শেষেও তাঁর একান্ত মনোগত বাসনা ধরা পড়েছে—

মা গো!

তোমরা জ্বেলেছ দীপ দয়ামাখা সোনা হাতে,

'ঘর ভরে এসে' আলো, ছুটে পড়ে আঙ্গিনাতে।

সে আঙ্গন-ধূলে বসি'— আমার বিভল প্রাণ,

ঘুম-ঘোরে গাই— শুধু— তোরি সুরে তোরি গান!

<u>উৎস</u>:

দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে সংকলিত যে গল্পটা একদিন গোটা বিশ্বকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছিল সেই "The story of Malanchamala which is typical of these tales, and has unique excellence, was obtained from an old woman of the Yugi Caste. This woman was aged over 100. People said she was 150 years old at that time."[৬] বৃদ্ধা ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিঙ্গেরের নিকটবর্তী কোন গ্রামের বাসিন্দা। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৯৯ সালে এই গল্প সংগ্রহ করেন। তিনি সেই সময় ঢাকার সাভারের অধিবাসী হলেও পিসিমার জমিদারির তদারকি করার জন্য টাঙ্গাইলে বসবাস করছিলেন। যে বৌদ্ধমহিলার কাছ থেকে গল্পটা সংগৃহীত তিনি আবার তাঁর প্রায় শতবর্ষীয়া 'আলাপিনী' পিতামহীর কাছে গল্পটা শুনেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি তাঁর সংগৃহীত 'পুষ্পমালা' গল্পটা স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেন। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী তাঁর 'ভারতী' পত্রিকায় 'পুষ্পমালা' প্রকাশ করেন। দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র অবশিষ্ট কাহিনিগুলো ১৮৯৬ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে সংগৃহীত। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র অন্যান্য কাহিনির উৎপত্তি সম্পর্কে বলা যায় : "এ গান-এ কাহিনী ঢাকা-টাংগাইলের যে কোনো ছায়া-ঢাকা পল্লী প্রান্তরে, জ্যোৎস্না রাতে গানের, গীতের বা গল্প বলার আসরে, ক্ষেত নিড়ানী, ফসল কাটার উন্মুক্ত প্রান্তরে, মেয়েলী আসরে, অথবা দাদী নানীর বৈঠকে আমরা কতবার শুনেছি। শুনেছি বন্ধু-বান্ধবের মুখে, বাড়ির বয়স্ক চাকর-চাকরানীদের কাছে। কী যে অপূর্ব মাদকতা ছিল এ কাহিনীতে, কাহিনীর প্রতিটি

শব্দে, ধ্বনিতে, গীতে, ছড়ায়। মনে হতো এ কাহিনী দেশের মর্মমূল থেকে উৎসারিত, আমারই হৃৎপিণ্ড থেকে সৃষ্ট।"[৭]

তাছাড়া সেকালে প্রায় প্রতিটা অভিজাত পরিবারেই 'আলাপিনী' বা গল্প কথক থাকত। এরা 'পরণকথা'র আসর বসাত। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন। তাহলে একটা বিষয় স্পষ্ট এই সব কাহিনি-কথক একজন নয়, বহুজন। দক্ষিণারঞ্জন বহুজন মানসের সোনার সিন্দুকে সযত্নে সংরক্ষিত গল্পের ঝাঁপিটা খুলে তাকে গ্রন্থের মধ্যে সংকলনের দায়িত্বটা পালন করেছিলেন। আর 'মালঞ্চমালা' সম্পর্কে আরো সংযোজন করা যায় : ''ঢাকা থেকে অদূরে সাভারের কাছেই আজও আছে মালঞ্চমালার দীঘি। হয়ত কাছেই ছিল কোন দুধবর্ণ রাজার রাজ্য। যদি সময় হয় তবে আপনিও দেখে আসবেন সে দীঘি। ভাঙা ঘাটের পাশে বসে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দীঘিতে ফেলে দিয়ে স্মরণ করবেন তাঁর পবিত্র নাম।"[৮]

<u>গল্পগুলো কীভাবে বলেছেন এবং তাতে লোককথা/ রূপকথা/ গীতকথার আস্বাদ কতটা রয়েছে</u>?

ঠাকুরদাদার ঝুলি এমন ধরনের লোকসাহিত্য যা অনুপম মূল্যের অধিকারী। এই গ্রন্থ উন্মোচন করে— ''the true nature of some of our indigenous stories and a language in which the ring of the original country dialect still lingers."[৯] *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে দক্ষিণারঞ্জনের যে বাচন-ভঙ্গি, তাতে অদ্ভুত এক মুক্তিবোধ মেলে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে দক্ষিণারঞ্জন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম্য-বৃদ্ধার কাছ থেকে সংগৃহীত কাহিনি সংরক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি ফোনোগ্রাফের সাহায্য নিয়েছিলেন। তিনি নিজে কোনও সংযোজন করেননি। এমনকী একেবারেই দেশীয়, একান্ত নিজস্ব যে ভাষায় গল্পগুলো পরিবেশিত হয়েছিল গ্রন্থকার তাকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম সংস্করণের ভাষা অতি প্রাচীন এবং দুর্বোধ্য প্রতিপন্ন হওয়ায় প্রকাশকের অনুরোধে তিনি পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের বেশ কিছু অংশ পরিবর্তন করেছিলেন।

প্রথম সংস্করণের 'জলা জাঙ্গাল নদ নদী উজাইয়া বুজাইয়া' — এই বাক্যটা পরবর্তী সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়। 'দণ্ডধরের পুতি', 'বায় বাতাস নিগুম', 'থির থাপাল কর‍্যা', 'নিরবাতি আঁধারপুরী', 'বায় বাতাস', 'দেখলে বাঁয় থামারে', 'নিগুম নিশুতি রাতে', 'গহিন পাতার নীচে', 'দুয়ারে পাথালে মানুষ' ইত্যাদি বহু অভিব্যক্তি পরবর্তী সংস্করণে সরলীকৃত করে পুনরায় লিখিত হয়। 'নিগুম নিশুতি রাতি'— এই শব্দগুলো ছাড়া রাতের নিস্তব্ধতাকে এত সুন্দরভাবে বোঝানো সম্ভব হত? 'নিগুম' শব্দের অর্থ নিঃশব্দ আর 'নিশুতি' শব্দের অর্থ গভীর নিদ্রামগ্নতা, শিশুর স্বপ্নে যা মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই দেশজ শব্দদুটোর পরিবর্তে যে কোন সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে শব্দগত গাম্ভীর্য আসবে ঠিকই কিন্তু সেক্ষেত্রে সমান আস্বাদন কখনোই হবে না। কিন্তু ছোটবেলা থেকে যাদের কান দেশীয় শব্দ শুনতে অভ্যস্ত তারা এই ধরনের শব্দের অর্থ অনুধাবন এবং তাদের গ্রাম্য আবেশ ও মূল্যের প্রশংসা করতে থাকে। আজকের নতুন প্রজন্ম, যারা সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ শুনে শুনে অভ্যস্ত তারা এইসব প্রাকৃত শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ তারা পুরনো দেশীয় জীবনযাপনের সঙ্গে সংস্রব হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের শব্দভাণ্ডারের পরিধি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং গল্পের ভাষাকে অতি শালীন করা দরকার— প্রকাশকের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এহি>এই, একহি > এক, বিহা > বিয়া-তে পর্যবসিত হয়। কিন্তু পরিবর্তিত শব্দগুলো কখনোই গল্পের প্রাচীন রূপ এবং সমান সাহিত্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে পারেনি। যেমন— দুর্ভাগ্যবশত 'গহিন পাতা' হয়েছে কচি পাতা। 'গহিন' শব্দের অর্থ অপ্রবেশ্য গাঢ়। শিশুকাল থেকে এই গাঢ়ত্ব বা ঘনত্ব বলতে আমরা বুঝি— যা সূচীভেদ্য নয়। 'কচি' বলতে বোঝায় অল্পবয়স্ক। আবার প্রথম সংস্করণে ছিল 'সুখে থাইকো', পরবর্তী সংস্করণে তা হয়েছে 'সুখে থেকো'। এই পরিবর্তনে মালঞ্চের আবেগ যেন কিছুটা হলেও স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়েছে, প্রথমের মত বাঁধভাঙা নয়। গল্পগুলোর বর্ণনাভঙ্গি নিঃসন্দেহে দক্ষিণারঞ্জনের স্বকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। যেটুকু পরিমার্জন-সংস্করণ তিনি করেছিলেন তা গল্পগুলোর জনপ্রিয়তা-সর্বজনবোধগম্যতার কারণে। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, ভাষা-ভঙ্গি, যুক্তি-বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র লৌকিক ধারণা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ, কথনভঙ্গি বজায় রেখে লোককথার নিজস্ব আস্বাদ যতটা সম্ভব সংরক্ষণের

চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র ভূমিকায়ই তো বলেছেন—দক্ষিণারঞ্জনের মত অমন জনপ্রিয় ভাষায় বাংলার অন্য কোন লোককথা সংগ্রাহক লোককথা সংকলন করতে পারেননি। এইভাবে "the old world is here with its antiquated forms, with its mannerisms and with its ideals, unvarnished and unmolested by modern influences."[১০] দশম শতকের জীবন-চর্যা, প্রাচীন সংস্কৃতির ছবি মালঞ্চমালার গল্পে প্রচুর পরিমাণা দেখা যায়। সেকালে বাংলাদেশের ঢাকা-টাঙ্গাইলের বৃদ্ধা 'আলাপিনী'রা এইসব গল্প-কথা অতি প্রাচীনতর ভাবধারাযুক্ত একটা নির্দিষ্ট ধরন বা ঢং-এ রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুঁড়েঘর সর্বত্রই পরিবেশন করত। মূল 'কথা'কে সংরক্ষণের জন্য তাদের দাঁড়ি-কমা, দীর্ঘশ্বাস এমনকী হাঁচি-কাশি পর্যন্ত এক কথকের প্রজন্ম থেকে অন্যদের মধ্যে বাহিত হত। তবে সম্পূর্ণ রীতি ছিল প্রাণবন্ত, সতেজতায় পরিপূর্ণ। যদি গল্পগুলো এই অসাধারণ রীতিতে সংরক্ষিত না হত তাহলে একজন অশিক্ষিত নারী, এমনকী যে নিজের নাম পর্যন্ত সই করতে অপারগ, সে মালঞ্চমালার গল্পের মত এত অসাধারণ জিনিস কীভাবে উপস্থাপন করত? "Daksina Ranjan got it from one of these tales, we need not attach any importance to the name, that appears on the cover, of one who, compiled them except for the purpose of grateful acknowledgement of his unselfish labour."[১১] দক্ষিণারঞ্জন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে লুকিয়ে থাকা এইসব সম্পদ বঙ্গবাসীর হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিলেন।

কিন্তু নতুন সংস্করণের ভাষা আধুনিক বাংলার নিকটবর্তী হওয়ায় এতে কাহিনির অন্তর্গত মূল্য কিছুটা অন্তত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই পরিবর্তনের সপক্ষে বলা যেতে পারে অতি প্রাচীন এই কথাবস্তুর বেশ কিছু অংশ পরিবর্তন-পরিমার্জন না করা হলে গ্রন্থটা হয়ত আজকের এই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারত না।

গল্পগুলোর বিষয়বস্তু:

ঠাকুরদাদার ঝুলি-র সংগ্রহে মোট পাঁচটা গল্প আছে। এই 'পাঁচ নহর' হল মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা।

'মধুমালা' : এক অপুত্রক রাজার মনে কোন সুখ নেই। আঁটকুড়ে অনামুখো রাজার মুখ দেখে রাজপুরীর মালী ঝাড়ুদারেরও আহারে সুখ থাকে না— একদিন একথা জেনে রাজা মনের দুঃখে ঘরের কপাটে খিল দেন। রাজপুরীতে হাহাকার ওঠে। রাজ্যপাট রসাতলে যেতে বসে। রাজার দুঃখে কাতর বিধাতাপুরুষ একদিন সন্ন্যাসী সেজে রাজদুয়ারে উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজা কপাট খোলেন। রাজার যাতে পুত্রলাভ হয় সেজন্য সন্ন্যাসী রাজাকে সোনার পাখি দিয়ে তার মাংস খেতে বলেন এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন— বারো বছর রাজপুত্র চন্দ্র সূর্য দর্শন করবেন না, করলে সংসার-উদাসী হয়ে যাবেন। রাজা কারিগর ডেকে এক 'অপূর্ব পাতাল-পুরী' নির্মাণ করান। যথাকালে রাজার পুত্র জন্মায়। রানী, রাজপুত্র মদনকুমারকে নিয়ে বারো বছরের জন্য পাতালপুরীতে রয়ে যান। এভাবে থাকতে থাকতে বারো বছর পূর্ণ হতে যখন আর মাত্র তিনদিন বাকি, এমন সময় রাজপুত্র রানীর কাছে বায়না ধরেন— তাঁকে চন্দ্রসূর্য দেখতে না দেওয়া হলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। রাজা খবর পেয়ে পুরোহিত-পণ্ডিত-যোগী-জ্যোতিষীর মতামত নিয়ে পাথরপুরীর কপাট ঘুচিয়ে দেন। মদনকুমার হেসে বাইরে আসেন। বছরের পর বছর যায়। একদিন রাজপুত্র মৃগয়া যাবেন ঠিক করেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা অনুমতি দেন। যেতে যেতে রাজপুত্র ও তাঁর ঠাটকটাকট এক পাহাড়বনে পৌঁছায়। কিন্তু কোথাও শিকার মেলে না। সূর্য ডুবে গেলে রাজপুত্র, রাজপুরীতে না ফিরে ময়দানেই বিশ্রাম নেবেন ঠিক করেন। নিশুতি রাতে কাল্‌পরী আর নিদ্রাপুরী দুই বোন, রূপের 'মণি' মদনকুমারের সঙ্গে 'মাণিকের ডালা', তাম্বুল রাজকন্যা, সুন্দরী মধুমালাকে মেলানোর জন্য মদনকুমারের পালঙ্ক উড়িয়ে নিনয়ে মধুমালার ঘরে তাঁর পালঙ্কের পাশে রাখেন। দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে অঙ্গুরী বিনিময় করেন। তারপর দুই পরী বোন, কন্যা-কুমার দুজনের পালঙ্ক বদল করে রাজপুত্রকে আবার পূর্বস্থান ময়দানে ফিরিয়ে দেন। চোখ মেলে মধুমালাকে দেখতে না পেয়ে রাজপুত্র কেঁদে উঠে 'হায় মধুমালা! হায় মধুমালা!' করতে থাকেন। তিনি ভাবেন তিনি মধুমালাকে স্বপ্নে দেখেছেন, কিন্তু পালঙ্ক, চাদর, অঙ্গুরী সবই নতুন দেখে রাজপুরীতে ফিরে মধুমালার দেশে যাওয়ার পণ করে বসেন। রাজপুত্রের ইচ্ছা অনুযায়ী লোকলস্কর চোদ্দ ডিঙা মধুকর সাজিয়ে রাজা-রানী চোখের জলে রাজপুত্রকে বিদায় দেন। রাজপুত্র সমুদ্রে পাড়ি দেন, কিন্তু ভীষণ তুফান ওঠায় লোকলস্কর মাঝিমাল্লা চোদ্দ ডিঙা

সব ডুবে যায়। প্রলয়-ঝড়ে মাঝ-সমুদ্রে তবু মদনকুমার 'মধুমালা, মধুমালা!' বলে কাঁদতে কাঁদতে ভেসে চলেন। ভাসতে ভাসতে অচেতন রাজপুত্র চম্পমান রাজার দেশে গিয়ে তীরে পৌঁছান। রাজকন্যা চম্পকলা পিতাকে বলেন মুখে যাঁর 'মধুমালা মধুমালা!' রব সেই তাঁর স্বামী। চম্পকলার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হয়। চম্পকলা মদনকুমারকে, মধুমালার সন্ধানে সাত নদীর কিনারে পঞ্চকলার দেশে যেতে বলেন। সেখানে পঞ্চকলার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হয়, পঞ্চকলা মধুমালার খোঁজে রাজকুমারকে চন্দ্রকলার দেশে যেতে বলেন। চন্দ্রবান রাজার দেশে রাজকন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে কুমারের বিবাহ হয়, চন্দ্রকলা রাজপুরীর স্বর্ণমন্দিরের চূড়ায় যে ময়ূর আছে সেই ময়ূরে করে রাজপুত্রকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেন। ওদিকে মদনকুমারকে দেখতে না পেয়ে মধুমালারও উন্মাদ হওয়ার মত অবস্থা, মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়েন। রাজকুমারীর সখীরা রাজার কাছে লিখন দেন। রাজা দণ্ডধরের কাছ থেকেও লিখন আসে। মধুমালার সঙ্গে মদনকুমারের বিয়ে হয়। তারপর মদনকুমার ময়ূরে চড়ে মধুমালাকে নিয়ে, আগের তিন স্ত্রীকে নিয়ে নিজের রাজ্যে পৌঁছে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন।

'পুষ্পমালা': এক নিঃসন্তান রাজা ও এক আটকুঁড়ে কোটাল। ফলে কারোর মনে সুখ নেই। একদিন রানী ও কোটালিনী দুজনে পুত্র-সরোবরের দুই পারে স্নান করতে গিয়ে রানীর ইচ্ছামত দুজনে শপথ করেন— রানীর ঘরে ছেলে বা মেয়ে আর কোটালিনীর ঘরে ছেলে বা মেয়ে হলে বিয়ে দেবেন, দুজনেরই ছেলে হলে বন্ধু আর মেয়ে হলে সই পাতিয়ে দেবেন। এদিকে রাজা আর কোটাল মৃগয়ায় গিয়ে দুজনের স্বপ্নের কথা আলোচনা করেন এবং রাজা বটের পাতায় লেখাপড়া করেন— কোটালের ছেলে ও রাজার মেয়ে হলে বিয়ে দেবেন, কোটালের মেয়ে ও তাঁর ছেলে হলে কোটালের গর্দান নেবেন, দুজনেরই ছেলে হলে কোটালকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। যথাকালে রাজার ঘরে কন্যা আর কোটালের পুত্রসন্তান জন্মায়। সকলের মনের কথা মনেই থেকে যায়। এভাবে পাঁচ বছর কেটে যায়। পাঠশালায় রাজকন্যা পুষ্পমালা সিংহাসনে আর কোটালপুত্র চন্দন মাটিতে বসে লেখাপড়া করেন। বারো বছর পর একদিন রাজকন্যার হাতের কলম কোটালপুত্রের আসনের কাছে পড়ে যায়। কোটালপুত্র রাজকন্যার হাতে কলম তুলে দেয়। এভাবে

সাতদিন একই ঘটনা ঘটতে থাকে। আটদিনের দিন কোটাল পুত্র কলম তুলে দেয় না। রাজকন্যা কোটালপুত্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোটালপুত্র বলে যদি রাজকন্যার সঙ্গে তার মালাবদল হয়, তবেই সে কলম তুলে দেবে। পরের দিন রাজকন্যার কলম ছোটে না, বরং কালি ঝাড়তে গিয়ে কোটালপুত্রের কলম রাজকন্যার গায়ে পড়াতে রাজকন্যার কালিমুখ হয়ে যায়। রাজকন্যা তখন কলম মাটিতে ফেলে দেন। পুকুরঘাটে রানী ও কোটালিনীর সত্য বিষয়ক কথোপকথন শুনতে পেয়ে পুষ্পমালা রানীর কাছে এর অর্থ জানতে চান, কিন্তু জবাব পান না। ঘরে ফিরে কোটালপুত্র বিছানার নীচ থেকে সেই শুকনো বটপাতা পায় এবং লিখন পড়ে ফেলে। সে বুঝতে পারে রাজা-রানী তাদের সত্য পালন করতে চায় না। কোটালপুত্র চন্দন, সত্যপালনের আশায় লিখন নিয়ে রাজসভায় গেলে রাজা তাকে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে বলেন। চন্দন লিখন নিয়ে সরোবরের জলে নামে। ওদিকে রাজকন্যা মায়ের সত্য বুঝতে মনের অস্থিরতায় সরোবরে গেলে চন্দনকে দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। চন্দন পুষ্পমালার আঁচলে সত্যের বটপাতা বেঁধে দিয়ে চলে যায়। জ্ঞান ফিরতে রাজকন্যা লিখন পড়েন এবং অনুভব করেন কোটালের ঘরই তাঁর ঘর। পুষ্পমালা ও চন্দন সিপাই সেজে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে ঘর ছাড়েন। চারদিন চলার পর তাঁরা আশ্রয়ের খোঁজে এক ডাকাতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। বুঝতে পেরে দুজনে আবার রওনা দেন, সাত ডাকাতও পিছু নেয়। পুষ্পমালা তরোয়াল দিয়ে ছয় ডাকাতের মুণ্ডু কাটেন। সাত নম্বরের মণ্ডু কাটতে গেলে সে ক্ষমা চায়। কিন্তু পরে সে-ই কুমারের মুণ্ডু কেটে ফেলে। পুষ্পমালা কাঁদেন। শিব-পার্বতী কৈলাসে যাওয়ার সময় তাঁর দুঃখে কুমারের জীবন ফিরিয়ে দেন। কন্যা-কুমার আবার চলতে থাকেন। আর এক রাজার রাজ্যে এক যাদুকরী মালিনীর জাদুতে চন্দন ছাগল হয়ে [D134.1 Transformation: man to he-goat][১২] মালিনীর পিছু নেয়। কিন্তু সতীত্বের তেজে পুষ্পের কিছু হয় না। পুষ্পমালা মনের দুঃখে রাজপুরীতে যান। রাজা তাঁকে রাজার আট প্রহরের অষ্টঢালির কাজ দেন এই শর্তে, যে তাঁকে শঙ্খিনী অজগর মারতে হবে। শঙ্খিনীকে মারতে গিয়ে দেখেন সেই মালিনীরূপী নারী তাঁর মা। আর মালিনীর মালী তাঁর পিতা। পুষ্পমালা কোটালপুত্র চন্দনকে পূর্বরূপে ফেরান। সত্যভঙ্গের অপরাধে অভিশপ্ত পিতা-মাতাকেও মুক্তি দেন।

তারপর কন্যা-কুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজা-রানী দেশে ফেরেন। তারপর কোটাল-কোটালিনীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে সকলে সুখে বাস করতে থাকেন।

'মালঞ্চমালা': এক নিঃসন্তান রাজা পুত্র কামনায় 'সমারোহ' করে যাগ-যজ্ঞ করলে আদেশ হয় তিনদিন তিনরাত উপবাসে থেকে চারদিনের দিন রাজাকে মালঞ্চের পাশে যেতে হবে এবং সোনার বরণ যুগল আমের বাঁয়ের ফল রানী আর ডাইনের ফল খাবে রাজা। [Fruit – conception from eating a f. T511.1][১৩] কিন্তু যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে রাজা আম পাড়তে পারেন না। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-যন্ত্রী কেউই পারেন না। শেষে কোটাল সেই অসাধ্য সাধন করেন। পথে বোঁটা ছিঁড়ে আমদুটো বদলে যায়। রানী খান ডানের আর রাজা খান বাঁয়েরটা। রানীর সন্তান সম্ভাবনা হয়। রানী এক অপূর্ব রূপবান রাজপুত্রের জন্ম দেন। ছয় ষষ্ঠীর রাতে দাই-মাসী মালিনী 'আঁতুড়ঘরের চৌকাট-পাশাপাশি' শুয়ে রানীকে 'অমুক রাজার সমুক রাজা'র রূপকথা, 'অমুক কুমারী সমুক কুমারী'র পরণকথা শোনায়। রানী ও মালিনী ঘুমিয়ে পড়লে ধারা-তারা-বিধাতারা মানুষ ডিঙিয়ে রাজপুত্রের কপালের লিখন দিতে যান। ফেরার পথে তারার পায়ের আঙুল মালিনীর গায় ঠেকায় মালিনীর ঘুম ভেঙে যায়। রাজপুত্রের লিখন জানতে মালিনী অনেক অনুরোধ করে। শেষে বিধাতা বলেন: 'রাজপুত্রের আয়ু মাত্র বারো দিন।' শোকে বিহ্বল রানী, রাজা, তাঁর জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, ব্রাহ্মণ সোনার 'আম্র বৃক্ষে'র তলায় এসে ধর্ণা দেন। তখন দেবতারা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেখানে গিয়ে বলেন বিধাতার বিধান মিথ্যা হওয়ার নয়। তবে বারো বছরের কন্যার সঙ্গে যদি সাত দিনের রাজপুত্রের বিবাহ দেওয়া যায়, তবে এই বিধান খণ্ডাতে পারে। ব্রাহ্মণের পায়ে রাজা রাজভাণ্ডার উপুড় করে দিলে তিনি শুধু একটা উজ্জ্বল হীরে নিয়ে কোটালের বাড়ির উপর ফেলে দিয়ে চলে যান। কিন্তু বারো বছরের কন্যা কোথাও নেই। সকলে আবার 'আম্র বৃক্ষের তলে' ধর্ণা দিলে সরোবরের ওপারে সেই হীরে ধুতে আসা কোটাল-কন্যার সাক্ষাৎ মেলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোটাল-কোটালিনী বারো দিনের আয়ু-শিশুর সঙ্গে মালঞ্চমালার বিয়ের সম্মতি দেন। কিন্তু বাসরঘরে দুধ তুলে রাজপুত্র মারা যায়। কোটালের গর্দান ও মালঞ্চের হাত কাটা যায়। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে মালঞ্চের দুই চোখ উপড়ে, নাক-কান কেটে চিতার

আগুনে শিশু-রাজপুত্র ও মালঞ্চকে ফেলে দেওয়া হয়। ভূত-প্রেত-পিশাচ সহ অনেকে মরা পতিকে ফেলে দেওয়ার জন্য অনেক প্রলোভন দেখায়। কিন্তু পতি বুকে আঁকড়ে ধরে মালঞ্চ নিশি পোহাতে অনুরোধ জানান। তখন মালঞ্চ দেখেন ডান দিকে দুধের হাঁড়ি,— 'এক নিলক্ষ্যের চড়া!' মালঞ্চ পূর্বের চেহারা, সুস্থ শরীর ফিরে পান। মালঞ্চ না খেয়ে না দেয়ে সেখানে থাকেন এবং পতিকে খাওয়ান, দাওয়ান, কাজল দিয়ে সাজান, একদৃষ্টে পতির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু দেবতারা অফুরন্ত দুধটুকু শুষে নিলে গাই বিয়োনো দুধের খোঁজে মালঞ্চ বেরোন। রোদ-বৃষ্টি থেকে স্বামীকে আড়াল করে এক গহন বনে গিয়ে পৌঁছান। মালঞ্চকে দেখে বনের এক কেঁদো বাঘও তার হিংসা পরিত্যাগ করে। চন্দ্রমাণিক বাঘিনীর দুধ খেয়ে বেড়ে ওঠেন। এভাবে পাঁচ বছর কেটে যায়। এবার বাঘের কাছে বিদায় নিয়ে স্বামীকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য মালঞ্চ শহরপাটে রওনা দেন। এক মালিনীর মালঞ্চে, মালঞ্চ গিয়ে হাজির হলে বারো বছর পর ফুলের সুগন্ধে মালঞ্চ ভরে ওঠে। মালঞ্চ সেখানে থেকে যান কিন্তু রাজপুত্রের পরিচয় দেন না। চন্দ্রমাণিক রাজপণ্ডিতের পাঠশালায় যান। পাছে 'মা' বলে ডাকে, তাই মালঞ্চ মাণিকের সামনে আসেন না। সেই দেশের দুধবর্ণ রাজার কন্যা কাঞ্চনমালা ও রাজার সাত পুত্র পাঠশালায় পড়েন। চন্দ্রমাণিকের রূপমুগ্ধ কাঞ্চনমালা মাণিককে বিবাহ করতে চান। সাত রাজপুত্রের কাছে বাজি জিতে মাণিক কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের চার দিনের দিন সাত ভাই চন্দ্রমাণিককে গারদে ফেলে রাখেন। মালঞ্চ এই খবর শুনে দুধবর্ণ রাজার ঘরে চন্দ্রমাণিকের অবস্থিতির খবর দিয়ে শ্বশুর-মহারাজার কাছে লিখন পাঠান। তারপর তিনি নিজের দেশে বাপের বাড়ির সরোবরে ডুব দিতে যান। পথে বাঘ-বাঘিনীর সঙ্গে দেখা। সব শুনে তারা মালঞ্চকে গায়ের আঁটালী দেয়, মালঞ্চ তা মাথায় দিতে অদর্শন হন। এদিকে লিখন পড়ে মালঞ্চের শ্বশুর দুধবর্ণ রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং হেরে গিয়ে বন্দী হন। মালঞ্চ কারাগারে গিয়ে চন্দ্রমাণিকের লোহার শিকল দাঁতে কেটে তাঁকে মুক্ত করেন। ওদিকে বাঘ-বাঘিনীর দলবল দুধবর্ণের রাজ্যে গিয়ে সকলকে খেয়ে রাজকন্যাকে খেতে গেলে মালঞ্চের অনুরোধে বাঘেরা রাজকন্যাকে মুক্তি দেয়। মালঞ্চ বাঘেদের জন্য সরোবরে জল আনতে যান। বন্দী রাজা কোটাল-কন্যাকে পুত্রবধূ হিসাবে স্বীকার না করে চন্দ্রমাণিক-রাজকন্যাকে রাজপুরীতে নিয়ে যান, মালঞ্চ দুয়ারে পড়ে থাকেন। মালঞ্চের মা

সায়রে ডুবে মরেন। কিন্তু মালঞ্চ যে সরোবরেই ডুবে মরতে যান, সেখানেই শ্বশুরের পাহারা। শেষে লুকিয়ে বাসরঘরের দুয়ারে গিয়ে ওঠেন, প্রাণভরে রাজপুত্র-রাজকন্যাকে নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু চারদিনের দিন রাজপুত্রের কাছে মালঞ্চ ধরা পড়ে যান। রাজা মালঞ্চকে চলে যেতে বলেন। বারো বছর এভাবে কাটে। মাণিকের সাত পুত্র জন্মায়, মরে যায়। সাত-আটদিন পর রাজা তাদের পথে কুড়িয়ে পান। রাজপুত্র রাজাকে বলেন, 'এ কোটাল কন্যার কাজ!' কিন্তু রাজা অবিশ্বাস করায় মালঞ্চ পিতা-মাতার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এরপরও রাজা কিছু বুঝতে না পেরে শিকারে যান। পথে ঠাট কটক বাঘে খায়, রাজা পথ হারিয়ে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘুরে বেড়ান। মালঞ্চ রাজাকে জল দান করেন। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে মালঞ্চকে নিয়ে যেতে চান। মালঞ্চ দুধবর্ণ রাজার রাজ্যের সকলকে বাঁচিয়ে তাদের সঙ্গে করে, মামা-মামী ও মালিনী মাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুরীতে ফেরেন। কাঞ্চীর হাতে গাঁথা মালা মালঞ্চ চন্দ্রমাণিককে পরিয়ে দেন এবং সুখে বাস করতে থাকেন।

'কাঞ্চনমালা': এক সওদাগরের পুত্র রূপলাল। তিনি রূপের সাগর। আর আছে এক মালিনী যে সওদাগরের বাড়িতে ফুল যোগায়। বৃদ্ধ সওদাগর উপযুক্ত পুত্রের বিবাহের জন্য দেশে দেশে লিখন দিয়ে লোক পাঠান। এক রাত্রে রূপলাল এক কাঞ্চনবরণ রাজকন্যার স্বপ্ন দেখেন। রূপলালের সেই স্বপ্নের সুযোগ নিয়ে মালিনী সরোবরের পাড়ে পিছন করে নিজের বোনঝিকে দেখায়। রূপলাল মুখ দেখতে চাইলে মালিনী বলে যদি সওদাগর বিয়েতে মত দেন তবেই তিনি তার মুখ দেখতে পাবেন। রূপলাল পিতার কাছে গিয়ে জেদ ধরেন কাঞ্চনবরণ কন্যা ছাড়া তিনি বিবাহ করবেন না। তখন সওদাগর অগত্যা দেশে দেশে নতুন লিখন পাঠান। পাহাড়-পর্বত-সাত সমুদ্র নদ-নদীর পারে এক সোনার রাজ্যে কাঞ্চনমালা কন্যার দেশ। কাঞ্চনমালা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন রূপের সাগর রূপলাল তাঁর স্বামী। তাঁর পিতা রূপলালের খোঁজে লোক পাঠান। বহুদিন পর এক পাহাড় মুলুকে এক বটগাছের নীচে রাজা ও সওদাগরের লোকজনের দেখা হয়ে যায়। যুগল বটপাতে লিখন লেখা এবং রূপ-কাঞ্চনের পট আঁকা হয়। তারপর পট বিনিময় করে লোকজন দেশে ফিরে যায় এবং রূপ-কাঞ্চনের বিবাহের দিন স্থির হয়। ওদিকে মালিনী ঘুমন্ত রূপলালের বুকের থেকে কাঞ্চনের পট ছিনিয়ে নিয়ে পটটাকে কুরূপ করে দেয়। সেই পট

দেখে রূপলাল স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। মালিনী তাঁকে বোঝায়, কাঞ্চন আসলে ডাইনি। তার দিকে তাকালে রূপলাল অন্ধ হয়ে যাবেন। রূপলাল তাই সাত পরত কাপড় চোখে বেঁধে বিবাহ করতে যান। বাসর পোহাতে না পোহাতে রূপলাল বাসর ছেড়ে চলে আসেন, আর সেমুখো হন না। কাঞ্চনকে কুঁড়েঘরে নির্বাসন দেন। দিন এভাবে কাটতে থাকে। একদিন শোনা যায় মালিনীর বোনঝির সঙ্গে সওদাগর পুত্রের বিয়ে। কিন্তু কোন না কোন বিপদ উপস্থিত হওয়ায় বিয়ে আর হয় না। একদিন রূপলাল বাণিজ্যে যাওয়ার আয়োজন করেন। এই সংবাদে কাঞ্চন স্বামীগৃহে গেলে রূপ পূর্ব্ববৎ তাঁর মুখদর্শন করেন না। ওদিকে বাণিজ্যে যাত্রাকালে নৌকা নড়ে না। কারণ সকলের বিদায় সারা হলেও সওদাগর স্ত্রীর কাছে বিদায় নেননি। বিদায় নিতে গেলে কাঞ্চন সঙ্গে যেতে চান, সওদাগর এক ভাঙা নৌকা কাঞ্চনকে দেন। সওদাগরের নৌকা তিনদিনের দিন ভেঙে 'খান্ খান্' হয়ে গেলে কাঞ্চন সকলকে বাঁচান। এক ঘাটে স্বামীকে বলি দিলে কাঞ্চন স্বামীর প্রাণ ফেরান। কিন্তু প্রত্যেকবারই সওদাগর ভাবেন হয় মালিনী, নয়ত তার বোনঝি তাঁর উপকার করছে। কাঞ্চন নিজের হাতের তেলোতে করে স্বামীকে রেঁধে খাওয়ান। কিন্তু মালিনী তার অভিসন্ধি পূরণের জন্য কাঞ্চনকে জলে ফেলে দেয়। জলে কাঞ্চনের রূপ দেখেন সওদাগর। ওদিকে ইন্দ্রের সভায় নর্তকী কাঞ্চনের সাত বোন, কাঞ্চনের বিপদ দেখে তাঁকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যান। মর-মানুষ হয়ে স্বর্গের অপ্সরার রূপ চোখে দেখায় রূপ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধে পরিণত হন। সংসারে সকলের চেয়ে সওদাগরকে যে বেশি ভালোবাসে সে যদি সাতপ্রহর উপবাসী থেকে তাঁর গলিত অঙ্গে চুম্বন করে তবেই তিনি জরামুক্ত হবেন। তবে চুম্বন যে করবে সে সায়র কিনারে তালগাছ হয়ে থাকবে। মালিনীর বোনঝি সওদাগরকে জরামুক্তি দেয়। স্বর্গের কাঞ্চন আবার রূপকে ধন, রাজত্ব দেন। রূপ তবু বাণিজ্যে যান, ফেরার পথে মালিনীর বোনঝির তালগাছের নীচ দিয়ে আসার সময় কাঞ্চনের আঁচল ধরে ফেলেন। কাঞ্চন রূপের সঙ্গে ঘর করেন। কিন্তু কাঞ্চন তো স্বর্গেরও নর্তকী। তাই রাত্রে স্বর্গে নৃত্য করতে যান, রূপও লুকিয়ে পড়েন। এমনকি কাণাবাদক তাল কেটে ফেলায় রূপ ঢোলও বাজান। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হন। তিনি রথ, হাতের পাখা কাঞ্চনকে পুরস্কার দেন। তালগাছ হয়েও বোনঝি সওদাগর পতির ঘর করতে চাওয়ায় মালিনী মন্ত্র পড়ে তাকে রূপ-সায়রে ফেলে দেয়, নিজেও ডুবে যায়। পূর্ণিমা রাত্রে সরোবরের জলে

রূপ-কাঞ্চন দেখেন সুন্দর সোনার নালে এক সহস্রদল পদ্ম [D2123 Transformation: woman to lotus India][১৪] ফুটে আছে। তাতে এক পরমা সুন্দরী কন্যার মুখ। কিন্তু কাঞ্চনের হাতের পাখার উল্টো বাতাস লেগে পদ্ম এক নাগিনী আর নাল এক ব্যাং হয়ে জলে ডুবে যায়। রূপ-কাঞ্চন ইন্দ্রের কাছে ছুটে যান। কিন্তু ইন্দ্র বলেন প্রতি বারো বছরের প্রথম পূর্ণিমা রাত্রে একদিনের জন্য ঐ পদ্ম ফুটবে। এইভাবে বারো বারো বছর পর বছর- পূর্ণিমার উৎসব নিয়ে, বারো যুগের যৌবন নিয়ে রূপ-কাঞ্চন সংসার করতে থাকেন।

'শঙ্খমালা' : এক সওদাগর। তাঁর পুত্র শঙ্খমণি, কন্যা কুঁজী। পুত্রের বিবাহ দিয়ে সওদাগর মারা যান। কুঁজীর বিবাহ হয় না। সংসারে শঙ্খমণির মন নেই, তিন বছর ধরে ঘরছাড়া। একদিন তাঁর মা পুত্রের খোঁজে বেরোন। ভেড়া চড়ানোর সময় রাজপুত্র মোহনলালকে জিজ্ঞাসা করে তিনি পুত্রের সন্ধান পান। এই রাজপুত্র ধনুক দিয়ে কালীদহের সব পাখি মেরে ফেলেছেন, শুধু রয়েছে ডিম। ঘরে ফিরতে নারাজ শঙ্খ মায়ের 'কিরা'য় বাঁশি ফেলে ঘরে ফেরেন। শঙ্খমণিকে বাণিজ্যে যেতে দেখে মোহনলাল হেসে বলেন : 'পদ্ম খায় বাঁশী বাজায় সে-ও শঙ্খমণি বাণিজ্যে যায়!!' একথা বলতেই সব মরা পাখি জেগে ওঠে, সব হাঁসের ডিম ফোটে। কেবল একটি হাঁস, হাঁসের রাজা মাণিক হংস হয়ে উত্তর না পূবে উড়ে যায়। যোড়কালীর পুজো দিয়ে, কালীসাগরে চোদ্দ ডিঙা মধুকর উঠিয়ে, সাত সন্তান মাঝি কর্ণধারকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্খ বাণিজ্যে যান। বিদায়কালে স্ত্রী শক্তিসুন্দর আটশত শঙ্খে গাঁথা মালা নিদর্শন হিসাবে স্বামীকে দেন। যাওয়ার সময় শঙ্খ রাত্রে স্ত্রীকে কপাট খুলতে নিষেধ করে যান। যেতে যেতে ছয়মাস কেটে যায়। এক রাত্রে ভরত-পুরাণ পড়ার সময় শঙ্খ বেঙ্গমার কথা শুনতে পান— আজ তাঁর ঘরে নীলমাণিক রাজার জন্ম হবে। তাই মাণিক-হংসের পিঠে চড়ে সাধু ঘরে ফেরেন। শক্তি কিছুতেই স্বামীর এই আগমন সংবাদকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কপাট ভেঙে শঙ্খ ঘরে ঢোকেন। আবার প্রহর থাকতে শঙ্খ চলে যান। এভাবে মাণিক-হংস শঙ্খকে পিঠে করে ছয়মাসের পথ প্রহরে নিয়ে এসে প্রহরে ফিরিয়ে দেয়। শঙ্খ তার আগমন সংবাদ মা-বোনকে দিলেও তাদের কানে পৌঁছায় না। ফলে সকাল হতেই কুঁজী শক্তিকে বনের পথে বের করে দেয়। বনের

পশু-পাখি তখন শক্তির আহার যোগায়। একদিন এক কাঠুরিয়া শক্তিকে দেখে দেবী মনে করে, শক্তিকে কুঁড়েঘরে বেঁধে দেয়। শক্তি চন্দন গাছের এক ডাল কেটে কাঠুরিয়াকে দিয়ে বলেন দরদাম না করে উপযুক্ত বেণেকে দিতে। এদিকে কাঠুরানী কাঠুরের খোঁজ করতে এসে শক্তিকে দেখে সতীন মনে করে এবং তার ক্ষতি করার পরিকল্পনায় রাজপুরীর দিকে রওনা দেয়। ওদিকে রাজার কিছুতেই পুত্র হয় না। কাঠুরানী রাজবাড়ির দাইয়ের সঙ্গে তাই শক্তির পুত্রকে চুরি করা ফন্দি আঁটে। ফিরে এসে দেখে পূর্ণ চাঁদের কোলে চাঁদ জন্ম নিয়েছে, পশু-পাখি-গাছপালা কুঁড়ের চারপাশে থরে থরে মোহর সাজিয়ে রেখেছে। সাতাশ চোর নীলমাণিককে চুরি করতে সহযোগিতা করে। জ্ঞান ফিরতে চাঁদ মাণিককে দেখতে না পেয়ে উন্মাদিনী হয়ে শক্তি পথে পথে ঘোরেন। সব ঘুরে সমুদ্রপাড়ে যান। তার দুঃখে বিধির দয়া হয়, শক্তি ঢেউয়ের আঘাতে অগাধ জলে মাঝ সমুদ্রে পড়ে যান। অমনি শঙ্খসাধুর শঙ্খমালা ছিঁড়ে জলে ডুবে যায়। নীলমাণিককে নিয়ে রাজবাড়িতে এসে দাই আর কাঠুরানী দেখে মরা পুত্র প্রসব করে রানী মারা গেছেন। কাঠুরানী তখন রানী সেজে বসে। নীলমাণিক বড় হয়, রাজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। শঙ্খমালা ডুবে যেতে সাধু, শক্তিসুন্দরকে ভুলে যান। তিনি মনের সুখে বাণিজ্য করেন। দেশের কথা মনেও পড়ে না। সমুদ্রের অগাধ জলের নীচে মাণিকহংসের হংসিনীর ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তাদের দেখতে এসে মাণিক হংস দেখে বাসার তলায় শঙ্খমালা। মালার কাছে শুনে মাণিক নদীর পাড়ে এক বটগাছে হংস তার পরিবার নিয়ে বাসা বাঁধে। একদিন সেই গাছ থেকে মালাটা পড়ে যায় এবং সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় নীলমাণিকের হাতে পড়ে। শক্তি বারো বছর সমুদ্রের নীচে অচেতন হয়ে থাকেন। সাগর-রানী শক্তির ঘুম ভাঙান। শক্তিকে বলে উত্তরে গেলে তিনি পুত্রকে পাবেন, পশ্চিমে দ্বিগুণ বাতাসে যদি তাঁর স্বামী পাল তুলে দেন তাহলে স্বামীকেও পাবেন। ওদিকে বারো বছর বেণের খোঁজে ঘোরার পর কাঠুরিয়ার সঙ্গে শঙ্খের দেখা হয়। কাঠে 'শ' অক্ষর দেখে তাঁর শক্তিকে মনে পড়ে। নীল মাণিকের রাজ্যে শক্তি এসে পৌঁছলে রানী-কাঠুরানী তাঁকে চিনতে পারে। তার দাসী-বাঁদিরা ধাক্কা মেরে শক্তিকে এক গর্তে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে দেয়। শঙ্খও মাণিক নদীর ঘাটে ফেরে, নীলমাণিকের হুকুমে শঙ্খকে আটক করা হয়। নীলমাণিকের গলার মালা দেখে শঙ্খ চিনতে পারেন। নীলের মন কেমন করতে থাকে। নীল একদিন গরম বোধ করায় সরোবরে স্নান করতে

গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন সেই পাথরের ওপর যার নীচে শক্তি চাপা পড়ে রয়েছেন। পাথরের নীচ থেকে গান শুনে শক্তিকে নীল উদ্ধার করেন। মায়ের বসবাসের সুব্যবস্থা করে নীল রানীমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর অন্য মা আছেন কিনা। কিন্তু সদুত্তর মেলে না। নীলের আসল মা কে দুধের ধারে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। শক্তিই নীলের প্রকৃত জননী প্রমাণিত হয়। তারপর মাণিক হংস এসে নীলরাজার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। মুক্ত হন সাধু শঙ্খ। শঙ্খ নীলমাণিক ও শক্তিকে ফিরে পান। শঙ্খ সওদাগর আপন ঘাটে মধুকর নিয়ে দুঃখিনী মাকে ফিরিয়ে আনেন। বোন কুমীরের পেটে যায়। নীল, নগরে ফিরে কাঠুরানী মাকেও আপন করে নিতে চান। কাঠুরিয়া বারো বছর পর দেশে ফিরে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও কাঠুরানী বাঁদি হতে চায় না। সে আর দাই অনাহারে থেকে মরে যায়। রাজা মোহনলাল ভেড়ার পাল হারিয়ে তপস্যায় যান। নীল রাজা সকলকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করেন। তারপর থেকে একবার ডঙ্কা বাজে রাজপুরে, আর একবার 'সাধুর পুরী দহের পারে'।

<u>তুলনা</u>:

ঠাকুরদাদার ঝুলি গ্রন্থের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন—

ইতিহাসমালা— *ইতিহাসমালা*-র ১২২ নং গল্প 'পত্নীহত্যায় উদ্যত বণিক' গল্পের রত্নাবতীর পাতিব্রত্যের সঙ্গে *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা— এদের সকলেরই পাতিব্রত্যের তুলনা চলে। আবার *ইতিহাসমালা*-র 'তপস্বী রাজকুমার, আহারনিদ্রাবিরহিতা রাজকন্যা' গল্পের রাজা চন্দ্রচূড় কন্যা চন্দ্রা, লাজলজ্জা ভুলে গিয়ে রানীর কাছে রাজা বীরধ্বজের পুত্র বীরবাহুকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন— "যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ দেও, তবেই প্রাণ ধারণ করিব; নতুবা মরিব।"[১৫] 'মধুমালা' গল্পের মধুমালাও লজ্জা ত্যাগ করে মদনকুমারের সঙ্গে বিবাহের জন্য পিতাকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বলেন : "বাবা! তবে তপাট খুলিতে পারি, যদি সত্য কর।"

***Folk-Tales of Bengal* —** 'Phakirchand' গল্পের পাতালপুরীর রূপসী রাজকন্যা, 'The Story of Rakshasas' গল্পের কেশবতী রাজকন্যা ও 'The Story of Hiramon' গল্পের সাত সমুদ্র তের নদীর পারের রূপসী কন্যারা প্রত্যেকেই স্বামীকে হারিয়ে ফেলে বিপন্মুক্তি ও স্বামীকে লাভের জন্য ব্রত রেখেছেন। অন্যদিকে *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র পুষ্পমালাও তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত কথনের জন্য ব্রত ও ব্রতকথার সাহায্য নিয়েছেন। 'Phakrichand' গল্পে পাতালপুরীর রাজকন্যা যখন জলের ওপর উঠে আসেন তখন সেই দেশের রাজপুত্র তাঁকে এক ঝলক দেখতে পেয়ে আরেকবার দেখতে পাওয়ার আশায় জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এভাবে থাকতে থাকতে উন্মাদপ্রায় হয়ে যান আর বলেন: "Now here, now gone! Now here, now gone!"[১৬] 'মধুমালা' গল্পের মধুমালা অদর্শনে মদনকুমারেরও প্রায় একই অবস্থা। তাল্‌পরী নিদ্রাপরী মদনকুমার আর মধুমালার মিলন ঘটিয়ে মদনকুমারকে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়ে দিলে ঘুম থেকে জেগে উঠে মদনকুমারের মুখে শুধুই "হায় মধুমালা! হায় মধুমালা!" 'The Story of Swet Basanta' গল্পে শ্বেতের স্ত্রী বনের মধ্যে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, যাকে সেই দেশের কোটাল চুরি করে তার মৃতবৎসা স্ত্রীকে দেয়। স্বামী-সন্তানহারা শ্বেত-পত্নী আত্মহত্যা করতে যান। তাঁকে এক ব্রাহ্মণ আশ্রয় দেন। অন্যদিকে শঙ্খমালাও বনের মধ্যে নীলমাণিকের জন্ম দেন, যাকে কাঠুরানী চুরি করে। শঙ্খমালা শোকে উন্মাদ হয়ে যান। সাগর-রানী তাকে আশ্রয় দেন।

পাতিব্রত্যের পরীক্ষায় *Folk-Tales of Bengal*, *ঠাকুরদাদার ঝুলি* তথা সমস্ত রূপকথার কন্যারা সসম্মানে উত্তীর্ণ। তবু সক্রিয়তার ক্ষেত্রে *Folk-Tales of Bengal* গ্রন্থের 'The Story of Prince Sobur' গল্পের সওদাগরের কনিষ্ঠা কন্যা, 'The Story of Hiramon' গল্পের রূপসী কন্যার সঙ্গে *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালার সক্রিয়তার তুলনা চলে। এঁরা প্রত্যেকেই শুধু দুঃখবরণ করেননি, নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে বিপদ থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

***হিন্দুস্থানী উপকথা* —** 'সাত রাজপুত্রের কথা' গল্পে পরীরানীকে হারিয়ে ছোট রাজকুমার শোকে কাতর হয়ে পড়েন এবং নানা প্রচেষ্টার পর তাঁকে উদ্ধার করেন। ঘুম ভেঙে

মধুমালাকে দেখতে না পেয়ে মদনকুমারেরও পাগলপারা অবস্থা হয় এবং অনেক চেষ্টার ফলে মধুমালাকে ফিরে পান। 'হীরা ও লালের কথা' গল্পের সঙ্গে 'পুষ্পমালা' গল্পের বহু সাদৃশ্য আছে। হীরা ও লাল এবং পুষ্পমালা ও চন্দন— সকলেই পালিয়ে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়েন। সেকথা বুঝতে পেরে হীরা ও লাল যখন সেখান থেকে পালান, তখন দুই ডাকাতের একজনের মা ও অন্যজনের স্ত্রী এক বুড়ি সংকেতবাক্য বলে চিৎকার করতে থাকে: ''পাখী উড়ে গেল, পাখী উড়ে গেল''[১৭]। পুষ্পমালা ও চন্দনকেও পালাতে দেখে সাত ডাকাতের মা চিৎকার করে— ''—শ্বেত সরষে' ফুটে যায়/ ওরে অভাগে'রা এখনো আয়!'' দুটো গল্পেই ডাকাতেরা যথাক্রমে লাল ও চন্দনের মাথা কেটে ফেলে। হীরা ও পুষ্পমালা হত্যাকারী ডাকাতের মাথা কেটে ফেলে প্রতিশোধ নেন। তারপর আকাশপথে যাওয়ার সময় শিব-পার্বতী হীরা ও পুষ্পমালার শোকে কাতর হয়ে তাঁদের স্বামীদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। তারপর দুটো গল্পেই তাঁদের পথচলা শুরু হয়। এরপর এক নগরে পৌঁছানোর পর এক যাদুকরী পানওয়ালী লালকে এবং এক রাজার রাজ্যে পৌঁছানোর পর এক যাদুকরী মালিনী চন্দনকে ছাগল বানিয়ে ছাগল বানিয়ে দেয়। এরপর হীরা ও পুষ্পমালা বিষধর কালসাপ ও শঙ্খিনী অজগরকে মেরে ফেলেন। 'পুষ্পমালা' গল্পে এরপর অবশ্য আবিষ্কৃত হয় যে মালিনী ওরফে অজগর পুষ্পমালার মা। এই ঘটনাটা 'হিন্দুস্থানী উপকথা'য় নেই। যাই হোক দুটো গল্পেরই নারীরা তাঁদের স্বামীদের উদ্ধার করেন।

পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা— মৈমনসিংহ থেকেই যেহেতু মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা ও পুষ্পমালার গল্প সংগৃহীত হয়েছে তাই মৈমনসিংহগীতিকা বা পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার অনেক কাহিনির সঙ্গে 'গীতকথা'র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মূল সাদৃশ্য হচ্ছে মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা, পুষ্পমালা— এঁদের সঙ্গে মহুয়া, মলুয়া, কমলা, রূপবতী, লীলাবতী, কাজলরেখার সতীত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতার। মহুয়া যেমন সাধু বা সওদাগরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে—

পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল।
চুন-খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল।।
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে।
রসের নাগইরা পান খায় সুখে।।[১৮] ('মহুয়া পালা')

পুষ্পমালাও ঘেসেড়া তথা ডাকাতকে বলেন— ‘‘ডাকু আজ মনভরা সুখ; এস আমি তোমার মুখে পাণ দিই, তুমি আমার মুখে পাণ দাও!’’ এরপর ডাকু পান দিতে মাথা বাড়ালে পুষ্পমালা তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলেন।

মহুয়ার প্রেমে মুগ্ধ চান্দ বিনোদ নিজের পরিচয় দেয়:

কুড়া শীগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম।
পরিচয়-কথা মোর সত্য কহিলাম।।
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর।
আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর।।

মলুয়া উত্তরে বলে:

বাপের নাম হীরাধর অসমা মোর মাও।
কালী দেখলাম জলের ঘাটে শুইয়া নিদ্রা যাও।।
ভিন দেশী পুরুষ তুমি কি কহি তোমারে।
অতিথ হইয়া আজি থাক আমার বাপের ঘরে।।[১৯] (‘মলুয়া পালা’)

‘মধুমালা’ গল্পের মদনও বলেছেন:

‘‘উজানী নগর ঘর, পিতা নৃপ দণ্ডধর,
তাঁ’র পুত্র,— মদনকুমার।’’
....
‘‘কন্যা, তোমার পরিচয়?’’

কন্যা বলেন,

‘‘ভাটিনা সাগর ঘর, পিতা তাম্বুল রাজবর,
তা’র কন্যা,— নাম মধুমালা।’’

কঙ্কের শোকে লীলাবতী বলে—

‘‘আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয়।

তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালায় তনু দগ্ধ হয়।।"[২০] ('কঙ্ক ও লীলা পালা')

কাঞ্চনমালা কেঁদে বলেন—

"অভাগী কাঞ্চন বরণ ঢালিয়া দিব, ছাড় জীবন না রাখিব,
একটিবার চাও স্বামী! আমি নিশির বাসর জাগি রে!"

'কাজলরেখা পালা'য় রয়েছে সন্ন্যাসীর আদেশে কাজলরেখা আত্মপরিচয় দেয় না, তাহলেই বিধবা হবে। কুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু মুগ্ধতা প্রকাশ করে না।

গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ।
কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস।।
প্রভাতের ভাণু জিনি ছুরত সুন্দর।
একে একে দেখে কন্যা সর্ব্ব কলেবর।।

অন্যদিকে কুমারেরও একই অবস্থা—

কন্যারে দেখিয়া কুমার লাগে চমৎকার।
এমন নারীর রূপ না দেইখ্যাছে আর।।
পরথম যৌবনে কন্যার হীরা-মতি জ্বলে।
কন্যারে দেখিয়া কুমার কহে মিঠা বুলে।।[২১] ('কাজলরেখা পালা')

'মালঞ্চমালা' গল্পের মালঞ্চমালাও রাজপুত্রকে প্রাণভরে দেখে বলেন— "আহা!— কি শোভা!" তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। রাজপুত্রও কাহিনির প্রায় শেষাংশে মালঞ্চকে বলেন—

দেখ দাসী যদি তুমি তবে কেন সেই মুখ,
যে মুখ দেখিনু আমি মালঞ্চেরি বাটে?
অঙ্গে, কেন দেয় কাঁটা, বুকে রক্ত জোয়ার ভাঁটা;
আমি যেন হইলাম মানুষ ওই কোমল হাতে!—"

মালঞ্চও নিজে থেকে রাজপুত্রকে আত্মপরিচয় দেননি, শুধু স্বামীর কল্যাণ কামনা করে গেছেন।

'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা'য় 'মদনকুমার ও মধুমালা'র গল্প আছে। তবে কাহিনিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন— 'বান্ন' বছরের মধ্যে রাজা মদনকুমারের মুখ দেখলে রাজা গাছ হয়ে যাবেন। মদনকুমার ও মধুমালার সাক্ষাতের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে— ইন্দ্রের সভার তিন নর্তকী কন্যা তিন বোন। তাঁরা কাঁচা সরার ওপর উঠে নাচতেন। একদিন নাচতে নাচতে ছোট বোনের নাচের সরা ভেঙে যায়। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ছোটবোনকে অভিশাপ দেন বারো বছর মর্ত্যে মানুষের ঘরে জন্ম নিয়ে আরও বারো বছর খুব দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার পর পাপমোচন হলে ছোটবোন আবার তাঁর সভায় স্থান পাবেন। ছোট বোন মর্তে জন্মান। বড় আর মেজ বোন নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে বোনের পাত্র হিসাবে মদনকুমারকে খুঁজে দেন। 'মধুমালা' গল্পে এ দায়িত্ব নিয়েছেন কাল্‌পরী আর নিদ্রাপরী। কিন্তু মধুমালা ও মদন এক হয়েও আলাদা হয়ে যান। মদন মধুমালার খোঁজে বেরোন। একরাজ্যে এসে শোনেন সে দেশের রাজকন্যা 'মদনকুমার মদনকুমার' করে করে পাগল হয়ে গেছেন। এরপর মদনকুমার বনের মধ্যে দুটো পাতা-দুটো ফলওয়ালা গাছের একটা ফল খেয়ে অন্ধ হয়ে যান। মধুমালা জানতে পারেন তাঁর স্বামী অন্ধ। গাছের ওপর বসে থাকা দুই বোনের কথা শুনে মধুমালা জেনে নেন বনের মধ্যে অমৃতফলের গাছ আছে। সেই গাছের একটা ফল এনে খেলে মদনের অন্ধত্ব দূর হবে। কিন্তু ভালো হয়ে লোভের চোখ দিয়ে মধুমালাকে দেখলে মদনকুমার পুনরায় অন্ধ হয়ে যাবেন আর ভালো হবেন না। আর সেটা বারো বছরের জন্য। মধুমালা বারো বছরের জন্য স্বামীকে ছেড়ে যাবে ঠিক করেন। একদেশের এক রাজকুমার মধুমালাকে নিয়ে যান। মধুমালা সেখান থেকে পালান। এদিকে মদনকুমার পরীর স্থানে চলে গেলেও তোতাপাখি হয়ে গেছেন। বড় দুই বোন পাখি হয়ে মধুমালাকে বলেন ইন্দ্রপুরীর মধ্যেকার অমৃত সরোবর থেকে জল এনে তোতাপাখিরূপী মদনের গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে তিনি মানুষ হয়ে যাবেন। মধুমালা সতীকন্যা বলে ইন্দ্রপুরী যেতে পারেন ও মদনকুমারকে পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেন। তারপর মধুমালা মদনকুমারকে দেওদানবপুর থেকে উদ্ধার করেন। তারপর নীলপাথরের পুরীতে মদনকুমার বন্দী হন,

তারপর রাক্ষসপুরীতে। সেইসব স্থান থেকেও মধুমালা কুমারকে উদ্ধার করেন। কিন্তু বারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মধুমালা নিজের পরিচয় দেন না। বারো বছর পূর্ণ হতে যখন ছয় মাস বাকি, মধুমালা ডোমনীর বেশ ধরেন। বারো বছর শেষ হতে তিনদিন বাকি থাকতে ডোমনীর বেশে কুমারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মদন সেখানে মধুমালার শোকে অভুক্ত অবস্থায় জোড়মন্দির ঘরের কপাট লাগিয়ে রয়েছেন। বারো বছর পূর্ণ হলে সতীকন্যা মধুমালা যেতেই তিনি কপাট খোলেন। দুজনের মিলন হয়। এই বারো বছর আলাদা থাকা, মদনকুমারকে নানা দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার কাহিনি 'মধুমালা'য় নেই। দক্ষিণারঞ্জনের মধুমালার এই সক্রিয়তা দেখা যায় না।

Tales from Bangladesh— 'King Dalim and the Apsaras' গল্পের বিষয়বস্তু হল রাজপুত্র ডালিমকুমার বিয়ের পর মারা যান। তাঁকে একটা বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়। পরীরা রাজপুত্রকে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দিয়ে বাঁচান ও খাইয়ে যান। তাঁর স্ত্রী একদিন সোনার কাঠি ছুঁয়ে ফেলেন, রাজপুত্রও বেঁচে ওঠেন। তিনি রাজপুত্রকে বলেন তাঁর পুত্রসন্তান হয়েছে। তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার উপায় কি? রাজপুত্র বলে দেন পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন সব পরীকে নিমন্ত্রণ করতে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে তাঁর স্ত্রী যেন পরীদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেন। পরীরা স্ত্রীকে সাবিত্রীর মত হতে বলেন। ফলে স্ত্রীর আশীর্বাদের কল্যাণে রাজপুত্র প্রাণে বেঁচে যান। বিয়ের পরে রাজপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে 'মালঞ্চমালা' গল্পের মিল আছে। আর স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে 'মালঞ্চমালা'র সঙ্গে ডালিমকুমারের স্ত্রীর সক্রিয়তার তুলনা চলে না। তবে পাতিব্রত্যের ক্ষেত্রে মিল তো রয়েছেই। সেক্ষেত্রে 'পুষ্পমালা', 'কাঞ্চনমালা'-ও তুলনীয়। 'The Prince and the Sages' গল্পে ভাগ্যদেবী রাজপুত্রের জন্মের পঞ্চমদিনে কপালে লেখেন বারো বছর বয়সে রাজপুত্রের বিয়ে, সেই বছরে তাঁর মৃত্যু হবে। 'মালঞ্চমালা' গল্পে রাজপুত্রের আয়ু ছিল বারো দিন। 'The Prince and the Sages' গল্পে রাজপুত্র বেড়িয়ে পড়েন। তাঁর নিজের কর্মগুণে তিনি নিজের জীবন ও রাজকন্যাকে ফিরে পান। আর মালঞ্চমালার কল্যাণে রাজপুত্র জীবন ফিরে পেয়েছেন, মালঞ্চমালা ফিরে পেয়েছেন স্বামী-সংসার। 'Adis Wife' গল্পের সঙ্গে *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র গল্পগুলোর বিষয়গত পার্থক্য থাকলেও

আদির স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা, কাঞ্চনমালা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

<u>লোকসাংস্কৃতিক উপাদান বিন্যাস</u> :

১. **টাইপ ও মোটিফ:** *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে ব্যবহৃত লোককথার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা টাইপ এবং ছোট ছোট কাহিনি অংশ বা মোটিফগুলো হল:

ক. 'মধুমালা'—

টাইপ: আকাশপথে পাখি-বাহিত রাজকুমার

মোটিফ: দুই পরী বোন, আকাশপথে যাত্রা, সোনার পুরী, ফুলপাখা, পণ হিসাবে স্বর্ণমন্দিরের চূড়ার সোনার ময়ূর গ্রহণ, ময়ূর-বাহিত রাজপুত্র।

খ. 'পুষ্পমালা'—

টাইপ: কোটালের স্বপ্নপূরণ

মোটিফ: রাজার সত্যভঙ্গ, বটপাতার লিখন, রাজকন্যা ও কোটালপুত্রের সিপাই-এর ছদ্মবেশ, আকাশে শিব-পার্বতীর আলোক-রথ, কোটাল পুত্রের পুনর্জন্ম, ছাগলে পরিণত হওয়া, শঙ্খিনী অজগর নিধন, পুত্র-সরোবর।

গ. 'মালঞ্চমালা'—

টাইপ: বারো দিনের রাজপুত্র ও বারো বছরের কোটালকন্যার বিবাহ

মোটিফ: সোনারবরণ যুগল আম, রাজপুত্রের বারো দিন আয়ু, মরা পতি কোলে নিয়ে চিতার ওপর মালঞ্চমালা, যমদূতের ভাই, সমবয়সী বোন, নিলক্ষ্যের চড়া, বাঘমামা, মালিনীর মালঞ্চ, পক্ষিরাজ ঘোড়া, কোটালের রাজগি ইত্যাদি।

ঘ. 'কাঞ্চনমালা'—

টাইপ: স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা

মোটিফ: স্বপ্নের কাঞ্চন, মালিনীর বোন্-ঝি, পটচিত্র, কাঞ্চনমালার নির্বাসন, সওদাগর পুত্রের বাণিজ্যযাত্রা, নরবলি, সাতপরী সাত তারার এক বোন কাঞ্চন, রূপলালের জরা, সোনায় বাঁধানো তালগাছ, স্বর্গের রথ, রূপসায়রের জলে সোনার নালে সহস্রদল পদ্ম, নাগিনী ও ব্যাং, প্রতি বারো বছরের প্রথম পূর্ণিমার রাতে একদিনের জন্য সরোবরের পদ্মের ফুটে ওঠা, ময়ূর-পাখার শীতল বাতাস।

ঙ. 'শঙ্খমালা'—

টাইপ: শঙ্খ সাধুর ঘরে নীলমাণিক রাজার জন্ম

মোটিফ: শঙ্খমণির বাণিজ্যযাত্রা, রাজার বেটা মোহনলাল, হাঁসের রাজা মাণিক হংস, চোদ্দ ডিঙা মধুকর, কালীসাগর, মাণিক হংসের পিঠে ছয় মাসের পথ এক প্রহরে যাত্রা, নীলরাজার জন্ম, সাধুর গলায় শঙ্খের মালা, সোনার হাতের আখর, রানী কাঠুরানী, নীলমাণিকের মা শঙ্খমালা।

গল্পগুলোতে ব্যবহৃত 'টাইপ'-এর সম্বন্ধে তাই বলা যায় : ''It may indeed hapen to be told with another tale, but the fact that it may appear alone attests its independence''[২২] অন্যদিকে মোটিফ হল ''the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.''[২৩]

২. **ছড়া/ প্রবাদ/ লৌকিক অভিব্যক্তি:** *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র অপর নাম যেহেতু 'গীতকথা', তাই *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে ছড়ার মতই গীতের ব্যবহারও অজস্র।

'গীতকথা'র উৎসর্গ অংশ ছড়া দিয়ে শুরু হয়েছে—

- রাঙা মেঘে কিরণ ঢেলে দূর বহু দূর

পাটে বসেন ঘুমের চোকে সূর্য্য ঠাকুর।
চিকিমিকি কচি পাতা, নদীর ঢেউ সোনা,
আকাশ পথ ছেয়ে উঠে বাঙ্গ্লা মা'র ধুলা।

....

বুক-জোড়া ধন বাঙ্গ্লা-মা'র
কি দিয়ে আমি শোধব্ ধার?

ছড়ার মাধ্যমে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর *ঠাকুরদাদার ঝুলি* বঙ্গজননীকে উৎসর্গ করেছেন।

প্রত্যেক 'কথা'র শুরুতে ছড়ার মাধ্যমে কাহিনি সূত্রাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

- একহি কুমার ছিল নামেতে মদন।
  বারো হি বৎসর থাকে পাথর ভবন।
  থাকিতে রে তিন দিন বিধি হ'ল বাম।
  পাতাল পাথর ভেঙে বাহির হ'ল চাঁদ।
  চাঁদ না বাধন মানে, কপালের খেল্।
  শিকারে গেল রে কুমার বুকে দিয়া শেল। ('মধুমালা')

- পঞ্চম বয়স হ'তে, কন্যা পুষ্পমালা
  রাজা, দিল পাঠশালা।
  একই গুরুর কাছে পড়ে দুইজন
  পুষ্পের প্রতিমা কন্যা, কোটালের চন্দন নন্দন। ('পুষ্পমালা')

ছড়া কাহিনিকে অগ্রগতি দিয়েছে। যেমন—

- দুইদলে ছিল বহু 'বাঘা' চিত্রকর,
  অঙ্গুলি চিরিয়া, পট আঁকিল বিস্তর!
  তা'র মাঝে দুটি পট হ'ল অনুপম;—
  রাাখিল সেই দুই পট ডাহিন আর বাম।

পলক ফেলিতে নারে, বলে লোকজন,—

"এ কি, চিত্র?— না, এ সত্যই রূপ আর কাঞ্চন?" ('কাঞ্চনমালা')

বাঘেরা কাঞ্চীমালাকে খেতে গেলে মালঞ্চমালা বলেন—

- "কর কি, কর কি মামী মামা!— করিলা সর্বনাশ!

  বংশে বুঝি না রাখিলা বাতি, হায়! খাইলা রাজ্যবাস!

  না খাইও, না খাইও মামী মামা!— আমার,

  স্বামীর শ্বশুর শাশুড়ী, আমার সোয়ামীর শালা,

  না খাইও, না খাইও মামী মামা, রাজকন্যা কাঞ্চীমালা

  আমার সোয়ামীর নিধি।—" ('মালঞ্চমালা')

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়ার ব্যবহার। যেমন—

- দাই কাঠুরাণী ঝাঁপের ফাঁক দিয়া দেখে, জ্যো'স্না——— "কে!"

  "অ্যাঁ,— অ্যাঁ— আম্‌রা আম্‌রা।"

  "তোরা কি বাছা, চোরেরা?— তবে ঘরে আয়।"

  "কে?— দাই মাসী!— রাজবাড়ী ছাড়িয়া এখানে!— তা' মাসী, কিসের জন্য।"

  মাসী বলে,— "দ্যাখ্—

  হাত সুড়্‌সুড়ি পা সুড়্‌সুড়ি,

  বাছারা, কর্‌তে কি পারিবি চুরি?" ('শঙ্খমালা')

- রাজকন্যা বলিলেন,— "কোটালপুত্র! কলমটি তুলে' দাও।"

  কোটালপুত্র সেদিনের মত কলম তুলে দিলেও আটদিনের পর কলম তোলেনা।

  তখন রাজকন্যা বলেন,—

  "নিতুই যে কলম ছুটে, নয়ন তুলে' চাও,

  আজ কেন কোটালপুত্র! তুলে' না দাও?"

  কোটালপুত্র বলে— "রাজকন্যা, এতদিন তুলিলাম আজ কেন তুলি না? যদি,—

মালা যদি বদল হয়, রাজকন্যা, তো কলম তুলি, নইলে রাজকন্যা, আর আমি কলম তুলিব না।” ('পুষ্পমালা')

প্রশ্নোত্তরের এই শৃঙ্খলা 'কথা'র মৌখিক পরম্পরার পরিচয় দেয়।

ছড়া কাহিনিকে সমাধানের দিকেও নিয়ে যায় যা গল্পের প্রাচীনতার প্রমাণ দেয়। যেমন—

- রাজপুত্র মালঞ্চমালাকে বলে—

দেখ দাসী যদি তুমি, তবে কেন সেই মুখ,
যে মুখ দেখিনু আমি মালঞ্চেরি বাটে?
অঙ্গে, কেন দেয় কাঁটা, বুকে রক্ত জোয়ার ভাঁটা;
আমি যেন হইলাম মানুষ এই কোমল হাতে!—('মালঞ্চমালা')

- ''পুষ্প! পুষ্প! চন্দন! কুমার!
ফিরিলাম আপন বেশে।
সত্য পূর্ণ হইল আজ চল আপন দেশে!” ('পুষ্পমালা')

গীতের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যেকথা প্রথমেই বলা দরকার, তা হল *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র গানগুলোর অভিনয়ধর্মিতা। যেমন—

- ''ও গো আমি না জানিলাম বাপ, আমি, না জানিলাম মা,
আমি খে'লাম থু'লাম তোমার কোলে,— আমার স্বর্গের স্বর্গ শ্বশুরঘর রে!
আজ, না সুধা'য়ে, না বুঝা'য়ে শক্তিরে তোমার, হায় গো,
অন্নজল অভাগীর কোন্ জলে, ঢালিলে কেমন করে!'
ওরে আমি— কোন্ বা জন্মে মায়ের দুধ বুঝি দাঁতে করে' কাটিলাম,
কোন বা জন্মে কা'র ঝিয়ারীরে ক্ষার খৈল না দিলাম— রে,
সেই জন্য শ্বশুর-ঘর! তোমারে ছেড়ে' যেতে অভাগীর হ'ল রে!” ('শঙ্খমালা')

- হায়! যদি স্বপন মিথ্যা হয় অঙ্গুরী কেন বদল হয়?

স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার দেশ রে!

স্বপন যদি মিথ্যা হয়, চাদর কিসে বদল হয়?

স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার কেশ রে!

দেখ, যদি স্বপন মিথ্যা হয়, পালঙ্ক কি বদল হয়?

হায়! স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার বেশ রে!" ('মধুমালা')

গানগুলোতে আবেগধর্মিতা স্পষ্ট। যেমন—

- "সুখে থেকো, সুখে থেকো রে রাজপুত্র, সুখে থেকো রে রাজকন্যা!

  যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলে!—

  বাসরের বাতি যেন শত পুরুষ জ্বলে, রাজছত্র যেন সহস্র পুরুষ ছত্র ধরে!

  জল স্থল বল বৃক্ষ যেন সজীব হইয়া থেকো রে,

  রাজমন্দিরের চূড়া যেন অজয় হইয়া থেকো,—

  জন্ম যুগ-যুগ সোণার কিরণে, রাজ্যের চূড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য যেন জ্যোতিঃ ধরে।

  আমার শ্বশুরের ঘর, আমার সোয়ামীর পিড়ী,

  ওগো, অক্ষয় করে' রেখো তুমি পরমেশ্বর!" ('মালঞ্চমালা')

- হায়! প্রথম শিকারে গেলাম, জঙ্গল মাঝে শু'য়ে র'লাম'

  পরাণ মধুমালার বাসর যে দেখি!

  সেই পাখীর উদ্দেশ করে' চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসাইলাম,

  বাপ মায়ের আহা চোকে জল লিখি'!—

  — পরাণ মধুমালা রে!—" ('মধুমালা')

এসব গান যেকোন শ্রোতার মনকেই আকুল করে দেয়।

ছড়ার মতই গানগুলোও কাহিনির অংশ। যেমন—

"শুন, শুন, শুন রাজা শুন সাবধান—

বারো বৎসর আগে রাজা, না খুলিহ ধাম!!

খুলিলে, উদাসী হ'য়ে ঘুরিবে সংসার

তপ্ত সোণার বাছা,— রাজা, মদন তোমার!"

গানের মধ্যেও প্রশ্নোত্তর পরম্পরা রয়েছে। যেমন—

মধুমালা— ''কোন্ দেশ তব ধাম, পিতামাতার কিবা নাম?

বল শুনি, কি নাম তোমার?"

মদনকুমার— ''উজানী নগর ঘর, পিতা নৃপ দণ্ডধর,

তাঁর পুত্র,— মদনকুমার।"

আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''কন্যা, তোমার পরিচয়?"

মধুমালা— ''ভাটিনা সাগর ঘর, পিতা তাম্বুল রাজবর,

তাঁ'র কন্যা,— নাম মধুমালা"। ('মধুমালা')

'গীতকথা' যেহেতু পরিণত মনস্কের 'কথা', তাই এর গানের ভাষাও অনেক পরিণত। যেমন—

''যে তুরগে শোওয়ার হ'য়ে, মহারাজা, গেলা যে মালঞ্চ;

যুগল ফল পাইলা মহারাজ, পুত্র নিয়া বঞ্চ।।

শূন্যে এল কোটালকন্যা, শূন্যে বিয়া হ'ল।

সেই কোটাল কন্যা আজ, মহারাজ, তুরগ নিয়া গেল।

বারো বৎসর পূর্ণ না হইল, মহারাজ, ক্ষমিও দিন কয়।

বারো বৎসর পূর্ণ হইলে, মহারাজ, হবে পরিচয়।" ('মালঞ্চমালা')

এই ভাষা অনেক আধুনিক। বোঝা যায়, ছড়া বা গান সবই খুব সার্থকভাবে 'গীতকথা'র শরীরে জুড়ে আছে।

ঠাকুরদাদার ঝুলি-তে প্রবাদ/ প্রবচন/ বাগ্‌ধারার বহুল ব্যবহার হয়েছে। 'মধুমালা' গল্পে রয়েছে—

- অনামুখো

- আঁটকুড়ে
- আকাশের চাঁদ কি পাতালের দেবতা
- ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদ, উগ্‌রানো চাঁদ
- খৈ দৈ
- সোণার অঙ্গে ধূলা
- হরিণ-নয়নী, কমল-আঁখি
- সাতপুতি চালনীবাতি
- প্রভাতকালের ভিজা নিওর
- সূয্য-কিরণের চল-বাতাস
- শ্বাস আছে হাস নাই

'পুষ্পমালা' গল্পে রয়েছে—

- পুত্র-সরোবর
- চন্দনের পুতুল, ফুলের প্রতিমা
- যত্নে যে ধন ছিপায়ে রাখিলাম, হইল প্রকাশ!

  পাথরের পাঁচিল ভেঙ্গে' গজাইল ঘাস!
- সুখেরি বাসা
- চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী
- মা'র সত্য, পিতার সত্য, দুই সত্যের বাঁধন
- পাঠপুথি কলমদান
- প্রভাত কালের ছড়া
- তিয়াসের জল আসনের পিড়ী

- সত্য রাখিলে স্বরগ, না রাখিলে পাতাল!
- শ্বেত সর্‌ষে' ফুটে' যায়,/ ওরে অভাগে'রা এখনো আয়!
- ঋণের শেষ শত্রুর শেষ রাখিতে নাই
- বিনি-সূতায় আধগাঁথা মালাগাছি
- বর্ণচোরা আম
- সাজন বাজন অষ্ট গাজন

'মালঞ্চমালা' গল্পে আছে—

- গুণীর গুণ গুণীতেই বুঝে
- হাতী ঘোড়া গেল তল,/ ফড়িঙ্গে বলে কত জল!
- পার তো শাল/ না পার তো শূল।
- কাকের ছোঁ
- পূর্ণচাঁদ রাহুতে খায়, সূর্য্যে গ্রহণ হয়।

  বিধাতার বিধান, মানুষ! মিথ্যা হইবার নয়!!
- ''কুঁড়ে বাঁধি কুঁড়েয় আছি, তার তলেও রাজার হাঁচি!"
- এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা
- 'নিশি পবন দেব ধর্ম্ম সদন!'
- কাক বকের হাট
- নূতন পালক পক্ষীর ছা
- চন্দ্র যেন মেঘেতে লুটায়
- চোখা চোখা ধনুরশর
- জ্যোচ্ছনা নিশির ফুল

'কাঞ্চনমালা' গল্পে রয়েছে—

- ভোর-ফুলের ডালা, সাঁঝ-ফুলের মালা
- ক্ষুর-পায়ে হাঁটে
- যত বড় টিকি তত বড় বামুন
- হাতের শাঁখায় সাঁঝ দিই
- শাঁখা নাড়িয়া যেন আসন দিই
- কূলা নে ধূলা নে
- গিয়ান্ কর্ ধিয়ান্ কর্
- কোন্ দেবতা ছলনা কর,/ কাঞ্চনের ঘরের সলিতা হরণ কর।
- দেব মন্দিরের অষ্টচূড়া ধনকাহন উরা পূরা?
- তুমি মুক্তার মালা আমার, তুমি আমার শাঁখা,
- রূপ ডগ্ ডগ্ তপ্ত সোনা

'শঙ্খমালা'য় আছে—

- শঙ্খমণির ডানা গজাইল
- সওদাগরের সওদাগরী বেণের বাণিজ্য! দিলে নিলে লক্ষ্মীর বর।
- মূলে ধন উবে, দিনে দিনে ডুবে
- ধন রত্ন কড়ি পাখা পেলেই উড়ি, ধন রত্ন কড়ি না বিয়া'লেই বুড়ী
- 'ঢেঁকী বেনে' তুষ খান, 'তুষ কুটে' ভুষী খান।
- চোক ভরিয়া দেখিলেন, চোক ভরিয়া গিলিলেন।
- পরের ঝি! উড়ে, ঘুরে, ধূলা ধূলাতেই পড়ে
- তূলা যতদিন গাছে, ততদিন গাছে; উড়িলে আর ফিরে না!

- পালে পালে দিল টান— পবনের বেটা হনুমান,—
- গাছের পাতা ময়ূর পাখা
- ধবল পর্ব্বত দুই পাখ
- ‘দিক দিশার সাড়া’ নাই, ‘চাঁদের আলোর ধারা’ নাই
- যোড় পাখা যোড় তরোয়ালে ধার
- ‘রায়-বাঘিনী’ ননদী
- দুই কাঁকালে হাতের কাঁকণ, ননদীর গলায় কাঁশর বাজন
- কোন্ সুখে খাস্ কত নিদ্রা যাস্
- আ-লো আ-লো কোন্ জলে ডুবি কোন্ কোণে থুবি, কিসের আগুন খড়কূটায় ঢাক্‌বি!
- গুণের ভরা
- মা যে উপবাসী, তা’র কথা ‘ভাবুক গিয়া পাড়া প্রতিবাসী!’
- কা’র ঝিয়ারী কা’র বহুরী ‘আসন্ন কালে ময়ূরী!’
- ‘যেন মুক্তার ঝিনুকখানি’, ‘সোণ-কদলীর মোচাখানি’
- তুমি কা’র ঝিয়ারী কা’র বৌ,— কা’র্ চাকের ভরা মৌ?
- ও নয়ান-বৌ গজ-কপালী ভাগ্যবতী!
- সাপের হাঁচি বেদেয় বুঝি
- এটে সাত সর্গের নিছনি, কপালে জ্বলে টিকা,

  কোন্ বা রাজার আলোক-নড়ি, কপালযোড়া লিখা!
- কত স্বপন হাসে কত স্বপন ভাসে
- চৌকাঠের উপর গঙ্গাজল, ধূপের ধোঁয়ায় ঘর পাগল
- বড় দেখি চটকী কোন্ রাজ্যের ঘটকী
- দাসী বাঁদীর ঝাঁক যেন মৌমাছির চাক

- কাকের বাসায় কুলির ছা জাত-স্বভাবে করে রা
- চেৎ নাই ভেৎ নাই

ছড়া, প্রবাদ, গানের মতই *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে লৌকিক অভিব্যক্তির প্রকাশও যথেষ্ট।

'মধুমালা' গল্পে দেখা যায়—

> ''রাত না পোহা'তে দেখিলাম আঁটকুড়ে'র মুখ,
>
> ভোজনে নাই সুখ, কপালে আজ অনেক দুখ!''

খোলার মালী ঝাড়ুদারও ভোর-রাতে অপুত্রক রাজার মুখ দেখতে পাওয়াকে অশুভ মনে করে। ''সকালবেলা নিঃসন্তান ব্যক্তির মুখদর্শন অশুভ। তাতে নাকি দিনমানটা নানাভাবে দুঃখ পেতে হয়, অন্ন জোটে না। প্রবাদে বলে— 'আটকুড়ার মুক দেকলি, দিন যায় উপআসে।' 'আটকুড়া' অর্থাৎ নিঃসন্তান। 'উপআসে' অর্থাৎ উপবাসে।''[২৪] মালীর মধ্যে লোক-সংস্কার কাজ করেছে।

- সন্ন্যাসী তথা বিধাতাপুরুষ রাজাকে বলেন— জীয়াস্-সরোবরের পাড়ের 'সোণার বৃক্ষে সোণার যুগল ফল' হেঁটমুণ্ডে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে পেড়ে এনে খেলে রাজার সন্তান হবে। এখানে লোক-বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। তবে রাজা এই কাজে ব্যর্থ হন। এরপর ''সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারী বিধাতা পুরুষের নির্দেশে বংশ-পাখির মাংস খেয়ে সুযোগ্য বংশধর লাভ করেছেন।''[২৫]
- আবার সন্ন্যাসীর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে—

> ''শুন, শুন, শুন রাজা শুন সাবধান—
>
> বারো বৎসর আগে রাজা, না খুলিহ ধাম!!
>
> খুলিলে, উদাসী হ'য়ে ঘুরিবে সংসার
>
> তপ্ত সোণার বাছা,— রাজা, মদন তোমার!''

সন্ন্যাসী রাজপুত্রের নামকরণও করেন। বলাই বাহুল্য নিষেধ না শুনে মদনকুমার চরম দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হন।

- রাজকন্যা পঞ্চকলার ব্রতের কথা আছে।
- চম্পকলা 'সাতপুতি চালনী বাতি', বরণডালার প্রদীপের শিখায় ঘি চন্দন গরম করে নিজের কপালের সিঁদুর নিয়ে স্বামীর কপালে ফোঁটা দেন। পঞ্চকলা 'সাতপুতি চালনী বাতি' বরণডালার প্রদীপের পাঁচ সলতে 'উজল' করে দিয়ে, স্বর্ণগাড়ুর জলে, মাথার বেণীর চুলে, স্বামীর চরণ ধুয়ে মুছে দেন। চন্দ্রকলা 'সাতপুতি চালনীবাতি' বরণডালার ধানমুঠি চাল করে, প্রদীপের শিখায় জ্বাল করে পায়েস রেঁধে স্বামীকে খাওয়ান।

'পুষ্পমালা' গল্পে আছে—

- মালিনী মন্ত্র পড়ে চন্দনকে ছাগল বানিয়ে দেয়। এখানে তান্ত্রিকতার প্রভাব আছে।
- ফুল জলের তিন ছিটেয় পাঁচ হাজার এক ছাগলের হাড় খট্‌খট্ করে মাংস চামে জীয়ে ওঠা এবং নিজেদের রূপ ফিরে পাওয়া।
- পুষ্পমালার ব্রত।
- ঢাল ঢাল মোহর আঙিনায় ঢেলে তার ওপর বসে সারাদিন ধরে পুষ্পমালা ভেড়ার লোমে সুতো পাকান। সেই সুতোয় দুটো মালা গেঁথে চন্দনের সঙ্গে মালাবদল করেন। তারপর দুজনে দুটো খড়্গ নেন। পুষ্পমালা যখন তাঁর বুকে খড়গ ছোঁয়ান তখন চন্দন তাঁর খড়গ দিয়ে সে খড়গ কেটে দিলে রাজা-রানী নিজেদের রূপ ফিরে পান।

'মালঞ্চমালা' গল্পে রয়েছে—

- নিঃসন্তান রাজা-রানীর প্রতি আদেশ—

"তিন দিন ত্রিরাত্রি, রাজা থেকো উপবাসে!
চারি দিনের দিন যেও মালঞ্চের পাশে।
মালঞ্চে যুগল আম্র সোণার বরণ।

সেই যুগল ফলে, রাজা, করিও পারণ।

—বাঁয়ের ফলটি খাইবেন— রাণী; ডাহিনের ফলটি খাইবেন— রাজা।”

কিন্তু আম অদলবদল হয়ে গিয়ে রানী খেলেন ডা'নেরটি, রাজা খেলেন বামেরটি।

১. ধারা তারা বিধাতারা ছয়-ষষ্ঠীর রাতে রাজপুত্রের কপালের লিখন লেখেন—আয়ু মাত্র বারো দিন।

২. ধারা তারা বিধাতারা দেবতাদের অনুনয় বিনয় করলে দেবতারা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বিধান দেন— বারো বছরের কন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দিলে তবেই এ আয়ু খণ্ডাবে।

৩. মালঞ্চ চালুনী বাতির ধান-দূর্ব্বা, নিজের মাথার দু'গাছি কেশ কাঞ্চীর মাথায় ও স্বামীর পায়ে দিয়ে শুভকামনা জানান।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে—

- মালিনী বাঁ পায়ের তলায় 'ছুতো হাঁড়ির কালি' মেখে, পটচিত্রের মুখের ওপর রেখে 'বিড়্ বিড়্' করে মন্ত্র পড়ে। ফলে 'পটচিত্রের চোক, নাক, বর্ণ সব গেল!!' এক্ষেত্রে তান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

- রূপলাল-কাঞ্চনের বিয়ের পর মালিনীর বাড়ির কাছে দোলা থামলে মালিনী পাঁচ মন্ত্র পড়ে, বোন্‌ঝির কপালের কাজল এনে বর-কনের কপালে টিপ্ কাটে।

- কাঞ্চনের মধ্যে লোক-বিশ্বাস কাজ করে— ''কোন্ আছ দেবতা কোন্ আছ দানব, শাঁখা নাড়িয়া যেন আসন দিই। আমার জন জনাৎ যাঁর,— তাঁর যেন অটুট-অক্ষয় হয়।”

- সব যায় দেখে মালিনী তার বোন্-ঝিকে বলে 'কূলা', 'ধূলা', 'তিন শীষ দূর্ব্বা' নিয়ে, 'আঙ্গট্পাত' কেটে নিয়ে— ''মন্ত্র পড়ে' ফুল দিবি, যেন,— নিশি না পোহায়!”

- মালিনী জল আগুন সামনে নিয়ে বোন্-ঝিকে 'হা-রাক্ষসী' মন্ত্র পড়ায়,— "কাঞ্চন রসাতলে যাক্,— সওদাগর রসাতলে যাক্!—"

- নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইন্দ্র তাঁর পাখা কাঞ্চনকে দিয়ে বলেন,— "দেখিও, পাখার উলটা বাতাস যেন তোমার সখার গায়ে না লাগে।" কিন্তু কাঞ্চনের হাতের পাখার উল্টো বাতাস লেগে মালিনীর বোন্-ঝি ছিল পদ্ম, হয় এক নাগিনী। আর মালিনী নাল থেকে ব্যাং হয়ে যায়।

- মালিনী তালগাছের গোড়ায় গিয়ে মন্ত্র তন্ত্র পড়ে। তারপর দাঁত কড়্‌মড়্ করে যত ঘি কর্পূর আগুনে ঢেলে দিলে তালগাছের শিকড় চড়্‌চড়্ করে উঠে রূপ-সায়রে পড়ে যায়। মালিনীও সায়রের জলে ডুবে যায়।

'শঙ্খমালা' গল্পে—

- শঙ্খমালার ব্রতপালন।

- টিক্‌টিকি কাঠুরানীকে বলে রাজপুরে গিয়ে ডায় ডাকিনী এনে ওষুধ বিষুধ করলে—

  "চাঁদের নিছনী হতে পাবি,
  সতীন শত্তুরের মাথা চিবিয়ে খা'বি!"

- সাগর-রানী শক্তির নামে শাঁখ-মঙ্গল ব্রত করেছেন।

- কাঠুরানী বলে— "দাসী লো, বাঁদী লো, ওঝা ডাক্ রোঝা ডাক্, আমার দুধের ধারে বেটে' চাঁদকে ওষুধ দেই।"

গোটা 'গীতকথা' জুড়েই এমন অজস্র লৌকিক উপাদান চোখে পড়ে।

৩. **কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদান :**

ঠাকুরদাদার ঝুলি-তে বিষাদময় ও বিয়োগান্তক দৃশ্য বেশি, তাও কৌতুক/ মনোরঞ্জক উপাদান এতে অনেকই পাওয়া যায়। যেমন—

- কোটালের ঘরে 'টাগ্ডুম্ বাগডুম্'! ('পুষ্পমালা')

- "হো রে!" হৈ হৈ করিয়া দাড়ী গোঁফ চুম্ড়াইয়া যত সিপাই মালঞ্চে ছুটিল।

  ('পুষ্পমালা')

- "হাতী ঘোড়া গেল তল,

  ফড়িঙ্গে বলে কত জল!" ('মালঞ্চমালা')

- চিতার কাঠ ধীরে ধীরে হাত মেলে, পা মেলে— "ঝপ ঝপ্! খপ্ খপ্!"

  ('মালঞ্চমালা')

- চিতার ধুঁয়াতে দাঁত হয়— "খাং খাঃ খাঃ! গা গা গা!" ('মালঞ্চমালা')

- "হালু হালু" করিয়া বুড়ী উঠে— ('মালঞ্চমালা')

- মালঞ্চ তার স্বামীকে লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাঘমামা বলে— "এই কথা? তা লেখাপড়া শিখাও। কত পণ্ডিত সাঁঝ সকালে ঘুরে, 'হোক্কা হুয়া' করে; বল, ধরিয়া আনিয়া দেই।" ('মালঞ্চমালা')

- মালিনী মাসী পাঠশালার বিবরণ দেয়— "রাজার বাড়ীর পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়। কুঁজো, নুজো, গেঁগো, গোদা, কত পড়ুয়া!... দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি, কাক বকের হাট।" ('মালঞ্চমালা')

- বাঘেরা বলে— "রাজা খাইলাম, রাণী খাইলাম, খাইলাম রাজপুত্র,

  লোকজন ধরিয়া খাইলাম রাজার রাজছত্র;

  রাজকন্যা খাইব খাইব বড়ই রস-ভারি

  হেনকালে কর মানা,— কেমনে বা ছাড়ি!—" ('মালঞ্চমালা')

- 'রূপে ডগ্ডগ্ রূপলাল' ('কাঞ্চনমালা')

- 'যত বড় টিকি তত বড় বামুণ' ('কাঞ্চনমালা')

- নদীর জল 'সোম্ দোম্'

  তা'রি নীচে কাঞ্চন বোন্!— ('কাঞ্চনমালা')

- রূপলাল মালিনীকে তাঁর জরা নিতে বললে মালিনী ''হ্যাঁক্ হ্যাঁক্— থুঃ?'' করে সরে যায়। ('কাঞ্চনমালা')

- ব্যাং হইয়া মালিনী বারো বারো বৎসর থর্ থর্ করিয়া কাঁপে। ('কাঞ্চনমালা')

- এক, রাজার বেটা মোহন-লাল,

  তা'র সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল! ('শঙ্খমালা')

- ''শঙ্খমণি, 'পদ্ম ভাঙ্গে ক্ষীর খায়, নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়'; আর, দিনে একবার, রাতে একবার, তিন প্রহরে তিনবার বাঁশী বাজায়।'' ('শঙ্খমালা')

- 'বক-ঠেঙ্গী' পায়ে, কুঁজ-সুন্দরী গায়ে, শক্তির ঘরের পাশে গিয়া উঁকি দিল।

  ('শঙ্খমালা')

- 'কাঁকালে হাতের কাঁকণ, ননদীর গলায় কাঁশর বাজন'— ''ছি ছি!— ছাই ছাই!!''

  ('শঙ্খমালা')

- তিন ঝাঁকর্ ঝ্যাক্না তিন থ্যাকর্ থ্যাক্না ('শঙ্খমালা')

- মাসী বলে,— ''দ্যাখ্—

  হাত সুড়্সুড়ি পা সুড়সুড়ি,

  বাছারা, কর্তে পারিবি চুরি?'' ('শঙ্খমালা')

- ''ভ্যাঁ—পুঁ!— কোঁ! ঝ-গ ঝম্!'' রাজবাড়িতে উৎসব হচ্ছে। ('শঙ্খমালা')

- রানী কাঠুরানী বলে,— ''দাসী লো, বাঁদী লো, 'বড় দেখি চটকী কোন্ রাজ্যের ঘটকী', মামার রাজ্যে বাসা; দ্যাখ তো লো, কে।'' ('শঙ্খমালা')

- 'দাসী বাঁদীর ঝাঁক যেন মৌমাছির চাক'। ('শঙ্খমালা')

- শঙ্খসাধুর চোদ্দ ডিঙা মধুকর আটক করার পর হাজার সিপাই ছুটে এসে বলে—
“কে রে বেটা মর্দ্দানা, রাজার ঘাটে ডঙ্কা মার বেটা, কয়টা ঘাড়ে গর্দ্দানা?”

('শঙ্খমালা')

- 'কাকের বাসায় কুলির ছা জাত-স্বভাবে করে রা।' ('শঙ্খমালা')

- ধাই দাসী সকলের 'জিভে দাঁত মাথায় হাত'। ('শঙ্খমালা')

- বোন্ কুঁজী, অলঙ্কার ঝুণু ঝুণু, মাথায় খৈল দেয়, সুবাস তেলে, গন্ধে, ঘাট ভরে; জাঁকের তা'র সীমা নাই,— দণ্ডে দণ্ডে কাপড় বদ্‌লায়, কুঁজের উপর তেল মাখে, আয়নায় আরশীতে মুখ দেখে। ('শঙ্খমালা')

- 'কালীদহের কালী কুমীর আসিয়া কুঁজীর ঠ্যাংখানা ধরিয়া টানিয়া নিল! ('শঙ্খমালা')

- রাজা যে মোহনলাল, 'চেৎ নাই ভেৎ নাই' ('শঙ্খমালা')

৪. **অভিযান :**

ঠাকুরদাদার ঝুলি-তে প্রকৃত অর্থে অভিযান কমই আছে। তবু বিভিন্ন যাত্রা আর দু-একটা অভিযানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল। যেমন—

- মদনকুমারের মৃগয়া। ('মধুমালা')

- মধুমালার খোঁজে চোদ্দডিঙা নিয়ে মদনকুমারের সমুদ্রযাত্রা। ('মধুমালা')

- মধুমালার খোঁজে রাজকন্যা চম্পকলার দেশ, তারপর পঞ্চকলা, তারপর চন্দ্রকলার দেশ, অবশেষে ময়ূরের পিঠে চড়ে মধুমালার দেশে যাত্রা। ('মধুমালা')

- রাজার মৃগয়া। ('পুষ্পমালা')

- পুষ্পমালা ও চন্দনকুমারের রাজ্য ত্যাগ। ('পুষ্পমালা')

- শিশু স্বামীকে নিয়ে বারো বছরের জন্য মালঞ্চমালার যাত্রা। ('মালঞ্চমালা')

- ‘পক্ষিরাজ’ ঘোড়ার খোঁজে মালঞ্চের যাত্রা। (‘মালঞ্চমালা’)
- মালঞ্চের আপন দেশে যাত্রা। (‘মালঞ্চমালা’)
- মালঞ্চের শ্বশুরের দুধবর্ণ রাজার রাজ্যে অভিযান। (‘মালঞ্চমালা’)
- দুধবর্ণ রাজার রাজ্যে মালঞ্চের যাত্রা। (‘মালঞ্চমালা’)
- রাজার শিকার। (‘মালঞ্চমালা’)
- মালিনী মাসীর খোঁজে মালঞ্চের পুনরায় দুধবর্ণ রাজার রাজ্যে যাত্রা। (‘মালঞ্চমালা’)
- কাঞ্চনবরণ কাঞ্চনমালার খোঁজে সওদাগরের লোক পাঠানো। (‘কাঞ্চনমালা’)
- রূপলালের খোঁজে রাজার লোকেদের যাত্রা। (‘কাঞ্চনমালা’)
- রূপলালের বাণিজ্য যাত্রা। (‘কাঞ্চনমালা’)
- স্বর্গের রথে রূপলালের ইন্দ্রের সভায় গমন। (‘কাঞ্চনমালা’)
- শঙ্খমণির বাণিজ্যযাত্রা। (‘কাঞ্চনমালা’)
- মাণিক-হংসের পিঠে চড়ে শঙ্খমণির ছয় মাসের পথ প্রহরে গৃহে পৌঁছানো। (‘কাঞ্চনমালা’)
- শক্তির বনে গমন। (‘কাঞ্চনমালা’)
- স্বামী-সন্তানের খোঁজে সাগর-রানীর কাছ থেকে শঙ্খমালার উত্তর মুখে যাত্রা। (‘কাঞ্চনমালা’)

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ‘গীতকথা’য় এইসব অভিযান বা পথচলা রয়েছে।

৫. ভাষা ব্যবহার, রচনাশৈলী :

ভাষা ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জনের নিজস্বতা *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র ক্ষেত্রে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তেও এই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। তাঁর ভাষা অভিনবত্বের পরিচয় দেয়।

ক. পূর্ববঙ্গীয় প্রভাব— নাই, পাত, হাজারখান, গণেন, উথলিয়া উঠে, নিয়া যা'স, নিবনা, কালি, মিলা'ব, কয়, খাড়া আছে, গিয়া, আইলি, দিয়া, মুছ, নিয়াছ, নিল, রইত, বহিন্, ছাওয়াল, মিছা, স্বরগ, তিয়াস, ব'স, সিনান, মিঠা, ফুটা, কয়জন, বালু, ফুকারিয়া, ছিটা, চা'মে, জীয়ে, দুয়ার, কচালিয়া, ফড়িঙ্গে, উছলিয়া, পাইলা, হাঁটন, আইস, কুড়াল, দু'টা, দেই, কথা কন, সোয়ামী, পুরিয়া, বিয়া, ছা, লুটায়, বিহান, শুন, উঠাও, থোও, হুলাইল, তোরে, যোগাই, কিনার, পৈথান, নিশাস, আয়ত, ঘুম যাও, জীয়ায়, র'ব, কাণি, আঁচাইল, বিছান, উথলিয়া, ভাঁড়াও, ছানিয়া, ঠাঁই, ঢাকন, থ্যাক্না, আটালা, একখান, আঙ্গট্পাত, গিয়ান, ধিয়ান্ ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের স্বরধ্বনিপ্রবণ ভাষা 'গীতকথা'র সুরটাকে ধরতে সাহায্য করেছে।

খ. সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ— *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র অনেক জায়গাতেই দক্ষিণারঞ্জন সাধু-চলিত ভাষা মিশিয়ে দিয়েছেন। আর এই মিশ্রণ 'গীতকথা'র আস্বাদনে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। যেমন—

- দিনের আলো রাতের চাঁদ খসাইয়া নিয়া মদনকুমার মৃগয়ায় গেলেন। ('মধুমালা')
- বাতাস ধীরে বয়। ('মধুমালা')
- রাজকন্যা বলিলেন,— "কোটালপুত্র! কলমটি তুলে' দাও।" ('পুষ্পমালা')
- কান্নায় বনপুরী ছাইয়া দিন গেল, ভীষণ-আঁধার রাত এল। ('পুষ্পমালা')
- হাতীশালের হাতী ছুটে' গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া মরে' গেল, পক্ষিরাজ আহার ছাড়িল। ('মালঞ্চমালা')

- মালঞ্চ ভাবিলেন, মাসীর কাছে সহর পাটের খবর পাব। ('মালঞ্চমালা')
- পূর্ণিমার ফুট্‌ফুটে জ্যো'স্নায় বিয়ে হইয়া গেল। ('কাঞ্চনমালা')
- ধোপা বাড়ীর ঘাটে মালিনী সাত হাত কাপড় কাচাইয়া নিল। ('কাঞ্চনমালা')
- তা'র উপরে শক্তির কত দুঃখ গেছে! ('শঙ্খমালা')
- ছানাগুলি চুপ হইয়া গেল! ('শঙ্খমালা')

গ. যতিচিহ্নের ব্যবহার— *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র মত *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তেও যতিচিহ্নের ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জন অত্যাশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যতিচিহ্নের নিজস্ব ব্যবহার এখানেও লক্ষিত হয় এবং তা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

- কন্যা শুনেন,——— দূ—র হইতে—— গাছ মড়্ মড়্, হাড় ক্বড়্ ক্বড়্ ('পুষ্পমালা')
- পড়ে না;——— দশদিনের দিন, রাজার ঘরে—— সে কি পূর্ণিমা!— ('মালঞ্চমালা')
- ——— বৃষ্টি! ('মালঞ্চমালা')
- —— সেই রাজ্যে, কাঞ্চনমালা কন্যার দেশ!——— ('কাঞ্চনমালা')
- সওদাগরের থক্ থক্ গলিত কুষ্ঠ মুখ——— সেই মুখে, ——— এ জন্মের মতন দেখা, ——— দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, ——— দেখিয়া, চুমা খাইল। ('কাঞ্চনমালা')
- —— "কি!!!———" ('শঙ্খমালা')
- দাই কাঠুরাণী ঝাঁপের ফাঁক দিয়া দেখে, জ্যো'স্না——— "কে!" ('শঙ্খমালা')

হরফ বা ড্যাশ চিহ্নের নিজস্ব ব্যবহার আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশে সহায়তা করেছে।

শুধু দীর্ঘ হাইফেন বা ড্যাশ চিহ্ন নয়, কখনো বাক্য, কখনো শব্দ, এমনকী দুটো বর্ণের মাঝেও ঘন ঘন ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

- —সরোবরের ওপারে,— কোটালের যে কন্যা, বারো বছরের মেয়ে,— নাম তা'র মালঞ্চমালা,— সেই-যে দেবতা হীরা ফেলিয়া গিয়াছেন?— বৃষ্টি কাদা হইয়া গিয়াছে, ('মালঞ্চমালা')
- দহের জলে ঢেউ খেলে কি না খেলে, কমল পাতে জল হেলে কি না হেলে, — কখন্ দিক্‌পবন আসে,— সাত সন্তান মাল্লা চৌদ্দ চোকে তারা জ্বালিয়া বসিয়া আছে—। ('শঙ্খমালা')
- দেখিয়া— দেখিয়া,— চোখ কচালিয়া— কাল্‌পরী কয়,— ('মধুমালা')
- কন্যা মালঞ্চ বলিল,— "না!— বাবা!— রাজা যখন নিতে পাঠাইয়াছেন, আমাকে দাও।" ('মালঞ্চমালা')
- "তা'-ই-তো!" "আ——চ্ছা,——!—" "রা—মঃ!!" 'অ—যাত্রা!'
- "তা'—ই তো!!" 'প্রথ—ম', "ত—বে—খো—ল" ইত্যাদি।

শুধু ড্যাশ বা হাইফেন নয়, অন্য যতিচিহ্নের ব্যবহারেও আধিক্য দেখা যায়—

- ঠাট কটকে, আর, ছত্রে দিয়া সা'র ('মধুমালা')
- "এ—কি!!"— পাহাড়বনে হাহাকার পড়িয়া গেল!— "হায়! কি জানি কি স্বপ্নে রাজার সর্ব্বনাশ সাধিকা গেল!!!" ('মধুমালা')
- বুড়ী আসিয়া দেখে, রান্না করে, তা'— লোক নাই!! বুড়ী আছাড়ি বিছাড়ি খায়,— ('পুষ্পমালা')
- তখন পুত্র-সরোবরের জল, মানুষে, কলসে কলসে খায়! ('পুষ্পমালা')

- বিধাতার বিধান, মানুষ! মিথ্যা হইবার নয়!! ('মালঞ্চমালা')
- না খাইও রাজকন্যা, ওগো আমাকে এসে, খাও!! ('মালঞ্চমালা')
- মাল্লামাঝিরা "হায় হায়!" করিতে করিতে, ভরা কলসী ঝুলাইয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া, লোহার শিকলের ভার, মালিনী, কাঞ্চনকে অগা-ধ জলে ফেলিয়া দিল! ('কাঞ্চনমালা')
- দিক নাই দিশা নাই, শক্তি, ঝড়ের বাতাস চীর করিয়া তীরের মত ছুটেন, হাতী দেখেন, ধরিতে যান, বাঘ দেখেন, ধরিতে যান, আকাশের আভ্ দেখিয়া ধরিতে যান,— পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, ছিঁড়িয়া আনিতে চান!—
('শঙ্খমালা')

এই সব গল্প আসলে মৌখিক, লেখার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। "এই গল্প বাচনকথা— মুখে মুখে চলে। লিখিত ভাষার সংকেত বা কোড থেকে কথাগুলোকে লেখক আবার মুখের ভাষার ধ্বনিসংকেতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। লেখার ভেতর এত বেশি কমা, ঊর্ধ্বকমা, ড্যাশচিহ্নের ব্যবহারে ধরা আছে সেই বাচনেরই সংকেত। *ঠাকুরমার ঝুলি*-র গল্পগুলিও এইভাবে লেখা— নানারকম চিহ্ন ঘন ঘন ব্যবহার করে লিখিত ভাষাকে আবার বাচনের স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সচেতন প্রয়াস।"[২৬] ছাপার অক্ষরের দ্বারা এ আসলে মুখের ভাষাকে ধরার প্রচেষ্টা। 'গীতকথা'য় রয়েছে গদ্যভাষা আর তার মাঝে মাঝে গীত বা গান। তাই বাংলা সাহিত্য তো বটেই, বিশেষত 'গীতকথা'র প্রাণ হল যতি। এছাড়া রয়েছে পুনরুক্তি। যেমন—

- চলিতে চলিতে চলিতে চলিতে, সেই নিলক্ষ্যের চড়ায় শিশু স্বামীর মুখে রৌদ্র লাগে, ('মালঞ্চমালা')
- সওদাগরের থক্‌থক্ গলিত কুষ্ঠ মুখ—— সেই মুখে, —— এ জন্মের মতন দেখা, —— দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, —— দেখিয়া, চুমা খাইল।
('কাঞ্চনমালা')

‘গীতকথা’র সুরনির্মাণে এই যতি ব্যবহারও পুনরুক্তি যে বিশেষ সহায়তা করেছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘ. শব্দ বা বাক্য ব্যবহারে নিজস্বতা/ বর্ণনাভঙ্গি— বাক্য গঠনে বা শব্দ ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জন অতুলনীয়। তিনি নিজস্ব রীতি অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করেছেন, বাক্য তৈরি করেছেন। উদ্দেশ্য ‘গীতিকথা’র সুরটাকে ধরে রাখা। যেমন— ‘মধুমালা’ গল্পে—

- সৈন্য সামন্ত লাট লস্করে ধরে না।
- রাজ-রাজত্ব বিচার-আচার পালন-পাট সব বন্ধ।
- সন্ন্যাসীর হাতের প্রদীপ উজলিয়া উঠিল;
- জাঁক জৌলুষ বাদ্যভাণ্ড ‘সম্‌গম্ সমারোহ’ দিয়া পুত্র দেখিতে আসিলেন দেখিয়া, রাজা, আনন্দে, চোকের জলে ভাসিয়া গেলেন!
- রাজ্য রম্‌রম্, সভা গম্‌গম্, লোকজন গুব্ গুব্—
- মাঝরাতে লোক-লস্করের ‘খৈ দৈ’।
- চারিদিক হুম্ হুম্ সমুদ্রের জলের ডাক, চারিদিকে গুম্‌গুম্ পাহারা;
- নিগুম নিশুতি রাত,— কালো কালিন্দী আকাশে পাতালে ঢালা। নিশির পাহারা নিশি জাগে।
- রাজা, ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য, জলা জাঙ্গাল পাট পাটন বারো বায়ান্ন সত্তর কুড়ি রাজত্ব রাজগী, যৌতুক দিয়া— ঝা’ল ঝাঁপী সিঁদুর বাতি, সাত বেসাতি একত্র— রাণীর চোকের জলে,— শুভক্ষণ-উষায় জামাই কন্যা তুলিয়া দিলেন।

এছাড়া প্রচুর নিজস্ব শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন— জীয়াস্-পুকুর, ‘গণ্‌গণা’ আগুন, ঠাটকটক, চম্প’ফুলের দোলনমালা, জো’স্না-খল্‌খল্ রাতে, খনক, পাইক, কুঠারী, কোদালী, মাল, ‘করাতী—সিপাই’, ভিখ্-ফকির, চৌদ্দ পরণ মণিমাণিক, কাঠ, কাণাৎ,

পঞ্চসাথ সাথী, উজাই, 'আন্‌-আন্‌ দিন', মেঘডম্বর শাড়ী, 'মধুমালা-জপনা', ঠাকুরাল, রায়ত জন, উজল, চৌদোল, বাড়্‌না, 'প্রভাতকালের ভিজা নিওর', 'সূয্য-কিরণের চল-বাতাস', উগ্‌রানো চাঁদ, উগারি, সিঁদুরের জাঙ্গাল, 'আথিবিথি' ইত্যাদি।

প্রচুর বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— সূরয, হায়রাণ, বোলে না, বালু, সূপ্‌সাপ্‌, লছমী, সোওয়ার, এক হি ইত্যাদি।

'পুষ্পমালা' গল্পে—

- শুনিয়া বড়ই খুসী মুসী, রাণী বলিলেন,— ''না, দিদি, তা' নয়, আয় আমরা সত্য করি।''
- রাণী 'সোণার নির্ম্মাণ' আঁতুড়ঘরে গেলেন।
- কোটালের ঘরে 'টাগ্‌ডুম্‌ বাগডুম!'
- মনের কথা যা'র যা'র মনে,— নিশার— নিশুতি,— টলেও না বলেও না!
- কোটালপুত্র লেট্‌ খাইয়া বসিয়া পড়িল।
- কিসের অসুখ, কিসের বিসুখ, পরদিন রাজকন্যা বিনন চুলের বেণী, ছোব্‌ কাপড়ের পরণ, 'পাটপুথি কলমদান' নিয়া গুরুর কাছে পড়িতে গেলেন।
- কন্যা বলিলেন— ''কুমার! না নামিলাম।''—
- দণ্ডেকে মালিনী আপন ঘর!
- রাজপুরীর রাজা 'সাজন বাজন অষ্ট গাজন', ঢোল নহবৎ হুকুম দিলেন।

নিজস্ব শব্দের ব্যবহার— পুত্র-সরোবর, জিনিষপাতি, জগঝম্প, পঁয়জার, নির্গুম, পুথিপাটা, তিয়াস, নানানি বিনানি, স্রোত-নদী, রোজগী, অষ্টঢালী, উড়াল, শোষ, গুম্‌ গুম্‌ ইত্যাদি।

এই গল্পেও বিদেশি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ছিপায়ে, তাজ, ডাকু, কলিজা, জীয়ে ইত্যাদি।

‘মালঞ্চমালা’ গল্পে—

- পার তো শাল। না পার তো শূল।
- মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার!
- পড়ে না; ——— দশদিনের দিন, রাজার ঘরে— সে কি পূর্ণিমা!—
- তন্ত্রী উঠে,— “বুঝি ফুল-বাগানে মৌচাক উড়িল”—? মন্ত্রী উঠে, — “বুঝি সরোবরে হাঁসের ঝাঁক আসিল”—?

  না——— “কি?”
- রাজা ‘থ’ খাইয়া গেলেন।
- রাজার রাজা মোহন খাজা, এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা,— আজ হইলেও বেহাই কা’ল হইলেও বেহাই; মেয়ে তো নিবেন— তা’ তো নিবেন,—
- মালঞ্চ বলেন— “পতি! ঘুমে, কি, যমে?”
- “বেলাটুকু আছে, রাতটুকু আছে, কা’ল রাজপুত্রেরা গর্দ্দান নিবে।”
- “গর্দ্দান নিবে!— কেন?”

  “কেন,——— না, এ—ই”।
- ‘নূতন পালক পক্ষীর ছা!’—
- মালিনী, চোক-আঁধার দিয়া পড়িয়া গেল।
- মালিনী আর গেল না, মালঞ্চ দিয়া রহিল।

শব্দ ব্যবহারের নিজস্বতা— হেইৎ! হেইৎ! ছকড়া, অমুক রাজা সমুক রাজা, অমুক কুমারী সমুক কুমারী, ডুকার ছাড়িয়া, রাজগি, হালু হালু, নিলক্ষ্যের চড়া, সমবয়সী বোন, সূঁচ-মুখ হইয়া, চরা ফিরিয়া, নুজো, গেঁগো, পারশ্, সুভাগী, আঁটালী, ঠাটকটক, হুলাইল, চালুনী বাতি, অকহন, অ-কোটালকন্যা, জাঙ্গাল ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দের ব্যবহার— উজীর নাজীর, জিম্মা, শোওয়ার ইত্যাদি।

‘কাঞ্চনমালা’ গল্পে—

- মালিনী নিত্য ‘ভোর-ফুলের ডালা’, ‘সাঁঝ-ফুলের মালা’, সওদাগরের বাড়ীতে ফুল যোগায়।
- ঢাকন ছাপিয়া পটের জ্যো’স্নায় ঘর চম্‌চম!— বাতাসটুকুও নড়ে না!
- ‘‘কোন্ আছ দেবতা কোন্ আছ দানব, শাঁখা নাড়িয়া যেন আসন দিই। আমার জন জনাৎ যাঁর, — তাঁর যেন অটুট-অক্ষয় হয়।’’
- উচ্ছবের ‘আটালায়’ আঁটে না!!
- ‘‘ও ছারকপালী! উঠ্! উঠ্! সব তো যায়!— কূলা নে ধূলা নে, তিন শীষ দূর্ব্বা নে, আঙ্গট্‌পাত কাটিয়া নে,— গিয়া—’’
- বাহির হইতেই— রাত পোহায়-না পোহায়-না সূর্য্যঠাকুর না উঠেন—না?— কাঞ্চন বাহির হইতেই, সাঁ করিয়া রাত পোহাইয়া গেল।
- ‘‘দেব মন্দিরের অষ্টচূড়া ধনকাহন ঊরা পূরা?’’
- কি রে সাধু, তিন শ’ ষাট বছরের ভাঙ্গা এক নায়ে কাঞ্চনকে দিয়া, চার চৌদ্দ ছাপ্পান্ন পাল তুলিয়া আপন নৌকা ছাড়িয়া দিল।—
- ———একশ’ বছর পরমায়ু পোহাইয়া গিয়াছে। গলিত অঙ্গ ঝাঁকর চুল, ত্রিকালের অথর্ব্ব বুড়া সওদাগর, ঠি ঠি করিয়া কাঁপিতেছেন!!

নিজস্ব শব্দ— পাটকাপড়, ঢাকন, চাট্টে, বহর বেসাতি, মন্ত্র যন্ত্র, থ্যাক্‌না, ব্যাখ্যানের রূপসী, বেণেতি, গিয়ান্‌, ধিয়ান্‌, সায়সিনান, আদায়বিদায়, নিরাহার, বেণে অ-বেণে, 'হা রাক্ষসী' মন্ত্র, ঠেকি, কাঠচড়া, কাটন-কাটারী দেবতা, সোঁত, অষ্টসম্ভার মাংস, সাত ডঙ্কা ডাগর, না'তল, আভ, সোম্‌ দোম্‌, ঝাঁকর চুল, সেঁউতি ফুল, ভিন ফুট্‌ছে, গলদ্ধারা, বছর-পূর্ণিমা, ঘর চম্‌চম, যম-রাক্ষসী কন্যা, আঁড়, হাতের তেলো ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ— নহর, দুষমন্‌, মুলুক, ডর, জীয়াইয়া ইত্যাদি।

'শঙ্খমালা' গল্পে—

- আনন্দে মা আথিবিথি করিয়া ডালা এলাইলেন, কুলা এলাইলেন, পেটরা পুটুলী খুলিয়া দেখিলেন, ঝা'ল ঝাঁপী চাল মাটি খুঁজিয়া পাতিয়া, — যত দুঃখের জ্বালা স'য়ে বুকে যা ছিলা মা পাষাণ দিয়ে,— আপন মুখে অন্ন ছোঁয়ান নাই তবু বংশের দিকে চেয়ে ধন খোয়ান নাই,— সেই ধন মা এতক্ষণে মাটি চাটি খুঁড়িয়া বাহির করিলেন; বাছিয়া বাছিয়া সা'র দিলেন, তেল সিঁদূরে আঁক দিলেন, দিয়া, ধান-দূর্ব্বা ভাঁড়ে দিয়া, শাঁখে ফুঁ দিয়া, পুত্রের কপালে চন্দন দিয়া, পুত্রের যোড়হাত ভরিয়া মা ধন দিলেন।

— লক্ষণীয়, এখানে অনেক পরে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার হয়েছে। এই গল্পে এই ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

- আছে——— চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়াছে, বরণ হইলেই বাজন দেয়।
- বরণ টরণ করিয়া মা উলু দিলেন— বাধিল, বোন্‌ উলু দিল— কাসিল।
- রায়-বাঘিনী ননদী কুঁজ ঘুরাইয়া নথ বেসর উড়াইয়া, তিন ঝাঁকর্‌ ঝ্যাক্‌না তিন থ্যাকর্‌ থ্যাক্‌না চৌদ্দ হাতে ভাজের গায়ের যত গহনা খুলিয়া নিল।
- এ রাজ্যে কাণিটুকু থাকিতে দিব না, তোর পোমটুকু থাকিতে দিব না!

- ও নয়ান-বৌ গজ-কপালী ভাগ্যবতী! কাঠুরেরে কাঠ যোগা'লি রত্ন পেটে চাঁদ ঘুমা'লি, এই বনে কেমন করিয়া একা থাক্‌বি?—

- পাঁচ যায়, সাত যায় পাঠ পঠনা লিখা পড়া সাঙ্গ,— নীলমাণিক রাজসভায় যান আসেন।

- ছেলের বয়স হইল; সওদাগর, ছেলেকে বিয়ে করাইলেন।

নিজস্ব শব্দ— গোটে গোটে, আথে ব্যথে, ভোগ রাগ, ভোগ যাগ, পাটিয়া, ঝা'ল ঝাঁপী, সা'র দিলেন, হুলু মঙ্গল দিয়া, নিয়াশ, পাল পাটন, নির্শন, দার্শন, পাখালিয়া, কুলবুলুলী, পাসর, নিপাষাণ, ছালা, পিচড়, পালানের গাছ, ভিখুন্নী, বন টাঙ্গী, পাছ করিল, ঝিয়ারী, ডায়ডাকিনী, বা'র দিব, স্থানে স্থিতে, বাঘিনীর 'ডম্বুর', চূড়্‌দালান, আধার, আখর, পিন্ধন, শাল কোটাল, শূল শড়কী, গর্দ্দানা, ছাঁদন, 'যত ইতি' 'পুত্র', সাখী সাথী, গুব্ গুব্ রাজসভা, জন জৌলুষ, সাপুর সুপুর্ ব্যঞ্জন ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ— পিয়াইলাম, দাগা, সোণ, বহুরী, সোর, ঠমক, সাতাইশ, মর্দ্দানা, মচ্ছি ইত্যাদি।

ঠাকুরমা'র ঝুলি-র মত *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তেও দক্ষিণারঞ্জন এমন শব্দ বা ভাষা প্রয়োগ করেছেন যার দ্বারা ক্রিয়া অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যেমন—

- মালিনী মাসী মালঞ্চমালাকে পাঠশালার বিবরণ দিয়েছে— ''কুঁজো, নুজো, গেঁগো, গোদা, কত পড়ুয়া!... দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি, কাক বকের হাট।''

  ('মালঞ্চমালা')

- শঙ্খমালার প্রতি তার 'রায়-বাঘিনী' ননদীর ব্যবহার— ''তিন ঝাঁকর্ ঝ্যাক্‌না তিন থ্যাকর্ থ্যাক্‌না চৌদ্দ হাতে ভাজের গায়ের যত গহনা খুলিয়া নিল'', পরে ''হেই হেই, ছেই ছেই— দূর দূর'' করে শঙ্খমালাকে কুঁজী তাড়িয়ে দিয়েছে।

  ('শঙ্খমালা')

- মদনকুমারের পিতার রাজসভার বিররণ— ‘‘রাজ্য রম্‌রম্, সভা গম্‌গম্, লোকজন গুব্‌গুব্—’’ (‘মধুমালা’)

- ‘‘কন্যা শুনেন,——— দূ—র হইতে— গাছ মড়্ মড়্, হাড় ব্বুড়্ ব্বুড়্,— নিমিষে লেজের দাপটে বন জঙ্গল উড়াইয়া নিয়া পাড় পাহাড় ধ্বসাইয়া শঙ্খিনী সরোবরে নামিল; তিন শোষে সরোবর ‘কর্দ্দমশেষ’ করিয়া, ডাক ফুকারিয়া চলিয়া গেল!’’

  (‘পুষ্পমালা’)

- রূপলালের রূপের বর্ণনা— ‘‘রূপে ডগ্‌ডগ্ রূপলাল’’, রূপ মালিনীকে তার জরা নিতে বললে মালিনী ‘‘হ্যাঁক্ হ্যাঁক্— থুঃ?’’ করে সরে যায়। (‘কাঞ্চনমালা’)

- পুত্রলাভে খুশি কোটালের সম্পর্কে বলা হয়েছে— ‘‘কোটালের ঘরে ‘টাগডুম্ বাগডুম্’!’’ (‘পুষ্পমালা’)

- পাখিদের ভাষাও লক্ষণীয়— ‘মধুমালা’ গল্পে মদনকুমার যে ময়ূরের পিঠে চড়ে সে ‘‘ক্ক-ক্ক-মেঘঃ’’ ডাক ছেড়ে আকাশে ওঠে। ‘শঙ্খমালা’ গল্পে মাণিক-হংস ‘‘হা! হা! রাঃ!!!’’ করে ডাক ছাড়ে আর পৃথিবী মানুষজন গাছপালা সব ঢলে পড়ে।

কত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ‘কোন সমাসের ঘটা’ বা ‘রূপ বর্ণনার আতিশয্য’ ছাড়াই সহজবোধ্য, শ্রুতপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ‘‘এই যে বলার ধরণ, এর আত্মা হচ্ছে একটা বিশেষ গীতি ঝংকার, একটা ছন্দ, যা তৈরী হয়েছে মূলত যতির নাটকীয় ব্যবহার এবং জোড়-মেলানো কথন ভঙ্গীমায় যা বাঙালির একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি।’’[২৭] তাছাড়া এই যে লিখিত ভাষার মাধ্যমে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষতা-স্পষ্টতা, লেখার ভাষাকে বাচনের স্তরে নিয়ে যাওয়া— *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র মত এক্ষেত্রেও heteroglossia বা ‘সমান্তরিত স্বরাগম’ কাজ করছে। এখানেও দক্ষিণারঞ্জন পাঠক-পাঠিকাদের মনোলোভা ভাষার মাধ্যমে ‘মৌখিক বাচন বা skaz’-এর ভাষিক স্তরে নিয়ে যেতে চান। এখানেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত শহুরে-গ্রাম্য নির্বিশেষে সব শ্রেণির পাঠকই *ঠাকুরদাদার ঝুলি* আস্বাদন করতে পেরেছে, পারছে, ভবিষ্যতেও পারবে। ভাষাগত দুর্বোধ্যতা বা বোধহীনতা ‘গীতকথা’ আস্বাদনে বাধার সৃষ্টি করেনি। ‘গীতকথা’র ক্ষেত্রেও শহুরে

ভাষার মান্যতার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার কথন ভঙ্গির আশ্চর্য সমাপতন লক্ষ করা গেছে।

আদল/ Structure:

ঠাকুরদাদার ঝুলি-কে বিশ্লেষণ করলে এর গঠন বা আঙ্গিকের কয়েকটা দিক উঠে আসে। যেমন—

- দক্ষিণারঞ্জন *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-কে একদিকে যেমন বলেছেন 'গীতকথা', অন্যদিকে আবার বলেছেন 'বঙ্গোপন্যাস', 'বাংলার কথাসাহিত্য'। তিনি 'বঙ্গোপন্যাস বাঙ্গালার গীতকথা'র ভূমিকায় বলেছেন— ''বাঙ্গ্লার মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পর বাঙ্গ্লার... উপন্যাস... জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উপন্যাসের কলাকৌশল, চমৎকারিত্ব, ভাষা এবং বর্ণনভঙ্গী হইতে চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি এবং উহার কল্পনার নানামুখী গতি— সমস্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইয়া আসিয়াছে" (*ঠাকুরদাদার ঝুলি*, দ্বাবিংশ সংস্করণ)। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। পরে বলেছেন— ''বঙ্গোপন্যাস... গীতকথা পূর্ণিমার আকাশ স্তরে স্তরে পর্দ্দায় - পর্দ্দায় ভাষা, কল্পনা, সমুদয় ক্রমশঃ উঠিয়াছে।... বঙ্গোপন্যাস— গীতকথায়— কল্পনার উৎকর্ষ এবং ঘটনার বিপুল বৈচিত্র্য।" উপন্যাসের অনেকগুলো লক্ষণ থাকলেও আধুনিক উপন্যাসের বহু চরিত্রের ভীড়, চরিত্রের সংঘাত, দ্বন্দ্ব, ঘটনাগত ঘাত-প্রতিঘাত, বৃহৎ পরিসর— *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে এসব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-কে 'বঙ্গোপন্যাস' বললেও দক্ষিণারঞ্জনই আবার বলেছেন উপন্যাসের চেয়েও 'বিস্তৃততর ক্ষেত্রে গুরু দায়িত্বরাশি' বাংলার 'কথা'গুলো পালন করত। এখানে দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে *ঠাকুরদাদার ঝুলি* 'বাংলার কথাসাহিত্য'। আধুনিক 'কথাসাহিত্য' নয়, এ 'কথা' বাংলার কথা, বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোককথা। বহু চরিত্র, বহু ঘটনা, ভাষাগত উৎকর্ষ— এসব থাকলেও চরিত্রের 'দ্বন্দ্ব' এখানে অনুপস্থিত। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে দক্ষিণারঞ্জনের 'বঙ্গোপন্যাস' আধুনিক উপন্যাস নয়, বরং 'কথা-সরস শব্দে ও সুরের মায়া-প্রবাহে'র দ্বারা 'কর্ম্মক্লান্ত জীবনে ও চিন্তানিপুণ মনে

অনবদ্য আনন্দ-শিহরণ' জাগানো, 'সুনিপুণ গ্রথিত' বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সংরূপ 'বঙ্গোপন্যাস'। আর দক্ষিণারঞ্জনের ব্যাখ্যা— "...'ঠাকুরমার ঝুলি'র সহিত সঙ্গতি রাখার নিমিত্ত এবং 'গীতকথা'র সুর অনেকাংশেই পুরুষকণ্ঠের বলিয়া, কথাসাহিত্য বাঙ্গালার উপন্যাসের— 'বঙ্গোপন্যাস— ঠাকুরদাদার ঝুলি' নামকরণ"।

- গীতকথায় 'অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ' দেখতে পাওয়া গেলেও রূপকথার মত 'রাক্ষস খোক্কসের কথা' নেই বললেই চলে (শুধুমাত্র 'পুষ্পমালা' গল্পে রূপকথার মত শঙ্খিনী অজগর আর 'মালঞ্চমালা' গল্পে ভূত প্রেত পিশাচের কথা রয়েছে)।

- দক্ষিণারঞ্জন *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র 'ভূমিকা'য় বলেছিলেন— পল্লীগ্রামে সদ্য প্রসূতির আঁতুড়ে থাকাকালীন "প্রত্যেক রাত্রে গীতকথার আসর বসে। সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে এক একটি গল্প সমাপ্ত হয়।" এই গীতকথার গায়ক-গায়িকারা কেউ সম্ভ্রান্ত বিধবা, কৃষক অথবা ভদ্র গৃহস্থ। ষষ্ঠীর রাতে বিধাতা পুরুষ শিশুর ললাট-লিখন করবেন বলে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই রাত্রি জাগরণ করে। 'মালঞ্চমালা' গল্পে মালিনী রানীকে 'অমুক রাজা সমুক রাজা'র রূপকথা, 'অমুক কুমারী সমুক কুমারী'র পরণকথা শোনায়, বিধাতার কাছ থেকে রাজপুত্রের ললাট-লিখন শুনে নেয়। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র গল্প বিশেষত 'মালঞ্চমালা' গল্পটা এক শতবর্ষীয়া বৌদ্ধ 'আলাপিনী'র কাছ থেকে সংগৃহীত। প্রশ্ন হল এই 'আলাপিনী' কারা? "বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নাপিত রমণীগণই প্রধানতঃ অন্দরমহলে কথা বলিত। তাঁহাদের নাম ছিল "আলাপিনী"[২৮]। আবার এরাই আঁতুড়ঘরে গল্প শুনিয়ে কখনো গল্পের সঙ্গে গান জুড়ে দিয়ে ক্লান্তি অপনোদনের ব্যবস্থাও করত।

- কয়েকটা বিশেষ সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন—
  - 'মধুমালা' গল্পে সন্ন্যাসী বলেছেন— বারো বৎসর আগে রাজা, না খুলিহ ধাম!
খুলিলে, উদাসী হ'য়ে ঘুরিবে সংসার

  সন্ন্যাসীর উপদেশ— "সপ্ত ব্যঞ্জনে কর রাজা, পাখীটি আহার!!" রাজাও "পাখীর মাংস— সপ্তব্যঞ্জন সাত ভাগে" আহার করেন। ('মধুমালা')

রানী ‘সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি’ বাড়িয়ে দেন।

‘‘সাত-ছত্রিশ-তের কুঠরী পার মধুমালার ঘর। সেই ঘরে তিন সারি ঘিয়ের বাতি, তের থাক্ পালঙ্কে মধুমালা” ঘুমোন।

তের রাত্রি পরে অচেতন মদনকুমার সমুদ্রের চড়ায় গিয়ে পৌঁছান।

‘সাত পুতি চালনীবাতি’ দিয়ে চম্পকলা, পঞ্চকলা, চন্দ্রকলা মদনকুমারকে বরণ করেন।

পঞ্চকলা থাকেন ‘সাত নদীর কিনার পাড়ে’। তিনি পঞ্চবাতি জ্বালিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, ‘পাঁচ সলিতা উজল’ করে দেন।

রানী ‘সাত বাড়্নায়’ চন্দ্রকলা ও মদনকুমারকে খাওয়ান।

মধুমালা-মদনকুমারের বিবাহে ‘‘ত্রিলোকের লোক ‘‘আহা! আহা!”—” করে।

‘তের রাত্রি বারোদিন’ সমস্ত পৃথিবীবাসী আমোদ-আহ্লাদ করে।

o ‘পুষ্পমালা’ গল্পে—

রানী ও কোটালিনী এবং রাজা ও কোটাল তিন সত্য করেন।

বারো বছর পর একদিন লেখাপড়ার সময় রাজকন্যার হাতের কলম খসে কোটালপুত্রের আসনের কাছে পড়ে যায়।

কোটালপুত্র সরোবরের জলে নেমে তিনটে পদ্মপাতা, তিনটে পদ্মফুল মাথায় নেয়।

পুষ্পমালা ও চন্দন গুরুর চরণে তিনসত্য শপথ করেন।

পুষ্পমালা পঞ্চভাত ব্যঞ্জন নামান।

‘বুড়ী সাত ডাকাতের মা’।

রাজা আট দুয়ারে অষ্টপ্রহর পাহারা বসান।

পুষ্পমালা রাজাকে বলেন শঙ্খিনীকে মারতে হলে ত্রিরাত্র তার খোঁজ নেওয়া চলবে না।

অজগর তিন শোষে সরোবর 'কর্দ্দমশেষ' করে।

শঙ্খিনীর সাত-শঙ্খ ফণা।

পুষ্পমালা চারদিনের ব্রত রাখেন।

o 'মালঞ্চমালা' গল্পে—

যাগ-যজ্ঞ করে রাজা আদেশ পান—

''তিন দিন ত্রিরাত্রি, রাজা থেকো উপবাসে!

চারি দিনের দিন যেও মালঞ্চের পাশে।

মালঞ্চে যুগল আম্র সোণার বরণ।

সেই যুগল ফলে, রাজা, করিও পারণ।''

রাজপুত্রের আয়ু বারোদিন। বারো বছরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলে তবেই এ আয়ু খণ্ডাবে।

মালিনীর বোনঝি বারো বছর হল গেছে।

কাঞ্চীমালা চন্দ্রমাণিকের মুখ দেখে চারবেদ অষ্টপুরাণ শেখেন।

মালঞ্চমালা মালিনীকে বলেন তিনরাত্রি যেতে না যেতে ঘোড়া নিয়ে ফিরবেন, তারপর বারো রাজ্য তেরো রাজগি পার হয়ে শ্বশুরের রাজ্যে পৌঁছান।

মালী (চন্দ্রমাণিক)-র সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে যদি বারো বছর মালী শিকল গলায় পরে।

মালঞ্চমালা বারো বছর চন্দ্রমাণিকের সঙ্গে ঘর করায় চন্দ্রমাণিক আয়ুষ্মান হন।

মালঞ্চমালা মালিনীকে বলেন— 'সাত জন্ম তোমার ধার রাখ্‌ব'।

চার দিনের দিন মালঞ্চ সুর ছাড়ান।

মালঞ্চ রাজপুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বারো বৎসরে রাজপুত্রের সাত ছেলে হয়ে মারা যায়।

রাজা তিনবার করে আঙুলে মাটি তুলে মাথায় দেন।

মালঞ্চ সপ্ত ঘিয়ের বাতি জ্বেলে যোড় আসনে বসে থাকেন। তিন দিনের দিন ত্রিসন্ধ্যায় পুরীর দরজা খুলে যায়।

o 'কাঞ্চনমালা' গল্পে—

সওদাগরের মাথার এক একশ' চুল পাকে।

মালিনী একশ'বার করে সওদাগরের বাড়ীতে যায়।

রূপলাল সাত পরত কাপড় চোখে বেঁধে বিয়ে করতে যান।

মালিনী পাঁচ মন্ত্র পড়ে।

সওদাগরের মা দেখেন— সপ্তদল মণি নেই, স্বর্ণমুখ সাত শঙ্খ ফেটে আছে।

কাঞ্চনমালা ''সাত সলিতায় কুঁড়ের বাতি জ্বালিলেন।''

মালিনী 'তে-পথ পথে' বিছিয়ে, 'তিন শীষ দূর্ব্বা' ছড়িয়ে মন্ত্র ডাকে।

কাক চিল সাতবার জাগে, সাতবার ঘুমোয়।

মালিনী সাত ডঙ্কা ডাগর বাজায়, সাত হাত কাপড় কাচায়।

সওদাগরের সপ্তপাল ডিঙা, কাঞ্চনের সাত বোন।

মালিনীর বোনঝি সাত প্রহর উপোস থাকে, পাশের মাটি সাত ক্রোশ সরোবর হয়ে যায়।

সাতদিনের দিন রূপ-কাঞ্চন মালিনীর বোনঝিকে জীয়াতে যান।

মালিনী বারো বছর ব্যাং হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে, তার বোনঝি প্রতি বারো বছরের প্রথম পূর্ণিমার রাত্রে একদিনের জন্য সরোবরে পদ্ম হয়ে ফোটে, বারো বারো বছর পর—বছর-পূর্ণিমার উৎসব, বারো যুগের যৌবন নিয়ে রূপ-কাঞ্চন সংসার করতে থাকে।

o ‘শঙ্খমালা’ গল্পে—

তিন তিন বছর শঙ্খমণি বাড়ি আসেন না।

চোদ্দ পুরুষের চোদ্দ ভরা লক্ষ্মীর বাসর চোদ্দ ডিঙা মধুকর কর্ণধার মাঝির সাত সন্তান, মধুকরের চোদ্দ চূড়া।

শঙ্খমণি তিনপ্রহরে তিনবার বাঁশী বাজান।

শঙ্খমণি বারো বছরের জন্য বাণিজ্যে যান।

‘তিন ঝাঁকর্ ঝ্যাক্না তিন থ্যাকর্ থ্যাক্না’ চোদ্দ হাতে কুঁজী শঙ্খমালার গায়ের গহনা খুলে নেয়।

সাত স্বর্গের ঐশ্বর্য বেটে নিয়ে নীলমানিক বড় হন। ‘‘পাঁচ যায়, সাত যায় পাঠ পঠনা লিখা পড়া সাঙ্গ।’’ রাজার রাজ্য ‘চার চাক্লা বাঁধিয়া উঠে।’

বারো বছর পর মাণিকহংসের ডিম ফোটে। মাণিকহংসের চার ছানা।

বারো বছর শঙ্খমালা পাতালপুরীতে থাকেন।

বারো বছরের নীলমাণিক বারো ধনুক জমি মেপে দেন।

দেখা যাচ্ছে তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট, বারো, তের, চোদ্দ, ছত্রিশ, একশ— এই সংখ্যাগুলো পাঁচটা গল্পে ঘুরে-ফিরে এসেছে। এগুলোর মধ্যে তিন, সাত, বারো সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এদের মধ্যে বারো সংখ্যার গুরুত্ব সর্বাধিক।

- ‘মালঞ্চমালা গল্পে এক অদ্ভুত শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে— ‘নিলক্ষ্যের চড়া’। মনে হয়, ‘নিলক্ষ্য’ শব্দটি ‘লক্ষ্যহীন’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মালঞ্চ পতিকে খাওয়ান, দাওয়ান, বড় করে তোলেন, কিন্তু জানেন না এ পথের শেষ কোথায়? দেবতারা ‘সূঁচ-মুখ’ হয়ে ‘মালঞ্চের দুধের ভাঁড়ের অফুরন্ত দুধটুকু’ শুষে নিলে আবার মালঞ্চের পথ-চলা শুরু হয়।

- ‘পুষ্পমালা’ গল্পে ‘পুত্র-সরোবর শব্দবন্ধের ব্যবহার। নামটা থেকে মনে হয় পুত্র-লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই সরোবরে রানী ও কোটাল্নী স্নান করতে এসেছিলেন। তবে গল্পের শেষে দেখা যায় ‘যা’র যা’র সত্য পূর্ণ’ হয়। আর ‘‘পুত্র-সরোবরের জল, মানুষে, কলসে কলসে

খায়।" এক্ষেত্রে মনে হয় সত্য পালনের গুরুত্ব, বিশেষ করে কোটালপুত্রের সত্যপালনের কথা রাজাকে স্মরণ করানো, অন্যদিকে পুষ্পমালার সেই সত্যপালনে সহায়তার কারণে সাধারণ জনগণ তাদের দুজনকে ও পুত্র-সরোবরকে গুরুত্ব দেয়। আবার 'পুত্র-সরোবর' শব্দবন্ধের মধ্যে আজন্ম লালিত পুত্রলাভের সংস্কার ও আকাঙ্ক্ষাও কাজ করে থাকতে পারে।

- *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র পাঁচটা গল্পের পাঁচ নারীই চূড়ান্ত সহনশীলতার পরিচায়ক। বিশেষত মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালা। আবার সক্রিয়তার দিক থেকে পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা অগ্রগণ্যা। মালঞ্চমালা তো অতি সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন লোকবিশ্বাস, ভাগ্যের লিখনকে বিশ্বাস করেন, অন্যদিকে তেমনই তিনি তাঁর প্রবল প্রচেষ্টা, সদর্থক ভাবনা ও লড়াকু মনোভাবের পরিচয় দেন। "অদৃষ্ট আর পুরুষকারের দ্বন্দ্ব তো চিরন্তন। লোকসমাজ একদিকে যেমন অদৃষ্ট বিশ্বাসী, অন্যদিকে তেমনি পুরুষকারে আস্থাশীল। আলোচ্য গল্পে এই দ্বিমুখী প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ।"[২৯]

- রূপকথার স্বপ্নলোকে খুব সহজেই ডানা মেলতে যে গল্প আমাদের সাহায্য করে সে 'মধুমালা'। তরুণ-তরুণীর মনের মধ্যে জেগে থাকা মায়া-জগতের প্রতিচ্ছবি 'মধুমালা'। শুধু তাই নয়, "বাঙ্গালী মাত্রেরই শৈশব-স্মৃতিতে মধুমালার স্বপ্নরূপ বিজড়িত হইয়া আছে; কাহারও নিকট তাহা অস্পষ্ট, কাহারও নিকট তাহা স্পষ্ট— কাহারও অচেতন-মনে কাহারও বা অবচেতন মনে তাহার আশ্রয়— কিন্তু প্রত্যেকেরই অনুভূতি এক— 'স্বপ্নে দেখি আমি মধুমালার মুখরে!"[৩০] প্রেমের প্রবল আকুতি এই গল্পের মদনকুমারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই আকুতি সর্বযুগের সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের ক্ষেত্রেই "স্বাভাবিক, অথচ কোন যুগের কোন মানুষকেই ইহা আশ্রয় করে নাই। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই রূপকথা অতি সহজেই দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে।"[৩১] এবং রূপকথা কখনোই পুরনো হয় না। তার মধ্যে নিত্য-নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর মদনকুমারের সম্পর্কে আর একটা কথা বলা যায়— তিনি তো আগে থেকে জানতেন না যে মধুমালার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে, তাঁরা একে অপরের জন্য প্রবলভাবে আকুল হয়ে উঠবেন, তবু পিতামাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন।

- সব গল্পই যে অদৃষ্ট বা ললাট-লিখনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা বলা যাবে না। যেমন— 'পুষ্পমালা'। এই গল্পে কিন্তু কোন ভাগ্যলিপি উল্লেখিত হয়নি। পুষ্পমালা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলেন, আর এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেয় পুষ্পমালা পিতৃসত্যপালনের সদিচ্ছা।

- একমাত্র 'শঙ্খমালা' গল্পেই নারীর নৈতিক চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শঙ্খমালা শুধুমাত্র সহিষ্ণুতার পরীক্ষাই দেননি, সতীত্বের পরীক্ষাও দিয়েছেন। আর এই পরীক্ষা নিয়েছে মেয়েরাই।

- শিশু স্বামীর প্রতি আনুগত্য, সেবাপরায়ণতার দিক থেকে 'মালঞ্চমালা' গল্পটা রূপকথার সারিতে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার দাবি রাখে।

- 'মধুমালা' গল্পে মদনকুমারের চার স্ত্রী— অর্থাৎ এখানে বহুবিবাহের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। 'মালঞ্চমালা' গল্পেও চন্দ্রমাণিকের দুই স্ত্রী।

- 'কাঞ্চনমালা' গল্পে মালিনীর বোনঝির জরাগ্রস্ত রূপলালকে চুম্বন করে তালগাছে পরিণত হওয়া, তারপর সহস্রদল পদ্ম, পাখার উল্টো বাতাসে নাগিনীতে পরিণত হওয়া, অন্যদিকে মালিনীর যথাক্রমে 'সোণার নাল' ও ব্যাঙে রূপান্তর জন্মান্তরবাদের কথা স্মরণে আনে। ''বারবার জন্মগ্রহণ করে মর্তের পাপস্খলন করে নির্বাণের পথে যাত্রা— পিথাগোরাসের ভাষায় ''By living a good life each time, it became more purified"— শুদ্ধ বৌদ্ধ নয়, বহু প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদেরও ভিত্তি ছিল— হিন্দুধর্মে তাই অবতারবাদ নামে পরিচিত।"[৩২]

- 'কাঞ্চনমালা', 'শঙ্খমালা' গল্পে বাণিজ্যযাত্রার ছবি রয়েছে। ''একদিন ভোরে উঠিয়া সওদাগরের মা দেখেন, সপ্তদল মণি নাই! রক্তদল মণি নাই! স্বর্ণমুখ সাত শঙ্খ ফাটিয়া আছে! মা বলেন,— ''বাপ। —বাণিজ্যে যাও না, ঘর তো গেল!—" " তাই রূপলাল বাণিজ্যে চললেন। অন্যদিকে শঙ্খমণির মা বলেন— ''তুই সওদাগরের পুত্র; তোর ঘর যায়, তোর বংশ যায়, শঙ্খ! যদি তুই বাণিজ্যে না যাস্— তো, আমার কিরা!" তাই শঙ্খমণিও বাণিজ্যে যান। এই যে ''প্রায় কাহিনীতেই সমুদ্রযাত্রা এবং এই সম্বন্ধীয় যে

তুক্‌তাক্‌ (ritual) দেখা যায়— তাতে সন্দেহ থাকে না— বৌদ্ধ যুগে বাংলার দুরন্ত নাবিকগণ যখন দূর সমুদ্রে পাড়ি দিত তখনকার দিনের কাহিনী এগুলো।"[৩৩] এছাড়াও রয়েছে নারীদের পতি-নির্বাচন যা বৌদ্ধযুগের কাহিনির পরিচায়ক।

- *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে নারীদের লাঞ্ছনা, অবমাননা, যন্ত্রণার ছবি অনেক আছে। কিন্তু বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে দেখা যায় কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালাদের কাছ থেকে রূপলাল, শঙ্খমণিরা বিদায় না নিলে বাণিজ্যতরী এগোয় না।

- *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন নিজেই বলেছেন: "...'রূপকথা' 'ব্রতকথা'র অপেক্ষা 'গীতকথা'র কাল-প্রভাব সমধিক। জাতির বহু দীর্ঘ ইতিহাসের ছাপ ইহার উচ্চতর কাব্যকলা-কৌশলে।" ইন্দ্রপুরীতে কাল্‌পরী ও নিদ্রাপরী 'মুসলমান যুগে রওনা' হয়েছেন। এছাড়া 'কাঞ্চনমালা' গল্পে কাঞ্চনমালা ছাড়াও তাঁর সাত পরী বোন ইন্দ্রপুরীর অপ্সরী। কাঞ্চনমালা মর্ত্যে মানবীরূপে জন্ম নিয়েছেন। এই যে পরী কাহিনি বা পরী-প্রসঙ্গ আরবি/ পারসি কিস্‌সার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। 'মালঞ্চমালা'র কাহিনিতে রয়েছে বৌদ্ধ প্রভাব। "এ কাহিনীতে যে সমাজ তা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাবাদী সমাজ, যার মূল প্রতিপাদ্য হলো কর্ম— জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো— পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্যই এ জন্মে এত দুঃখ— কাজেই সৎকর্ম দিয়েই পূর্বজন্মের কর্মফলের প্রতিবিধান হবে— চরম ত্যাগের মধ্য দিয়েই তো' মোক্ষ লাভ করতে হবে।"[৩৪] তাই শ্বশুরগৃহের নির্যাতন, নির্বাসন, চিতার মধ্যে নিক্ষেপ, ভূত-প্রেত পিশাচ, হাঙ্গর-কুমীর, যমদূতের ভাই কালদূত-শালদূত— কোন কিছুতেই মালঞ্চকে টলাতে পারে না। পতিকে আড়াল করে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। মালঞ্চ ত্যাগ-সংযম-ক্ষমাশীলতা-মমতা-কর্তব্যপরায়ণতা, পাতিব্রত্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু নিজের ঘরই বাঁচাননি, তাঁর সপত্নীর পিতৃগৃহকে রক্ষা করেছেন, পিতা মাতা-রাজা-সাত রাজপুত্র-ঠাটকটক সকলকে পুনর্জীবিত করেছেন, দীঘি-সরোবর খননসহ সকলের মঙ্গলের চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধধর্মে কর্মফলের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই মালঞ্চ যা যা হারিয়েছিলেন— স্বামী-সংসার সবই ফিরে পেয়েছেন। এ সবই তাঁর সুকর্মের পরিণতি। 'মালঞ্চমালা'য় বৌদ্ধ প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ধারা-তারা-বিধাতা এঁরা 'বৌদ্ধযুগের দেবপুরুষ', এঁদের মধ্যে 'আদি মাতা মায়ার' ছায়া রয়েছে। 'মালঞ্চমালা' গল্পে তান্ত্রিকতার

আরও নিদর্শন রয়েছে। রাত্রির অন্ধকার যখন শেষ হচ্ছেনা মালঞ্চ তখন বলেছিলেন:"পোহাও তো পোহাও, না পোহাও তো,— তারা করিব ফুল, ফুল করিব তারা!—" মালঞ্চের ভয়ে "থরথর, নিশি, পোহাইয়া গেল।" এছাড়া শিশু স্বামীর পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে পুনর্জীবিত ও মানুষ করে তোলার অলৌকিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে "তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণের ব্যগ্রতা দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এই আকাঙ্ক্ষার বলে তাঁহার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন। স্বামীকে সেবা করিবার জন্য তাঁহার উৎকট তপস্যাজনিত যে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি হাত ফিরিয়া পাইলেন।"[৩৫] মালঞ্চের কর্মপরায়ণতা, কর্তব্যবোধ তুলনারহিত। মালঞ্চ বোঝেন, কোটালকন্যা হয়ে তিনি রাজপুত্রের স্ত্রীর উপযুক্ত সম্মান পাবেন না। শুধু তাই নয়, রাজপুত্র বারোদিনের আয়ুষ্মান একথা জেনেও বিবাহে রাজি হন। রাজপুত্রের মৃত্যুর পর রাজ-আদেশে কোটালের গর্দান, কোটালন্যা মালঞ্চের হাত, চোখ, নাক, কান ছিন্ন করে চিতায় নিক্ষেপ করা হলেও কোন প্রতিবাদ জানান না। স্বামীর কল্যাণ কামনায় নিজের দিকে তাকানোর অবসর তাঁর হয় না। স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না, রাজপুত্র স্বামীর উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাও করেন। রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হলে মালঞ্চ বলেন: 'রাজার রাজকন্যার মালা, আজি আহা, কত সুখে শোভে স্বামীর গলে;/ আজি আমার কত সুখ হবে আহা, ডুবে শীতল সায়রেরি জলে।"

পরবর্তীকালেও তিনি স্বেচ্ছায় রাজকন্যা কাঞ্চীকে পাটরানী করেছেন, আর প্রজারা মালঞ্চকে ঠাকুরানী করেছে। নিজের সুখ নয়, সকলকে নিয়েই তিনি সুখী হতে চেয়েছেন। মালঞ্চমালা সম্পর্কে তাই বলা যায়: "সে বিদেহী, ইন্দ্রিয়মুক্ত, কর্ত্তব্যের জীবন্ত প্রতীক,— একটি বহ্নিতুল্য জ্বলন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি।"[৩৬] কর্মে-ত্যাগে-প্রেমে-আধ্যাত্মিকতায়-যত্নে-স্নেহে-তপস্যায়-কৃচ্ছ্রসাধনায় তিনি বৌদ্ধ আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ। মালঞ্চের চারিত্র্য-ধর্ম সুবিকশিত হয়ে ওঠার জন্য অন্যান্য লোককথার মত এ কাহিনির বন্ধনও সুপরিকল্পিত। তাই রাজপুত্রের মৃত্যুর পরও মালঞ্চের মাধ্যমে তাঁর পুনর্জন্ম, বনবাস, তারপর দুধবর্ণ রাজার রাজ্যে গমন, কাঞ্চীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহেও কাহিনির শেষ হয় না। মালঞ্চের তপঃসিদ্ধির যোগ্যতা প্রমাণের জন্য শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িত হন। পরে রাজপুত্রের সাত

পুত্রের জীবনদান, পিতা-মাতার জীবনদান, তৃষ্ণার্ত শ্বশুরকে জলদান, এছাড়া আরো বহু জীবনদান করে মালঞ্চ শ্বশুরগৃহে সংবর্ধিত হন।

- 'মালঞ্চমালা' গল্পের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল "এই গল্পে ব্রাহ্মণের কোন উচ্চ স্থান নাই, তাঁহাকে দান করা, ভক্তি করা ইত্যাদির ফল বর্ণিত হয় নাই।"[৩৭] মালঞ্চ শত বিপদের সম্মুখীন হয়েও কখনো কোন ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে তান্ত্রিকতাও প্রাধান্য পায়নি। তাই তন্ত্র-নির্ভরতা, কর্মে অতি সক্রিয়তা, সামাজিক অনুশাসনের বাহুল্যহীনতা (দীর্ঘদিন বাইরে থাকা সত্ত্বেও তার চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি), ভাষাগত প্রাচীনতা— এ সবই গল্পটা যে বৌদ্ধযুগের তারই প্রমাণ বহন করে।

- সব গল্পেই মালী/ মালিনীর কথা রয়েছে। 'মধুমালা' গল্পে খোলার মালী ঝাড়ুদার রাজাকে 'আঁটকুড়ে' বলে। সেই দুঃখেই রাজা দুয়ারে খিল দেন। এরপরই বিধাতাপুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে রাজাকে দর্শন দেন আর কাহিনিও গতিপ্রাপ্ত হয়। এই কাহিনিতে মালীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। 'পুষ্পমালা' গল্পে মালী মালিনীর প্রসঙ্গ আছে। মালিনী আবার যাদুকরী, সে চন্দনকে ছাগল বানিয়ে দেয়। মালিনী এরপর কাহিনি নিয়ন্ত্রণ করে। পরে জানা যায় মালী ও মালিনী যথাক্রমে পুষ্পমালার পিতা ও মাতা। 'মালঞ্চমালা' গল্পে মালিনী মাসী বিধাতার কাছ থেকে জেনে নেয়— রাজপুত্রের আয়ু বারোদিন। পরে মালঞ্চ তো অন্য এক মালিনী মাসীর আশ্রয়েই ছিল। 'কাঞ্চনমালা' গল্পে যেহেতু মালিনী মাসীর বোনঝিকে রূপলাল বিয়ে করেননি তাই মালিনী মাসী রূপলালের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আর কাঞ্চনমালার ওপর নানা তুক্‌তাক, তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ করে। 'শঙ্খমালা' গল্পে রয়েছে বুড়ী দাই-মালিনী যে কাঠুরানীকে নীল মাণিক চুরি করতে সহায়তা করে। এদের মধ্যে একমাত্র মালঞ্চমালার মালিনী-মাসীই সহায়িকার কাজ করে।

- কোন দেবতা নয়, চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে পৃথিবীর মাটিকে নিজের করে কোটালপুত্র পুষ্পমালার ডান হাত ধরে। এখানেই গল্পটার অভিনবত্ব।

- পঞ্চ 'মালা'দের মধ্যে একমাত্র কাঞ্চনমালাই স্বর্গের অপ্সরী। তা সত্ত্বেও মর্ত্যের সাধারণ নারীদের মতই তিনি সব লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-যন্ত্রণা-পতিবিরহ মুখ বুজে সয়ে গেছেন।

- অনেক গল্পে অসম বিবাহ রয়েছে। যেমন— রাজকন্যা ও কোটালপুত্রের বিবাহ (‘পুষ্পমালা’), রাজপুত্র ও কোটালকন্যা (‘মালঞ্চমালা’), রাজকন্যা ও সওদাগর পুত্রের বিবাহ (‘কাঞ্চনমালা’)। ‘শঙ্খমালা’ গল্পে শক্তিসুন্দরের পিতৃপরিচয়ের উল্লেখ নেই। আর বাকি গল্পগুলোতেও তাই গল্পের নায়ক-নায়িকাকে অনেক লাঞ্ছনার মুখে পড়তে হয়েছে। যেমন— ‘পুষ্পমালা’ গল্পে রাজা ও রানী যথাক্রমে কোটাল ও কোটালিনীর সঙ্গে যে সত্য করেছিলেন সে সত্য রক্ষা করেননি। ফলে পুষ্পমালাও না জেনে কোটালপুত্রকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু জানা মাত্রই সত্যপালনে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করেননি। যেমন— “‘মা’র সত্য, পিতার সত্য, দুই সত্যের বাঁধন,—কোটালের ঘরই আমার ঘর।” ‘মালঞ্চমালা’ গল্পে মালঞ্চ রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কোটালের ঘরে জামাই শ্বশুর শাশুড়ী আসতে দিবেন কি না দিবেন?” “কোটাল-কন্যার হাতের ভাত শ্বশুর-শাশুড়ী খাইবেন কি না খাইবেন?” রাজা মালঞ্চের সব প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হলেও রাজপুত্র মারা গেলে সব ভুলে গিয়ে মালঞ্চকে বনবাসে দেন, চিতার আগুনে বিসর্জন দেন, আর তারপর থেকে তো দুঃখই মালঞ্চের জীবনের একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। তবে ‘কাঞ্চনমালা’ গল্পে রূপলাল সওদাগর পুত্র হলেও রাজপরিবারের তরফ থেকে কোন যন্ত্রণা বা গঞ্জনার শিকার তাঁকে হতে হয়নি।

- ‘মালঞ্চমালা’ গল্পে রাজা যখন কোটাল-কন্যাকে আনতে লোক পাঠান কোটাল তখন বলে: “মহারাজ! রাজার রাজা মোহন খাজা এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা।” আর পরে গল্পের শেষে মালঞ্চ যখন কোটালের প্রাণ ফিরিয়ে দেন তখন কোটাল রাজাকে বলে: “মহারাজ! রাজার রাজা মোহন খাজা, এক বংশী বাজা এক বংশী হাজা।” দুটো উদ্ধৃতির মধ্যে সামান্য রকমফের লক্ষ করলে বোঝা যায় প্রথমে রাজা ছিল সত্য পালনে অনিচ্ছুক, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর। পরে রাজা জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হন। কারণ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা তো একা মালঞ্চ আর তাঁর পিতা-মাতার হয়নি, রাজা-রানীরও যে যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে— সেকথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। তাই ভাষাতেও বদল।

- দুঃখ-দুর্দশার চিত্র থাকলেও *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-তে সাধারণী কথা একটাও নেই।

- রূপকথায় অন্যায় যে করে পরিণামে তাকে শাস্তি পেতেই হয়— এই অনিবার্য শর্ত এখানেও দেখা যায়। 'কাঞ্চনমালা', 'শঙ্খমালা' গল্পগুলো তার প্রমাণ।

- ''মালঞ্চমালার কাহিনী। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহা বিরচিত হইয়াছিল। বহুকাল হইতে উহা কথিত হইয়া আসাতে উহার ভাষার অবশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।''[৩৮] তবে সেই পরিবর্তন সামান্যই। কারণ প্রথম সংস্করণের ভাষা পরিবর্তিত হলেও সে ভাষা এতটাই সহজ-সরল-প্রাণের আবেগে পরিপূর্ণ যে মূল ভাষার আস্বাদ তাতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'মালঞ্চমালা' কাহিনির কথা। ''চলিতে চলিতে চলিতে চলিতে, সেই নিলক্ষ্যের চড়ায় শিশু স্বামীর মুখে রৌদ্র লাগে, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া নেন; বৃষ্টি মাথায় পড়ে, বুক দিয়া আবরিয়া নেন; ধূলা বালি উড়িয়া আসে, চুল জড়াইয়া পাখা ধরেন,— এইভাবে চলিতে চলিতে, — দুই পা যান আর নামাইয়া নামাইয়া বাতাস করেন,— চলিয়া চলিয়া সোয়ামী নিয়ে মালঞ্চ এক গহন কানন বনে গিয়া উঠিলেন।''

- *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র পঞ্চ 'মালা'র কাহিনির আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিপুলভাবে প্রচলিত। কারণ ''নাথপন্থি যেসব বৌদ্ধগণ বিপুল সংখ্যায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে তারা তাদের সেই বিপুল লৌকিক ঐতিহ্য— লোককাহিনী— লোকগাথাকে পরিত্যাগ করেনি।''[৩৯]

ঠাকুরদাদার ঝুলি-র পাঁচটা 'কথা'ই সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও এদের মধ্যে মালঞ্চমালাই শ্রেষ্ঠ। 'মালঞ্চমালা' সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য— ''It [Malanchamala] is a tale of which a nation might well be proud, it has all the attributes of a beautiful lyric; it contains a conception of purity and love which evince a high state of civilization.''[৪০]। তবে প্রত্যেক নারীই তাদের হৃদয়ের আর্তি, আকুতি, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, ত্যাগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে স্বমহিমায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

<u>সাহিত্যকৃতি:</u>

ঠাকুরদাদার ঝুলি 'বিশ্বসাহিত্যে বাংলার শতদল', 'বিশ্ব-সাহিত্যের স্বপ্নপুরী'। এর 'নিরক্ষরা' ভাষা লিখিত ভাষার মতই আপামর বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এক সুবিশাল সাহিত্য-মন্দির রচনা করেছিল। "দেশের ছেলে-মেয়েদের সহজ কল্পনার পূর্ণ বিকাশে, গৃহলক্ষ্মীদের প্রাণটিকে অতি কোমলভাবে গৃহকর্ম্মে তন্ময় করিতে, যুব-প্রৌঢ়-বৃদ্ধের বহির্ব্বাটীতে নিত্য কথোপকথনচ্ছলে জ্ঞান, নীতি, ক্রিয়াসূত্রকে হাস্যতরল পথে চিত্তে প্রবেশের প্রিয় সুযোগ দিতে... এবং দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্বজনের হৃদয়-মন আমোদে বিহ্বল করিয়া উচ্চতম আদর্শে, শিক্ষায় ও রসৈশ্বর্য্যের অমেয় সৌন্দর্য্যে, সুগঠিত করিতে— বাঙ্গ্‌লার অমৃতের কলস ইহার কেন্দ্রবেদিতে সংরক্ষিত।" (*ঠাকুরদার ঝুলি*-র 'ভূমিকা', দ্বাবিংশ সংস্করণ)। এই ঝুলি বাংলার চিরকালীন সাহিত্য, এ হল চাষীর গান, রাজার গান; শিশুর গান, বুড়োর গান; নারীর গান, পুরুষের গান।

শঙ্খমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা-র গল্প "composed in the rural dialect of this country, contain in them elements of purity, conception of love and moral feeling which indeed evince a high stage of civilization. Written in-prose, interspersed with songs, they have all the attributes of master-pieces of lyrics, of which any nation could be proud."[৪১] ইউরোপীয় শিক্ষা এবং মুসলিম সংস্কৃতির আলো প্রবেশ করার বহু আগে থেকেই এই ধরনের গল্প বাংলার ঘরে বহুবার বলা হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন এই বহুকথিত গল্পগুলোই সংগ্রহের মহান ব্রত পালন করেছিলেন। প্রত্যেকটা 'কথা'র নারীরাই কোন না কোন আদর্শের প্রতীক। মালঞ্চমালার চরিত্র যেমন ভারতীয় ধ্যান-ধারণা এবং হিন্দু-বৌদ্ধ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। "like a big lily of an Indian tank, is beautiful when shewn from its congenial back-ground of this tropical country of ours. It will scarcely stand the frosty chill of North-Western realism."[৪২] সতী সাবিত্রী যেমন যমের দুয়ার থেকে স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন, মালঞ্চমালাও তেমনি তাঁর মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করার পরীক্ষায় জয়ী হয়েছিলেন। তমসার চিরন্তন চারণকবির সীতার মত তিনিও নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। "in her martyrdom she reaches the level of a Sikh Guru; and in endurance she can be compared only to an Indian yogi."[৪৩] 'দেশের— জীর্ণ

পর্ণকুটীরের নিরক্ষর কৃষক' থেকে 'ধনীগৃহের দিদিমাদের কণ্ঠে' 'মধুমালা', 'মালঞ্চমালা'র কাহিনি, আবেগ-কম্পিত, ভালোবাসা-মিশ্রিত হয়ে উচ্চারিত হয়। 'ভারতীয় প্রাণধারা, বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্তরস'— এসব কাহিনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত। 'গীতকথা'র 'অমিত মনোমোহন সুর' বাংলার 'নক্ষত্রখচিত সন্ধ্যা' ও রাত্রিকে আনন্দের আতিশয্যে, সুখ-স্মৃতিতে ভরিয়ে তোলে। বাঙালির পরম সম্পদ এই *ঠাকুরদাদার ঝুলি*। ''দেশের মর্ম্মোজ্জ্বল উন্নত আদর্শের প্রাণজুড়ানো মনোমদ জীবন্ত ছবির মধ্যে, জাতির বিশেষ শিক্ষা-সুভাব ইহাদের পংক্তিতে কোমল স্পর্শে গাঁথা, সরলতম প্রাণে গীত। এ বস্তুতে, 'অসম্ভব' কিছুই নাই" (*ঠাকুরদাদার ঝুলি*, 'ভূমিকা')।

''বাঙ্গালী হৃদয়ে যে কি মধুর কবিত্বের নির্ঝর বহিত, তাহাদের অফুরন্ত চেষ্টার ভিতর প্রেমের কথা কিরূপ সিন্দূর রাগের উজ্জ্বলতা ললাটে পরিয়া শোভা পাইত— তাহা এই গল্পগুলিতে যেরূপ পাওয়া যায়, বোধ হয় এই সাহিত্যের কোথাও তাহার তুলনা নাই— ইহারা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট।"[৪৪] প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মত *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র নারীদের 'রূপ বর্ণনা'র আতিশয্য নেই আবার 'আধুনিক সাহিত্যের মত' নিঃসঙ্কোচে 'প্রেমের কথা' নিজ মুখে প্রকাশের প্রচেষ্টা নেই। প্রত্যেক 'মালা'র কথায় নারীসুলভ সংযম দেখা যায়, অনাবশ্যক 'মুখরতা' এই পঞ্চপ্রেমকাহিনিকে 'স্ফীত' করে দেয়নি। ''সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এই সকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে দৃষ্ট হয়।"[৪৫] তাই বলা যেতে পারে, দক্ষিণারঞ্জনের এই পঞ্চ 'মালা' চিরন্তন কাল ধরে বাংলা সাহিত্যের কণ্ঠে সগৌরবে স্বমহিমায় বিরাজ করতে থাকবে। দক্ষিণারঞ্জনও বঙ্গজননীকে জানিয়েছিলেন তাঁর বাসনা—

মা গো!

তোমরা জ্বেলেছ দীপ দয়ামাখা সোনা হাতে,

'ঘর ভরে এসে' আলো, ছুটে পড়ে আঙ্গিনাতে।

সে আঙ্গন-ধূলে বসি— আমার বিভল প্রাণ,

ঘুম-ঘোরে গাই— শুধু— তোরি সুরে তোরি গান!

তথ্যসূত্র ::

১. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ভূমিকা', *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাবিংশ সংস্করণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

২. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal*, Published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Calcutta, 1920, p. 261

৩. মলয় বসু, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৭৫

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৬৯

৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঠাকুরমার ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৬৮

৬. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal*, Published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Calcutta, 1920, p. 262

৭. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৭৮

৮. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *বাংলার মুখ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা,১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১

৯. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk Literature of Bengal*, Published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Calcutta, 1920, p. 41

১০. Ibid, pp. 264-265

১১. Ibid, p. 265

১২. Stith Thompson (Revised and enlarged), *Motif Index of Folk-literature*, Vol. II, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U.S.A, 1956, p. 19

১৩. Stith Thompson (Revised and enlarged), *Motif Index of Folk-literature*, Vol. VI, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U.S.A, 1958, p. 320

১৪. Stith Thompson (Revised and enlarged), *Motif Index of Folk-literature*, Vol. II, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U.S.A, 1956, p. 27

১৫. উইলিয়াম কেরী, *ইতিহাসমালা*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮১২, দ্বিতীয় প্রকাশ ফাদার দ্যতিয়েন ১৯৭২; গাঙচিল সংস্করণ জুন ২০১১, পৃ. ১০৩

১৬. Rev. Lal Behari Day, *Folk Tales of Bengal*, Book Society of India Limited, Calcutta, First Edition 1833; 1970, p. 24

১৭. শান্তা দেবী সীতা দেবী অনূদিত *হিন্দুস্থানী উপকথা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯১২, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ; অষ্টম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ জুলাই ২০১৩, পৃ. ৫৬

১৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ববঙ্গগীতিকা*, ১ম সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩-২৬; প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬৫-৬৬

১৯. তদেব, পৃ. ৮৯

২০. তদেব, পৃ. ২৯৪

২১. তদেব, পৃ. ৩১০-৩১১

২২. Stith Thompson, *The Folk tale*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977, p. 415

২৩. Ibid, p. 415

২৪. মানস মজুমদার, *লোকসাহিত্যপাঠ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬৩

২৫. তদেব, পৃ. ৬৪

২৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, '*ঠাকুরমার ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন*', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১০

২৭. দেবাশিষ তরফদার, 'প্রাণভ্রমর', উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৭৪

২৮. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮৬

২৯. মানস মজুমদার, *লোকসাহিত্য পাঠ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬২

৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯

৩১. তদেব, পৃ. ৪৮১

৩২. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২৭৬

৩৩. তদেব

৩৪. তদেব, পৃ. ২৯৯

৩৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮৮

৩৬. তদেব, পৃ. ৩৮৯

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৯২

৩৮. তদেব, পৃ. ৩৮৭

৩৯. আশ্রাফ সিদ্দিকী, *লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৮, পৃ. ২৩৮

৪০. W.R. Gourlay, *Folk-Literature of Bengal*, 1920, p. x

৪১. Rai Saheb Dinesh Chandra Sen, *The Folk-Literature of Bengal*, published by the University of Calcutta, Calcutta University Press, Calcutta, 1920, p. 45

৪২. Ibid, p. 46

৪৩. Ibid

৪৪. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬/এ; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯১/ বি, পৃ. ৮১

৪৫. তদেব

চতুর্থ পর্ব

গবেষণার পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সন্ধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

১০. দশম অধ্যায়

<u>গবেষণার পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সন্ধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত</u>

“শিশুসাহিত্য আসলে সাহিত্যেরই একটি শাখা। উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যের রস তাই সাহিত্য রসিক মাত্রেরই উপভোগ্য। উঁচুদরের শিশুসাহিত্যিককে উচ্চস্তরের সাহিত্যিকরূপেই বিচার করা কর্তব্য। কেননা শিশুসাহিত্যিক অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি অর্জন করতে সমর্থ হন।”[১] বাংলার ‘কথা-সাহিত্য’ ও ‘শিশু-সাহিত্য’-এর বিখ্যাত লেখক দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে একথা সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের দরবারে রূপকথা তথা লোককথার হাত ধরেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। কখনো ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা, কখনো দাদামশায় বা ঠাণদিদি সেজে তিনি বঙ্গসাহিত্যের ঝুলি বা থলে নিয়ে সরাসরি শিশুদের অন্তরমহলে প্রবেশ করেছেন। শুধু লোকসাহিত্যই নয়, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, চিঠি— সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রই তিনি বাদ দেননি। স্রষ্টা দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে বহু স্বরের সমাবেশ ঘটেছে। তবে দক্ষিণারঞ্জনের সবচেয়ে বড় অবদান তিনি বাংলা সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া ‘কথা’ সাহিত্যকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলন করেছিলেন। এইসব ‘কথা’ কোন অজ্ঞাত ‘বিচিত্র উৎস’ থেকে জন্মগ্রহণ করে “মানুষের কুঠিরে কুঠিরে জনগণের হৃদয়ের দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপে, বঙ্গনারীর হেঁসেল ঘরে, ঠাকুমা দিদিমার ভাঁড়ার ঘরে, আদিবাসীর নিকানো দাওয়ায়, ঢেঁকি ঘরের কোণে, অশত্থ বৃক্ষের নীচে।”[২] এই ‘লৌকিক গল্পকথা’ কোন এক অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়ায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে সঞ্চারিত হয়ে চলে। দক্ষিণারঞ্জন এই লোক-পরম্পরায় শুধু বিস্মিতই হননি, তিনি বাংলার সুবিস্তৃত লোককথার প্রবাহপথে গুরুত্বপূর্ণ বাহকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন।

দশবছরের বেশি সময় যাবৎ দক্ষিণারঞ্জন ময়মনসিংহ ও ঢাকার অতি নিভৃত পল্লী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার বিলীয়মান ‘কথা-সাহিত্য’-এর সংগ্রহ তথা গবেষণা এবং বিন্যাসে রত থাকেন। তিনি *ঠাকুরমা’র ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাণ’দিদির থলে* ও *দাদামশা’য়ের থলে*— এই চারটে গ্রন্থে বাংলার সুবিশাল কথা-সাহিত্য জগতের পরিচয় বহুলাংশে লিপিবদ্ধ করেন। এই চারটে গ্রন্থ প্রকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে ভাবতে ইচ্ছা করে এই ধারাবাহিক বিন্যাস কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? দক্ষিণারঞ্জন হয়ত বাংলার পাঠকসমাজকে উত্তরোত্তর তৈরি করে নিতে

চেয়েছিলেন। তাই প্রথমে প্রকাশিত হয় শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী ‘কথা’ সাহিত্য *ঠাকুরমা’র ঝুলি*। তারপর রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অপেক্ষাকৃত পরিণত মনস্কের সাহিত্য *ঠাকুরদাদার ঝুলি* প্রকাশিত হয়। এরপর দক্ষিণারঞ্জন ধর্মে-কর্মে মন দেন। বাংলার নারীদের করণীয় ও পালনীয় ব্রতের মাধ্যমে তাদের কর্তব্য-কর্ম স্মরণ করাতে *ঠাণ’দিদির থলে* প্রকাশিত হয়। আর সবশেষে *দাদামশা’য়ের থলে*। এই গ্রন্থ সব বয়সের উপযোগী, এতে একদিকে যেমন নির্মল হাস্যরস, অন্যদিকে তেমনি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপদেশ পরিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন গ্রাম-বাংলার হারিয়ে যাওয়া ‘কথা’কে সংরক্ষণ করার অভীপ্সায় আজীবন যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, সেজন্য বাংলার সাহিত্যজগৎ তাঁর কাছে ঋণী। বাঙালি-সমাজ যখন তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত রূপকথা-গ্রন্থের দাবির কথা বিস্মৃত হতে বসেছিল ঠিক তখনই তারা দক্ষিণারঞ্জনের বিপুল লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারের হদিশ পায়। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জনও দেশীয় ঐতিহ্য তথা লোক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের কাছে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ‘লোক আখ্যান’ হাজির করলেন। ফলে ‘‘ঠাকুরমা’র মুখের অমিত নির্ঝর এবং ‘গীত-কথা’র অমিত মনোমোহন সুর”, ‘‘মজলিসে মজলিসে বৈঠকীয় রসকথায় হাস্যে লহরে লহরে” বাংলা-সাহিত্যের আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ‘‘ব্রতকথা সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে অমৃতের ধারা বর্ষণ” করতে লাগল। আর চারু, হারু, উৎপল, রবিরা বাংলার শিশু-কিশোর প্রাণকে মাতিয়ে তুলল।

দক্ষিণারঞ্জনের দ্বারা প্রাণিত হয়ে বঙ্গবাসী কল্পনার জাল বুনতে শিখল। কোনদিন তারা চারু-হারু, কোনদিন আবার নীলকমল-লালকমল, মদনকুমার বা নীলমাণিক। ক্রমে তারা অস্থির সময়েও স্থীতধী হতে শেখে, ধীরে ধীরে কাল্পনিক গল্পকেও বাস্তব জীবনে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করে। কারণ তারা লক্ষ করে: ‘‘ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলি-র বেশির ভাগ আখ্যান শুরু হয় শৃঙ্খলার ছবি দিয়ে; মধ্যভাগে থাকে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি; শেষে ওই পূর্বতন শৃঙ্খলাই পুন:স্থাপিত হয় স্বমহিমায়।”[৩]

তবে দক্ষিণারঞ্জনের ‘কথা’ সাহিত্যের সবটাই যে ইতিবাচক এমন নয়, অনেক নেতিবাচক দিকও আছে। ইতিবাচক দিকটা সহজেই বোঝা যায়। যেমন— ‘কলাবতী রাজকন্যা’ গল্পে বুদ্ধু-ভূতুম-এর সীমাহীন সহ্যশক্তি। অবশ্য ভূতুমের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর গল্পটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। ‘ঘুমন্ত পুরী’র রাজপুত্র রাজকন্যার মগ্ন চৈতন্যের জাগরণ ঘটিয়েছেন। ‘কাঁকণমালা,

কাঞ্চনমালা' গল্পের শুরুতে শ্রেণি ও বর্ণবৈষম্য লক্ষিত হলেও শেষে সব ব্যবধান ঘুচে গেছে। আবার 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'সোনার কাটী রূপার কাটী' গল্পের রাজপুত্রেরা অপরিসীম সাহসের সঙ্গে রাক্ষসদের হঠিয়ে দিয়েছেন। কিরণমালা তো মায়া পাহাড়ে গিয়ে দাদাদের ছাড়াও লক্ষ লক্ষ রাজপুত্রকে উদ্ধার করে ''সাত যুগের ধন্য বীর!''। 'দেড় আঙ্গুলে'র ''উচ্চতার স্বল্পতা দরিদ্র মানুষদের সামাজিক অবনমনের সূচক''[৪] হলেও গল্পের সমাপ্তিতে সে রাজা পিপ্পলকুমার। তবে রাজা হয়েও সে পৈতৃক পেশা ছাড়তে পারে না। বাংলার রসকথা 'দাদামশা'য়ের থলে' জ্ঞানী-মূর্খ সকলেরই 'তুল্যরূপ উপভোগ্য'।

বাকি রইল নেতিবাচক দিকের প্রসঙ্গ। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*-র 'কলাবতী রাজকন্যা', *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র 'মধুমালা', 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা'র কাহিনির শুরুতে দেখা যায় রাজা অপুত্রক। ফলে বংশ রক্ষা হবে না— এই দুশ্চিন্তায় রাজারা কাতর। 'পুরুষ' দক্ষিণারঞ্জন কি তাহলে এখানে 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজ'-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন? 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের ন-রানী আর ছোটোরানী, 'সাত ভাই চম্পা' গল্পের ছোটোরানী, 'কিরণমালা' গল্পের রানী রাজার অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান না। শুধু তাই নয়, রাজকন্যা বা রানী হয়েও কলাবতী রাজকন্যা, কাঞ্চনমালা, মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা— এঁদের নিজস্ব কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই, স্বামীর সুখেই তাঁদের সুখ। মধুমালার খোঁজে বেরিয়ে মদনকুমার তো আরও তিন স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসেন। পরী হয়েও কাঞ্চন স্বামীর কারণে সর্বংসহা। বণিক-পত্নী শঙ্খমালা, কোটালকন্যা মালঞ্চমালার তো দুঃখের অবধি নেই। তবু এই নারীদের স্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান। *ঠাণ'দিদির থলে*-তে ''যুগ যুগ ধরে বাংলার ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থাধীন মেয়েদের যে-ধরনের কামনায় অভ্যস্ত করা হয়েছে, যে-জাতের বিশ্বাস রোপিত হয়েছে তাদের মধ্যে, তার একটি প্রতিচ্ছবি, এবং মনু বা রঘুনন্দনের কঠিন কঠিন নির্দেশ তারা কীভাবে বহন করে আসছে তার পরিচয়''[৫] পাওয়া যায়। এখানেও বাংলার নারীদের সেই একই স্বামী-সোহাগিনী, গুণবতী বধূ, কুলবতী, পুত্রবতী হওয়ার কামনা। তবে এই নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সমর্থনে যুক্তি সাজানো যেতে পারে বাংলার ছিন্নমূল মানুষ তথা জাতিকে শিকড়ে ফিরিয়ে আনতে 'স্নেহময়ী' বঙ্গনারীদের বিশেষ প্রয়োজন। দক্ষিণারঞ্জনের কবিতা বা গল্পেও নারীদের স্নেহশীলতা, সরলতা, সেবাপরায়ণতা প্রকাশিত হয়েছে। হতে পারে দক্ষিণারঞ্জন নারীর কোমলতা, মাধুর্য, মাতৃস্নেহ ও রূপকথা-ব্রতকথা-গীতকথাকে একাত্ম করেই দেখতে চেয়েছেন।

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর তাবৎ 'কথা-সাহিত্য'-এ ''প্রাচীন যুগের একটা অধ্যায়কে যেন মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি এই সকল রূপকথার মধ্যে আপনাকে এরূপভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন— যে তাঁহার প্রতিলিপিতে মৌলিক জিনিষটিই প্রতিফলিত হইয়াছে।''[৬] এই রূপকথা শুনতে শুনতে বাংলার শিশুরাও যাতে নিজেদের মগ্ন রাখতে পারে এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারে— দক্ষিণারঞ্জন সেভাবেই গল্প-ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। শুধু শিশুরাই নয়, বড়রাও এই 'কথা' সমান আগ্রহ নিয়ে আস্বাদন করে। তবে লোককথা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন যেসময় লোককথা সংগ্রহ করেন তখন সেসব সংকলন সংরক্ষণের ''কোন বৈজ্ঞানিক রীতি বা প্রক্রিয়া ছিল না। দক্ষিণারঞ্জনের সংগ্রহ ও বিন্যাসেও ঐ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি খুব অল্পক্ষেত্রেই লোক কাহিনীর উৎসসূত্র নির্দেশ করেছেন। এছাড়া তুলনামূলক কিংবা আঞ্চলিক ভাষার সূত্রও তিনি দেননি।''[৭] এই ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর লোককাহিনির মাধ্যমে সেকালের-একালের-চিরকালের পাঠককে সুদূর কল্পলোকে নিয়ে যাওয়ার যুগান্তকারী সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বহুপরিচিত কাহিনিকেও চিরনতুন করে হাজির করেছিলেন। ''...'ঠাকুরমা'র ঝুলি' এবং 'দাদামশায়ের থলে'র কাহিনীগুলি মৌলিক না হলেও পুনর্কথনের এই ঢঙটি বড় মাপের ভাষাশিল্পীর পক্ষেই মাত্র আয়ত্ত করা সম্ভব।''[৮] তিনি প্রমাণ করেছিলেন বাংলার লোকসাহিত্য বাংলার একেবারেই নিজস্ব সম্পদ তো বটেই, বাংলাদেশের সেরা সম্পদও। তাঁর কথা-সাহিত্যকে সকলের উপভোগ্য করে তুলতে গিয়ে ''দক্ষিণারঞ্জন গল্প ভাষার কিছু কিছু পরিমার্জন করলেও গল্পের প্রাচীনতা, সরলতা, বিশেষ ভাষা ও রীতিকে যথাসাধ্য রক্ষা করেছিলেন। ফলে দক্ষিণারঞ্জন বাংলা রূপকথার প্রথম যথার্থ সংগ্রাহকের মর্যাদা''[৯]-র অধিকারী হয়েছিলেন।

একদিকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গান, জীবনী ইত্যাদি মৌলিক রচনা অন্যদিকে লোককথার গবেষণা ও সংকলনের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। শিশু-কিশোরকে কল্পনার জগতে পাখা মেলতে সাহায্য করেছিলেন, বঙ্গনারীদের বাংলার ব্রতকথার বিবরণ ও নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্গনারীদের সহজাত স্বভাবধর্মের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রসকথা শুনিয়ে বঙ্গবাসীর মনের ভাব লাঘব করার চেষ্টাও চালিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ-গল্প-কবিতায় তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান ছাড়াও বৈজ্ঞানিক,

জাতীয়তাবাদী, দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে তাই তাঁর গবেষক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, স্বাদেশিক, আধ্যাত্মিক, জীবন-রসিক মনের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হয়। ‘‘যে সাহিত্যের গায়ে লেগে থাকে অকৃত্রিম মাটির গন্ধ এবং যুগে যুগে যা কখনও লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে আবার কখনও করেছে কল্পনার আকাশকে দিগন্তবিস্তারী, সেই সাহিত্যকে আমরা প্রকৃতির ওই জীবনসম্পৃক্ত অংশবিশেষ বলেই মনে করি।”[১০] দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যে ছিল এই মাটির গন্ধ। তাঁর সাহিত্য শুধু শিশু-কিশোরই নয়, পরিণতমনস্ক বঙ্গবাসীরও কল্পনার আকাশকে সুদূর প্রসারিত করেছিল। আর প্রবল স্বাদেশিকতার যুগেই শুধু নয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য লোকশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিল। জগত-জীবনের সব অপূর্ণতাকেই দক্ষিণারঞ্জনী সাহিত্য যেন ঢেকে দিয়েছিল। তাই দক্ষিণারঞ্জনকে শুধুমাত্র শিশু-সাহিত্যিক বলা যাবে না, তিনি পরিণত-মনের খোরাকও জুগিয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন ‘‘কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কোবিদ, শিশু-সাহিত্যের সার্থক কথক এবং স্বদেশী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ’, ‘সংকলন-সংস্কার-সৃষ্টি মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীর রস-সাহিত্যিক— রস-সাহিত্যের অমরাবতীতে তাঁর স্থান চিরনির্দিষ্ট।”[১১]

তথ্যসূত্র ::

১. অজিত দত্ত, *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৩৩৫

২. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোক-সাহিত্য/ উৎস ও অভিপ্রায়*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, ২২শে জানুয়ারি ১৯৬৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২

৩. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস/ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯১; দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৭৪

৪. তদেব, পৃ. ৮১

৫. তদেব, পৃ. ৯৩-৯৪

৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* , ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬/ এ; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯১/ বি, পৃ. ৭৯

৭. দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪; দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩, পৃ. ৫৩৯

৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (সংযোজনসহ) আগস্ট ২০০০; ষষ্ঠ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২, পৃ. সাত

৯. মলয় বসু, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৬৬-৬৭

১০.নীলাঞ্জন সরকার, ‘মনের উড়ান’, *উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি*,দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭, পৃ. ১৮২

১১.বারিদবরণ ঘোষ, ‘দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য’, *দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭

পঞ্চম পর্ব

উল্লেখপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী

উল্লেখপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তাতে প্রথমে রয়েছে বাংলা গ্রন্থ, তারপর ইংরাজি গ্রন্থ। বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথাক্রমে আকর গ্রন্থ, সৃজনশীল গ্রন্থ, অভিধান/ কোষগ্রন্থ, মননশীল/সমালোচনামূলক গ্রন্থ। তারপর রয়েছে পত্র-পত্রিকা ও বক্তৃতা/ পাঠমালা। সব ক্ষেত্রেই প্রথমে লেখক/ কবির পদবী, তারপর নাম, গ্রন্থনাম, খণ্ড সংখ্যা, প্রকাশন সংস্থা, প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল/ সংস্করণ সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, লেখক/ কবির পদবী বর্ণানুক্রমিক ভাবে উল্লেখিত। একমাত্র ব্যতিক্রম সৃজনশীল সাহিত্য। সেক্ষেত্রে প্রথমে রয়েছে লেখক/কবির নাম, তারপর পদবী। আর এখানে লেখক/ কবির নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে উল্লেখিত।

১১. **একাদশ অধ্যায়**

উল্লেখপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী

:: আকরগ্রন্থ ::

- কেরী উইলিয়াম সংকলিত *ইতিহাসমালা*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮১২; গাঙচিল সংস্করণ জুন ২০১১
- মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাবিংশ সংস্করণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
- মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ
- মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, *দাদামশা'য়ের থলে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
- সেন দীনেশচন্দ্র, *পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা*, ১ম সংখ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩-২৬; প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯
- —শান্তা দেবী সীতা দেবী, *হিন্দুস্থানী উপকথা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০১৩
- Day Rev. Lal Behari, *Folk Tales of Bengal*, Book Society of India Limited, Calcutta, First Edition 1883; Reprint 1970
- Siddiqui Ashraf, Compiled and edited *Tales From Bangladesh* (Collected by A. Britisher), Bangladesh Books International Limited, Dhaka, First Published in February 1976

:: সৃজনশীল গ্রন্থ :

- *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৪
- *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ; তৃতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০০ বঙ্গাব্দ
- *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- যোগীন্দ্রনাথ সরকার, *হাসিখুশি*, ২য় ভাগ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৭; প্রথম সংগ্রাহক - সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা', *পঞ্চভূত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ; পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচিত্রিতা', *সঞ্চয়িতা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানসী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১০ই পৌষ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজপুত্তুর', *লিপিকা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ; সংস্করণ পৌষ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
- সুকান্ত ভট্টাচার্য, *ছাড়পত্র*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; চতুর্থ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
- সুনন্দা শিকদার, *দয়াময়ীর কথা*, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮

:: অভিধান/ কোষগ্রন্থ ::

- চক্রবর্তী বরুণ কুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৫; পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬

- *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ জুন ১৯৮৫
- চৌধুরী দুলাল ও সেনগুপ্ত পল্লব সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪; দ্বিতীয় সংযোজন ২০১৩
- *বাংলা পিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪০৯ বঙ্গাব্দ মার্চ ২০০৩
- Abrams M.H., *A Glossary of Literary Terms*, Macmilan India Limited, Third Edition, First Published in India 1978
- Leach Maria edited *Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*, Vol. I, Funk & Wagnalls Company, New York, 1949
- Thompson Stith, *Motif Index of Folk-Literature*, Vol. I, Indiana University, Bloomington, Revised and Enlarged Edition September 1955
- Thompson Stith, *Motif Index of Folk-Literature*, Vol. II, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U.S.A., 1956
- Thompson Stith, *Motif Index of Folk-Literature*, Vol. VI, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, U.S.A., 1958

:: মননশীল/ সমালোচনামূলক গ্রন্থ ::

- আহমদ ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলি*, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১
- ইসলাম মযহারুল, *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি*, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮২
- গঙ্গোপাধ্যায় আশা, *বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ*, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, *ছোটগল্পের সীমারেখা,* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
- গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
- গুপ্ত ক্ষেত্র, *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (সংযোজন সহ) আগস্ট ২০০০; ষষ্ঠ সংস্করণ নভেম্বর ২০০২
- ঘোষ প্রবীর, 'দক্ষিণারঞ্জন প্রসঙ্গে আরও দুটি কথা', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র,* ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- ঘোষ বারিদবরণ, 'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জীবনালেখ্য', *দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র,* ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- চক্রবর্তী তিমিরবরণ, *বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ,* সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৭শে মার্চ ২০০২
- চক্রবর্তী বরুণ কুমার, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৭; পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৮
- চক্রবর্তী শ্যামাপদ, *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা,* কৃতাঞ্জলি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৮
- চক্রবর্তী সুমিতা, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪
- চট্টোপাধ্যায় অঘোরনাথ, *মেয়েলি ব্রত,* প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রকাশ জুন ১৯৯৭
- চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৫; চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০১

- চট্টোপাধ্যায় হীরেন, *সাহিত্য প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পঁচিশে বৈশাখ ১৪০২ বঙ্গাব্দ
- চৌধুরী ভূদেব, বাংলা *সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২
- ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১লা শ্রাবণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ
- ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশতি সংস্করণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *লোকসাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ; অগ্রহায়ণ ১৪১১ বঙ্গাব্দ
- দত্ত অজিত, *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ সেপ্টেম্বর ১৯৬০
- দাশ শ্রীশচন্দ্র, *সাহিত্য সন্দর্শন*, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান বুক ডিষ্ট্রীবিউটিং কোং, আল্ফা পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৬
- দে মাধবী, *শান্তা দেবী ও সীতা দেবী/ জীবন সাহিত্যে আধুনিকতা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩
- পাল রবিন, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প*, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৪
- বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার সম্পাদিত *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
- বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

- বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস/ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯১; কারিগর দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৫
- বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতিচর্চা*, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ
- বসাক শীলা, *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮
- বসু মলয়, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথাচর্চা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০
- বিশ্বাস অচিন্ত্য, *মিখাইল বাখতিন: উপন্যাসতত্ত্ব*, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪
- বিশ্বাস অচিন্ত্য সম্পাদিত *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
- বিশ্বাস অচিন্ত্য, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা*, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৬
- বিশ্বাস অচিন্ত্য, *শাক্ত পদাবলী*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৬
- ভট্টাচার্য আশুতোষ, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২
- মজুমদার দিব্যজ্যোতি, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫
- মজুমদার দিব্যজ্যোতি, *লোককথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮
- মজুমদার মানস, *লোকসাহিত্যপাঠ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৯
- মজুমদার লীলা সম্পাদিত *উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, ২৮শে আগস্ট ১৯৭৩

- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, *রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ*, প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৫৯
- মুখোপাধ্যায় বিশু সম্পাদিত *কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী*, ১ম খণ্ড, বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
- মুখোপাধ্যায় সুনীলকুমার, *জসীমউদ্দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ
- রায় অলোক, *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৬৭
- রায় রথীন্দ্রনাথ, *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পুস্তক বিপণি সংস্করণ জুন ১৯৮৮
- সিদ্দিকী আশ্রাফ, *বাংলার মুখ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ
- সিদ্দিকী আশ্রাফ, *লোক-সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৩; গতিধারা সংস্করণ আগস্ট ২০০৮
- সেন দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৬/এ; দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯১/ বি
- সেন দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ
- সেনগুপ্ত পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫
- Bandyopadhyay Gouri Sankar, *Folk Religion and Mass Culture in Rural Bengal*, Touchstone Publication, Kolkata, First Published January 2007
- Crooke W., *Folklore of India*, Aryan Books International, New Delhi, First Reprint 1993
- Frazer James, *The Golden Bough/ A History of Myth and Religion*, Chancellor Press, London, 1994

- Gourlay W.R., *Folk-Literature of Bengal*, 1920
- Levi-Strauss Claude, *Structural Anthropology*, Vol. II, Penguin Books, First Published in the U.S.A., 1976
- Propp. V., *Morphology of the Folktale*, The American Folklore Society and Indiana University, University of Texas Press, Austin & London, Second Edition 1968
- Ray Sudhansu Kumar, *The Ritual Art of the Bratas of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Kolkata, First Edition January 1961
- Sen Rai Saheb Dinesh Chandra, *The Folk Literature of Bengal*, Published by the University of Calcutta, 1920
- Sengupta Sankar, *Folklorists of Bengal*, Indian Publications, Calcutta I, India, First Print February 1965
- Siddiqui Ashraf, *Folkloric Bangladesh*, Bangla Academy, Dacca, First Edition December 1976
- Thompson Stith, *The Folk tale*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, London, 1977

:: পত্র-পত্রিকা ::

- চট্টোপাধ্যায় রাণা, শতবর্ষে ঠাকুরমা'র ঝুলি : একটি প্রতিবেদন (১৯০৭-২০০৭), উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭
- তরফদার দেবাশিস, প্রাণভ্রমর, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭
- পাল ঈশা, রূপকথার সংগঠন : একটি বৈশ্বিক তত্ত্ব বনাম ঠাকুরমার ঝুলি, কথক-৭, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ডিসেম্বর ২০০৭

- বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, ঠাকুরমার ঝুলি, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭

- বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, ঠাকুরমা'র ঝুলি : অতীত না ভবিষ্যপুরাণ? আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২১শে মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৭

- বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, ঠাকুরমার ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭

- বসু বাণী, রূপোকথা নয় সে নয়, শিলাদিত্য, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক সাহিত্যপত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪

- ভট্টাচার্য শঙ্করলাল, ঠাকুরমার ঝুলি, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ৩০শে মে ২০১৫

- মজুমদার অভীক, বিশ্বরূপকথা, শিলাদিত্য, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক সাহিত্য পত্র, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪

- মজুমদার দিব্যজ্যোতি, অভিজ্ঞতালব্ধ অনুশীলনে সমৃদ্ধ, বইয়ের দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

- মুখোপাধ্যায় নারায়ণ, চিরদিনের মানবসত্তা ও ঠাকুরমার ঝুলি, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭

- সরকার নীলাঞ্জন, মনের উড়ান, উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি, দক্ষিণারঞ্জন সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র, আসাম, ২০০৭

:: বক্তৃতা/ পাঠমালা ::

- বিশ্বাস অচিন্ত্য, পাঁচ-ছয় দশকের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, ঊনত্রিংশ উজ্জীবনী পাঠমালা (৩০শে ডিসেম্বর - ২০শে জানুয়ারি ২০১৬), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১লা জানুয়ারি ২০১৬

ষষ্ঠ পর্ব

পরিশিষ্ট

১. <u>চিত্রসূচি</u> :

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর ‘কথা’ সাহিত্য অর্থাৎ *ঠাকুরমা’র ঝুলি*, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, *দাদামশা’য়ের থলে* গ্রন্থে বেশ কিছু চিত্র সংযোজন করেছেন। অবশ্য *ঠাণ’দিদির থলে*’তেও বেশ কিছু ব্রতের ছবি রয়েছে। এই সব চিত্র বা ছবির নানা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এই চিত্র-বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রথম আলোচ্য বিষয় <u>প্রচ্ছদ</u>। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রচ্ছদেই বেশ কিছু মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। *ঠাকু’মার ঝুলি* বা *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র প্রচ্ছদে রয়েছে ওপরে-নীচে নক্সা, চাঁদ, সূর্য, একেবারে নীচে বাঁদিকে একটা ময়ূর। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র প্রচ্ছদে ওপরের কোণে নক্সা, চাঁদ, সূর্য, নীচে পদ্মফুল রয়েছে। *দাদামশায়ের থলে*-র প্রচ্ছদে নক্সা নেই, একটা আয়তাকার রেখার মধ্যে চাঁদ, সূর্য, নীচে বাঁদিকে সম্ভবত কাশফুল আর বাঁদিক থেকে ডানদিকে নদীর চিত্র। এই বিভিন্ন মোটিফগুলো পরপর সাজালে মনে হতেই পারে যে সূর্য-চাঁদ দিবারাত্রির ইঙ্গিত বা একটা সম্পূর্ণ জীবন বৃত্ত, ময়ূর শিল্পিত স্বভাব বা চঞ্চল সৌন্দর্যের প্রতীক, পদ্ম বৃহত্তর সৌন্দর্য, জীবনপ্রবাহ, নদী আরো বৃহত্তর জীবনপ্রবাহের ইঙ্গিত দেয় যে জীবনপ্রবাহ বঙ্গবাসীর জীবনকে গতিময় করবে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র *দাদামশা’য়ের থলে* গ্রন্থেই উল্লেখিত আছে যে প্রচ্ছদ গ্রন্থকারের অঙ্কিত। বাকি গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে সেকথা বলা নেই। তবে চিত্রগুলো গ্রন্থকারের পরিকল্পিত তো বটেই। তাছাড়া সূর্য, চাঁদ, ময়ূর, পদ্ম, নদী ইত্যাদি মোটিফ ব্যবহার থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে *ঠাকুরমা’র ঝুলি* ও *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র প্রচ্ছদও দক্ষিণারঞ্জনই রচনা করেছেন।

দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্রের দুটো খণ্ডেরই একই প্রচ্ছদ। ওপরে হাতি, গাছ, রাজপুত্র, মাঝে বুদ্ধ, নীচে সূর্য। সূর্য জীবনের প্রতীক, অবশিষ্ট মোটিফগুলোর দ্বারা প্রকাশক হয়তো রূপকথার আবহ তৈরি করতে চেয়েছেন।

এবারের আলোচ্য <u>চিত্রের শ্রেণিবিভাগ</u>। *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র সব ছবি গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র কয়েকটা হাফ্ টোন্ চিত্র ছাড়া সব চিত্র গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত। *দাদামশায়ের থলে* গ্রন্থের সব চিত্র গ্রন্থকারের উপদেশানুসারে অঙ্কিত।

এছাড়াও সব কটা গ্রন্থের চিত্র এনগ্রেভার, রেখা চিত্র, হাফ্ টোন সহ বিভিন্ন চিত্রশিল্পীদের এমনকি প্রতিকৃতি নির্মাণকারী সংস্থারও নামোল্লেখ করেছেন। *ঠাকুরমা'র ঝুলি* ও *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র প্রথমে রবীন্দ্রনাথের, তারপর নিজের ছবি রেখেছেন দক্ষিণারঞ্জন। সব মিলিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থসজ্জায় বিনয়, শ্রদ্ধা, রুচিশীলতা ও সৌন্দর্যবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

যে রূপকথার জগৎ ছিল একান্তভাবেই বাংলার 'দিদিমা কোম্পানী'র সম্পত্তি, ঠাকুমা-দিদিমারা মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে যে জগৎকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন তাকেই ছবি এঁকে প্রতীকায়িত, প্রকাশিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছবির মাধ্যমে রূপকথা তথা স্বপ্নের জগৎকে মেলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও তাঁর এই প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও সফল হয়েছিল।

এই চিত্রগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

১. নিজের আঁকা ছবি (পৃ. ৩৪৮ - ৩৫৬)

২. হাফ্‌টোন ছবি (পৃ. ৩৫৭ - ৩৬১)

৩. উপদেশানুসারে অঙ্কিত ছবি (পৃ. ৩৬২ - ৩৬৭)

৪. ব্রতের ছবি (পৃ. ৩৬৮ - ৩৭৭)

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার স্বহস্তে যে ছবিগুলো অঙ্কন করেছেন সেগুলোতে গল্পের বিষয়বস্তু অনেকটাই জীবন্ত বা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রাক্ষসীদের রূপ। প্রথম থেকেই রাক্ষসীদের বিকট-বীভৎস রূপ, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাদের আরো কদাকার-ভয়ঙ্কর রূপ। আবার দেড় আঙুলে ছেলের তিন আঙুলে টিকির ছবিতে মজাটা বেশ ফুটে উঠেছে। শিয়ালের ছবি দেখেও মজা লাগে, হাসি পায়।

দক্ষিণারঞ্জন উপদেশ দিয়ে যে যে ছবি অঙ্কন করিয়েছেন সেখানেও চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা, অতিকথন, অতিরঞ্জন, বুদ্ধিমত্তা বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রতের ছবিগুলোর ক্ষেত্রে রয়েছে ব্রতের আলপনা, চিত্র বা উপকরণ। এই ছবিগুলোর উৎস দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাণ'দিদির থলে*— 'বাংলার ব্রতকথা' এবং অন্যান্য সূত্র।

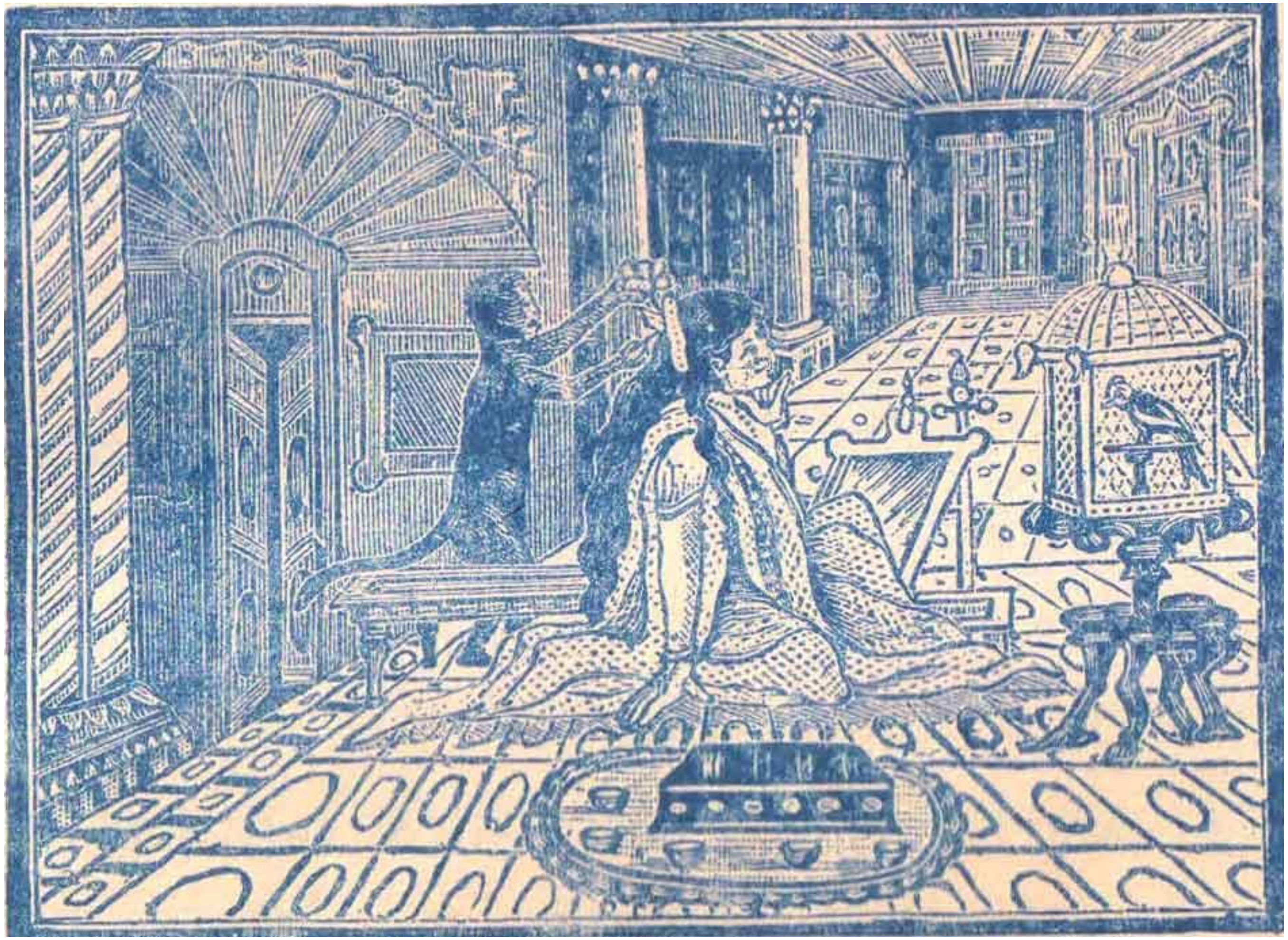

কলাবতী রাজকন্যাকে শুক বলে— ‘‘কলাবতী রাজকন্যা, চি’ন্ত না’ক আর,
মাথা তুলে’ চেয়ে দেখ বর তোমার!’’

রাজকন্যার অজান্তেই পতি (বানর-বর) নির্বাচন। (‘কলাবতী রাজকন্যা’)

''সাত যুগের ধন্য বীর!'' কিরণমালা

(‘কিরণমালা ’)

"কেমন করে' ধ্বংস হ'ল খোক্কসের পাল—
কেমন করে' উঠ্‌ল কেঁপে নেঙ্গা তরোয়াল!"
('নীলকমল আর লালকমল')

রাক্ষসীর ভয়াল রূপ ('সোনার কাঠী রূপার কাঠি')

'দাঁত-বিকটী রাক্ষসী'র মরণকামড় ('সোনার কাটী রূপার কাটী')

নাকের বদলে নরুণ ('শিয়াল পণ্ডিত')

দেড় আঙুলে ছেলের তিন আঙুলে টিকি। ('দেড় আঙ্গুলে')

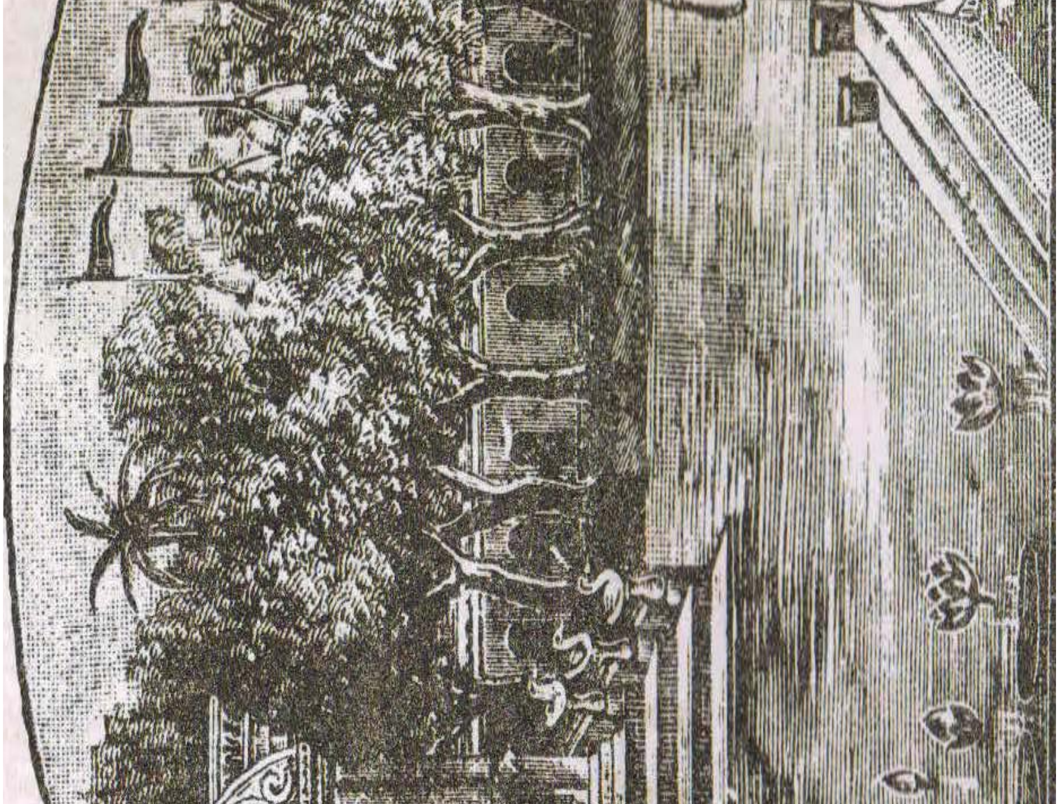

পুত্র-সরোবরে রাণী ও কোটালনী

('পুষ্পমালা')

ব্যাঙ হয়ে মালিনী বারো বছর থর্ থর করে কাঁপে ('কাঞ্চণমালা')

'তুরগে শোওয়ার' চন্দ্রমাণিক ('মালঞ্চমালা')

মালঞ্চমালার কামনা—

"সুখে থেকো, সুখে থেকো রে রাজপুত্র, সুখে থেকো রে রাজকন্যা!"

('মালঞ্চমালা')

সাত বোনের সঙ্গে কাঞ্চনমালা স্বর্গের রথে উঠে যায়।

সাত বোনের সঙ্গে কাঞ্চনমালা স্বর্গের রথে উঠে যায়।

('কাঞ্চনমালা')

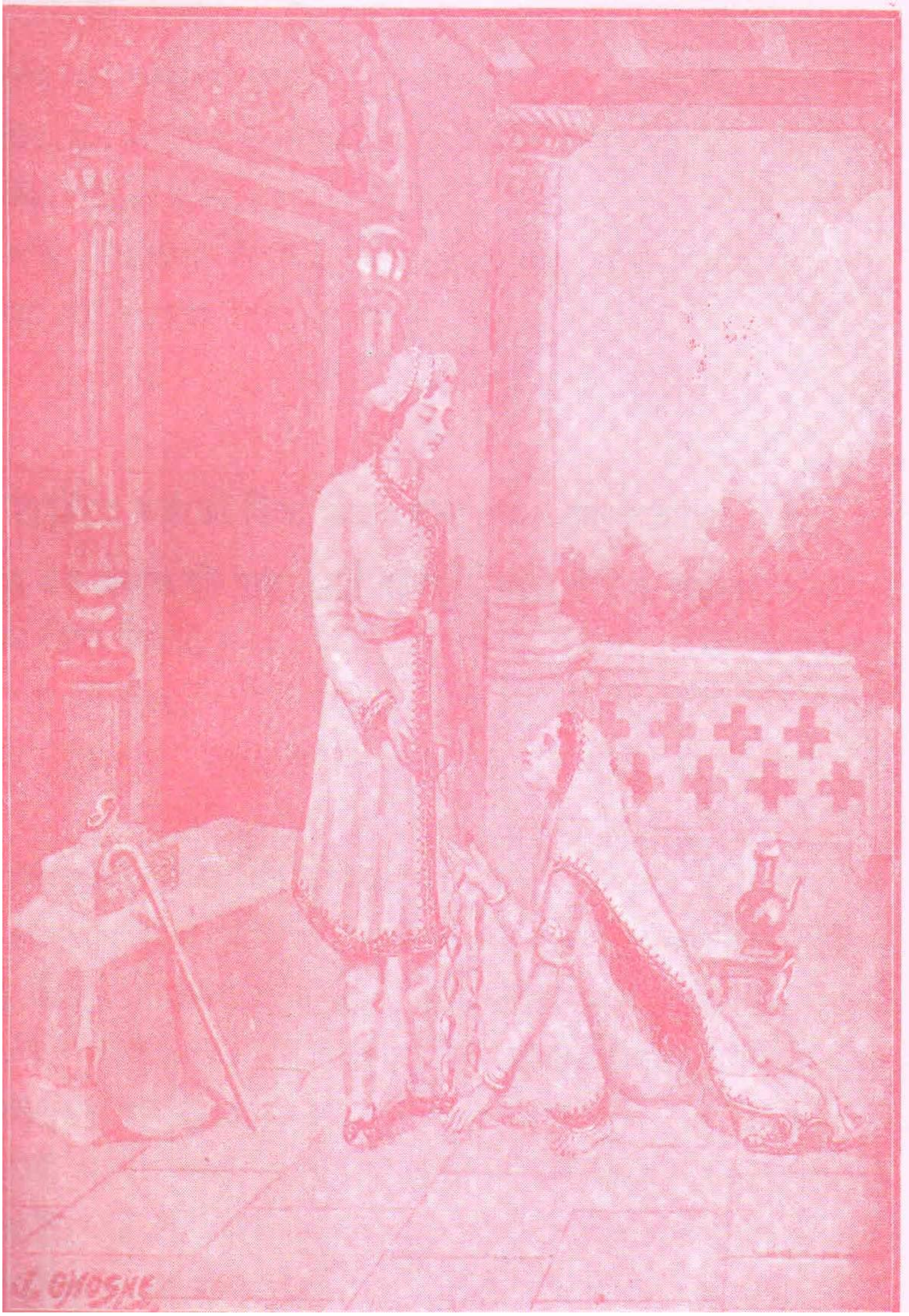

''স্বামী, তোমার নামের 'নির্শন'—

এই শঙ্খের মালা গাছি, পতি,

নাও সাথে দাসীর দর্শন'' ('শঙ্খমালা')

‘দিক নাই দিশা নাই’ ‘শক্তি ছুটেন—’ (‘শঙ্খমালা’)

‘রাজা চললেন স্বর্গে’

মন্ত্রী চললেন পাতালে

(‘হবু চন্দ্র রাজা গবু চন্দ্র মন্ত্রী’)

ঘোড়ার ডিম

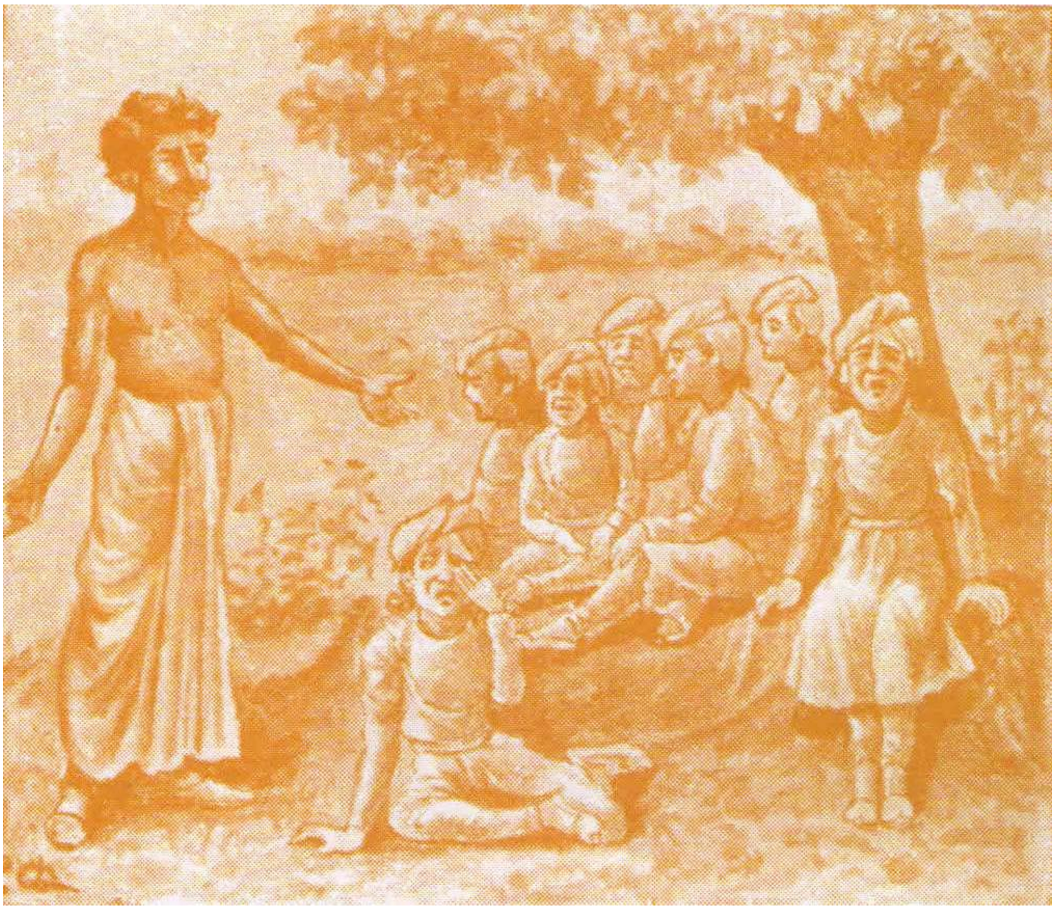

নিজেকে না গোণায় সাত ভাইয়ের এক ভাই কম পড়ে।　　　　('সওদাগরের সাত ছেলে')

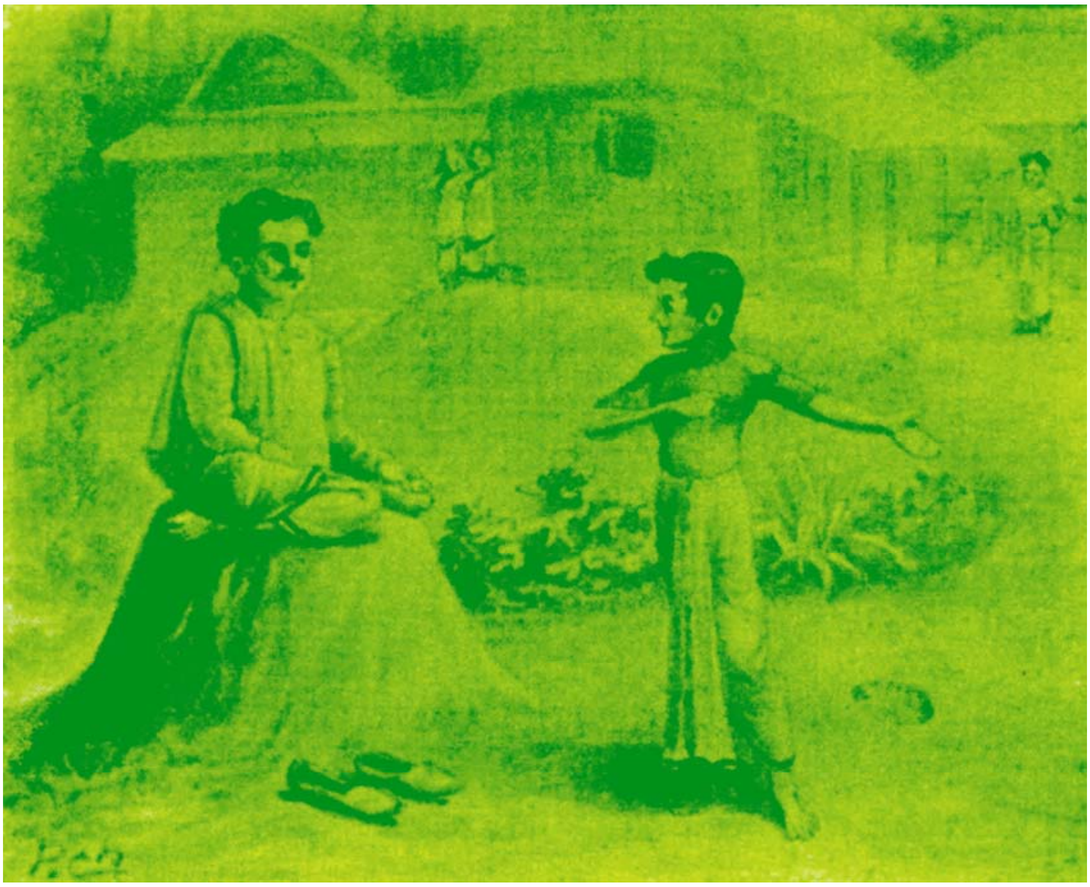

নূতন জামাইকে মা বলেছেন— উঁচু আসনে বসতে

"খেতে বসে কিচ্ছু চাইব না।
দিতে এলে, না না না না
বলব।" ('নূতন জামাই')

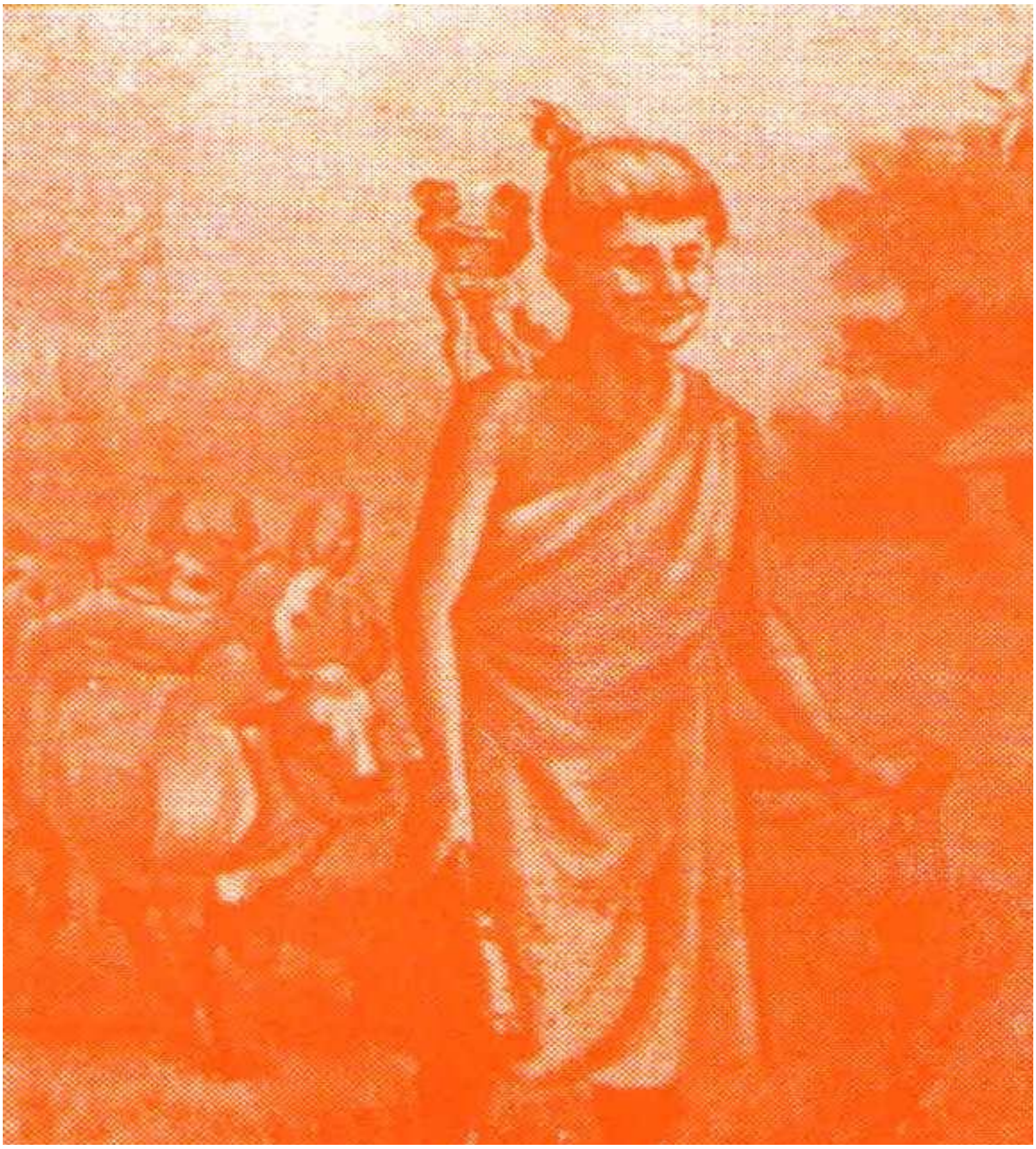

দুই জোয়ান বুড়ির কাঁধের ওপর লড়াই করছে, গাইদের নিয়ে বুড়ি মাঠে যাচ্ছে, বুড়ির পিঠে আঁচলের পুঁটলির ভেতর তার ছেলে জ্বরে কাঁপছে।

('বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান')

'হোক তোমার মাথা!'

'ব্রাহ্মণের মাথা যাক' ('ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী')

'তিন-ঠেঙ্গে' 'তে-মাথা' বৃদ্ধ ('রাজপুত্র')

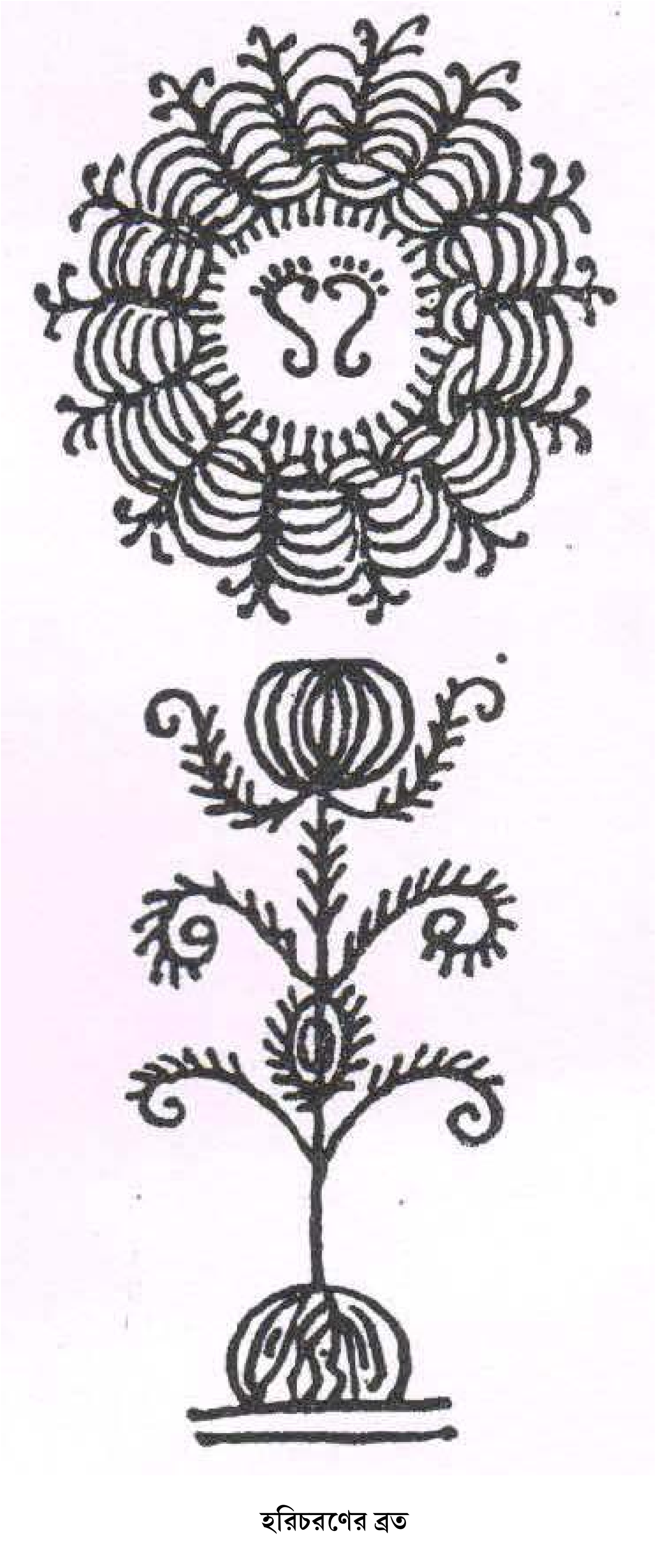

হরিচরণের ব্রত

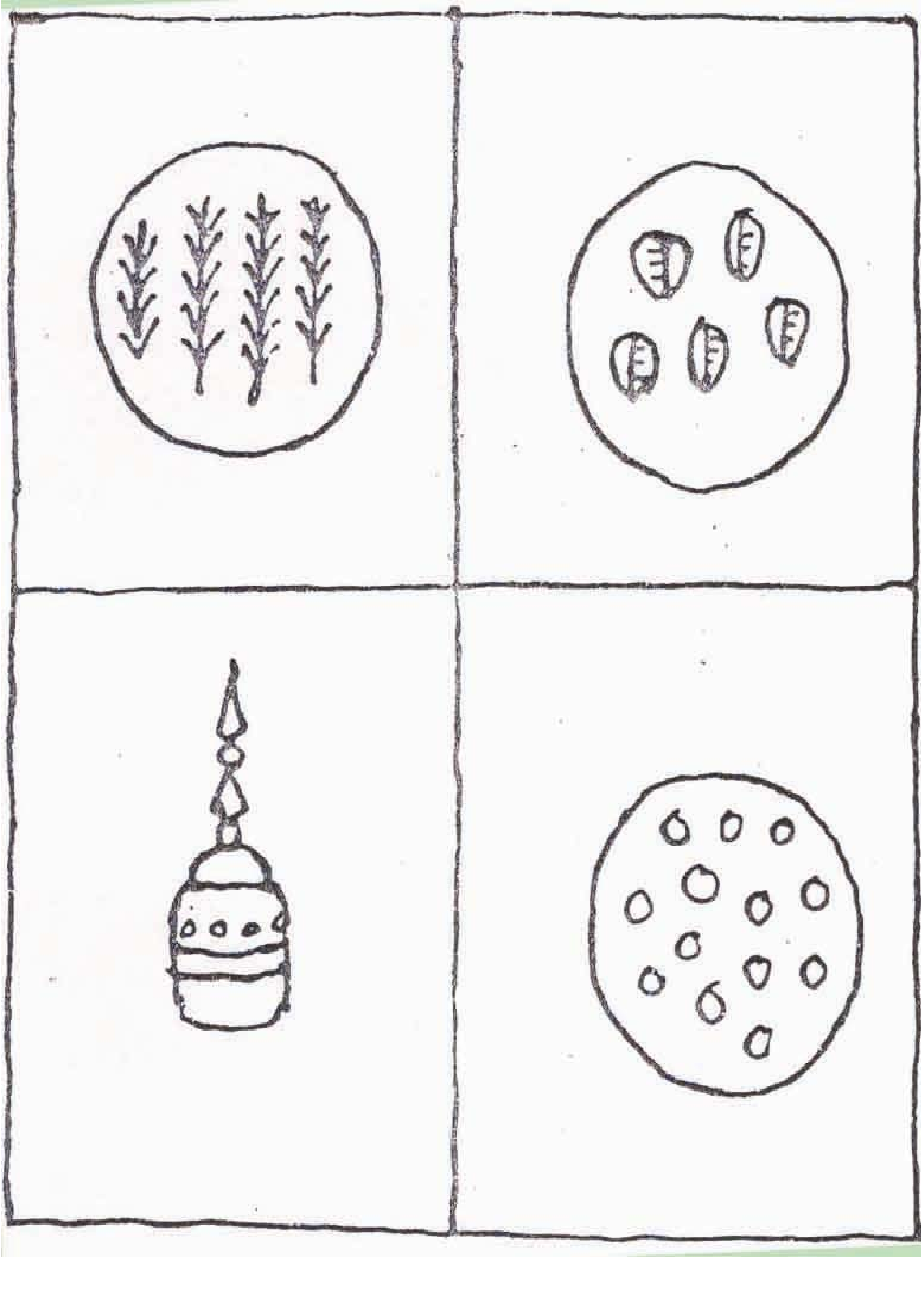

রণে-এয়ো ব্রত

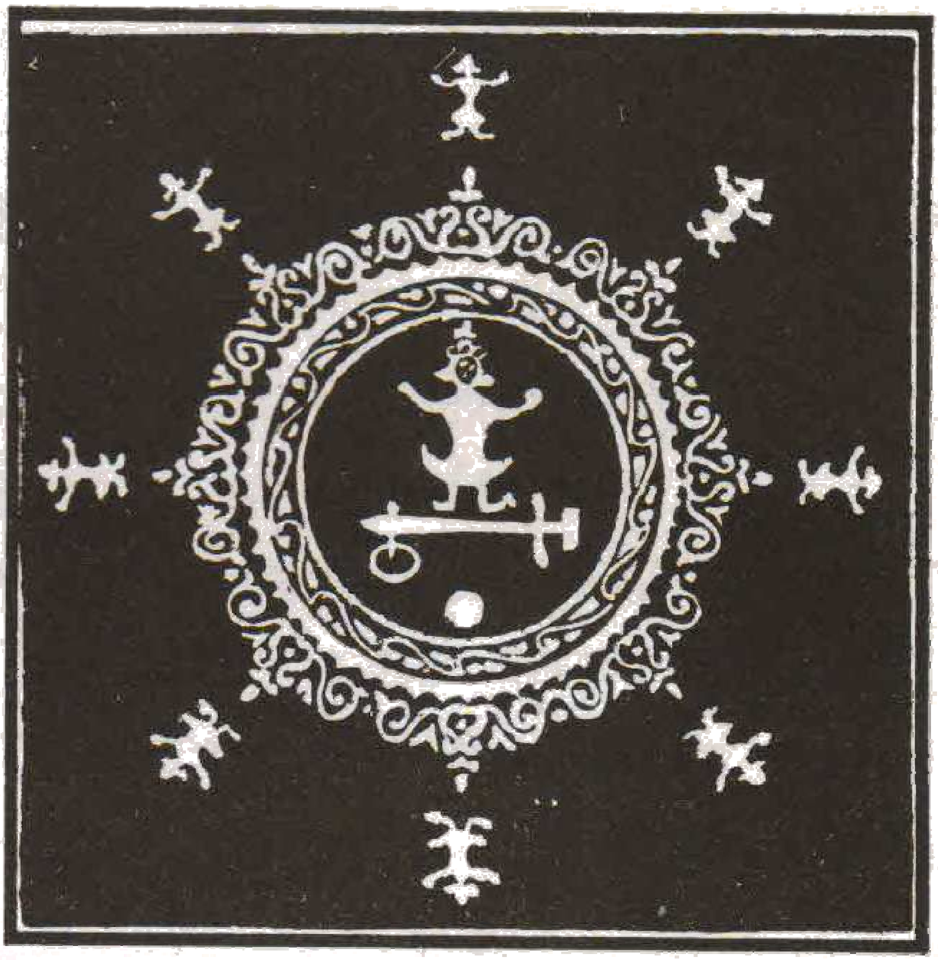

. বসুধারা ব্রতের আলপনা

. বসুধারা ব্রতের ঘট

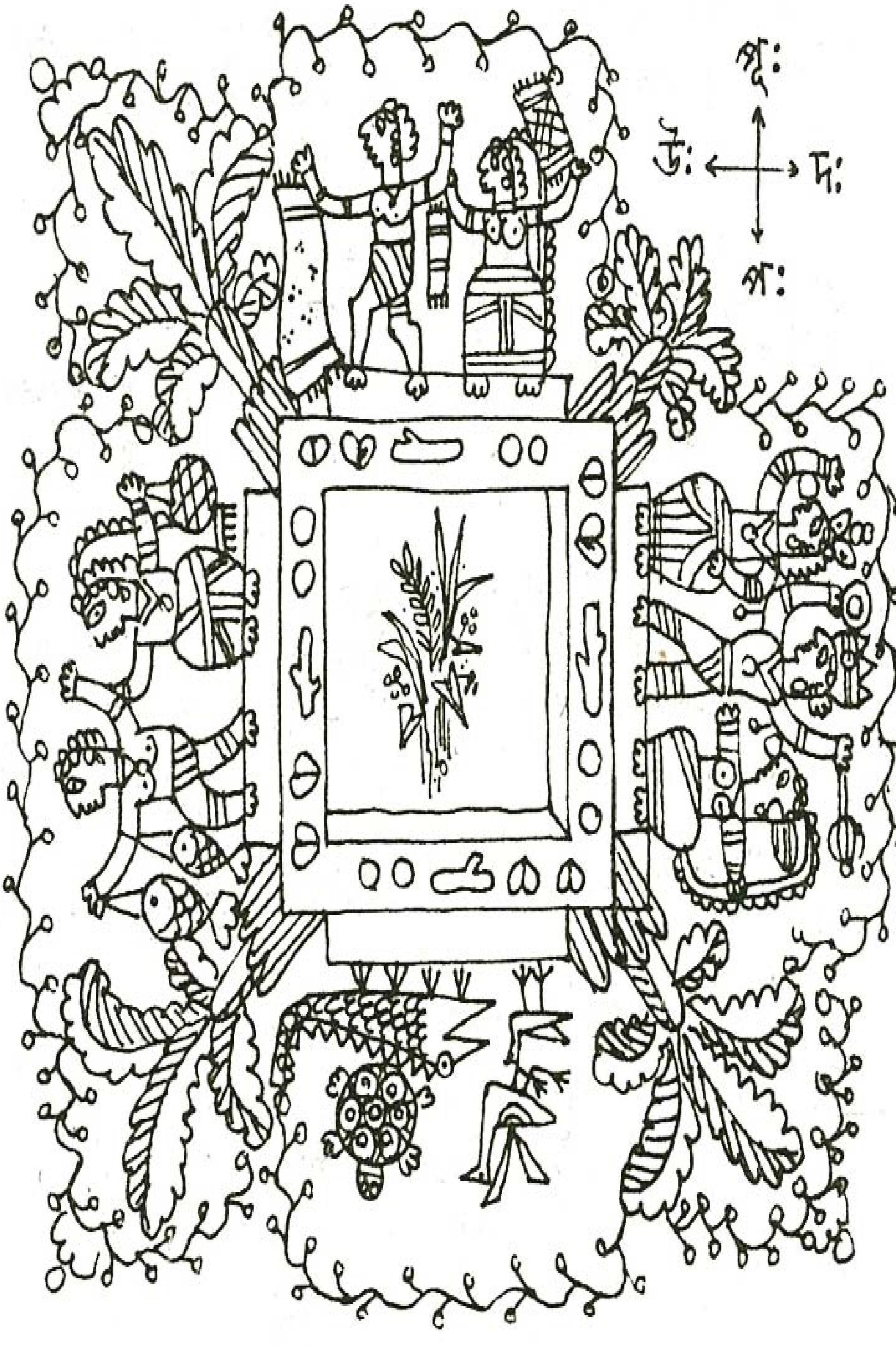

যমপুকুর ব্রত

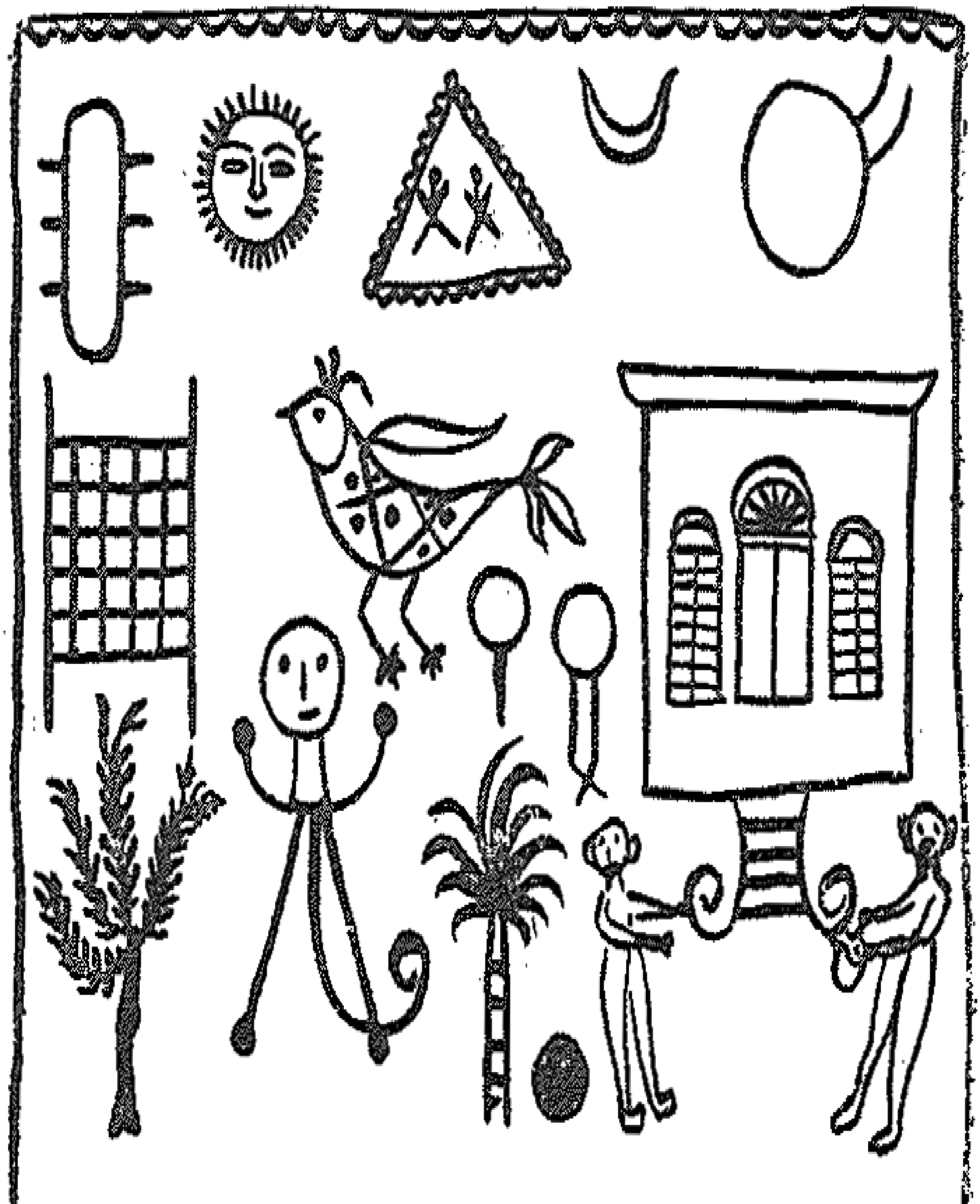

সেঁজুতি ব্রতের আলপনা

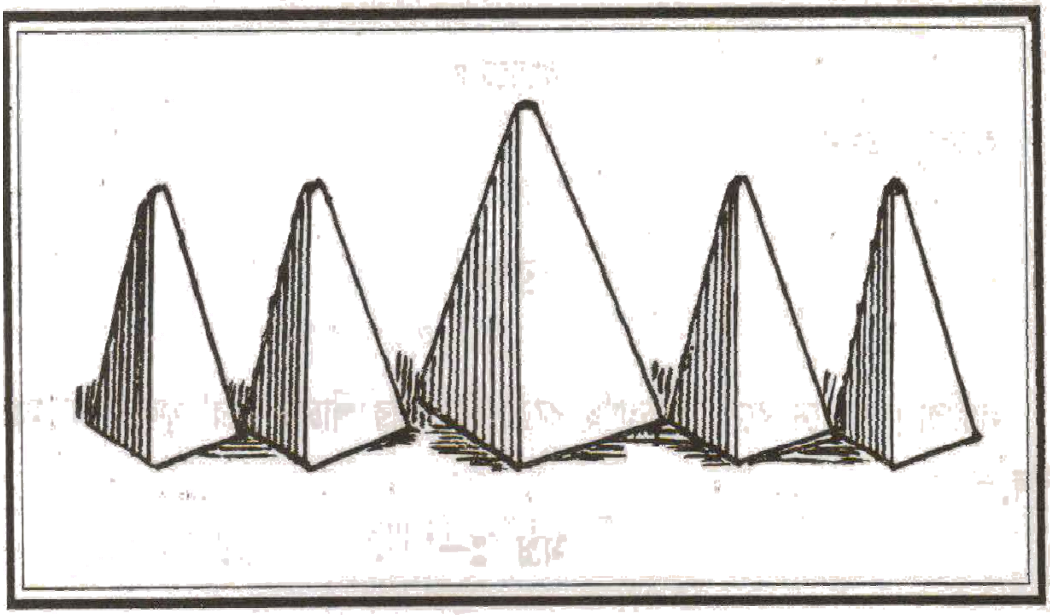

থুয়া ব্রতের ‘থুয়া’

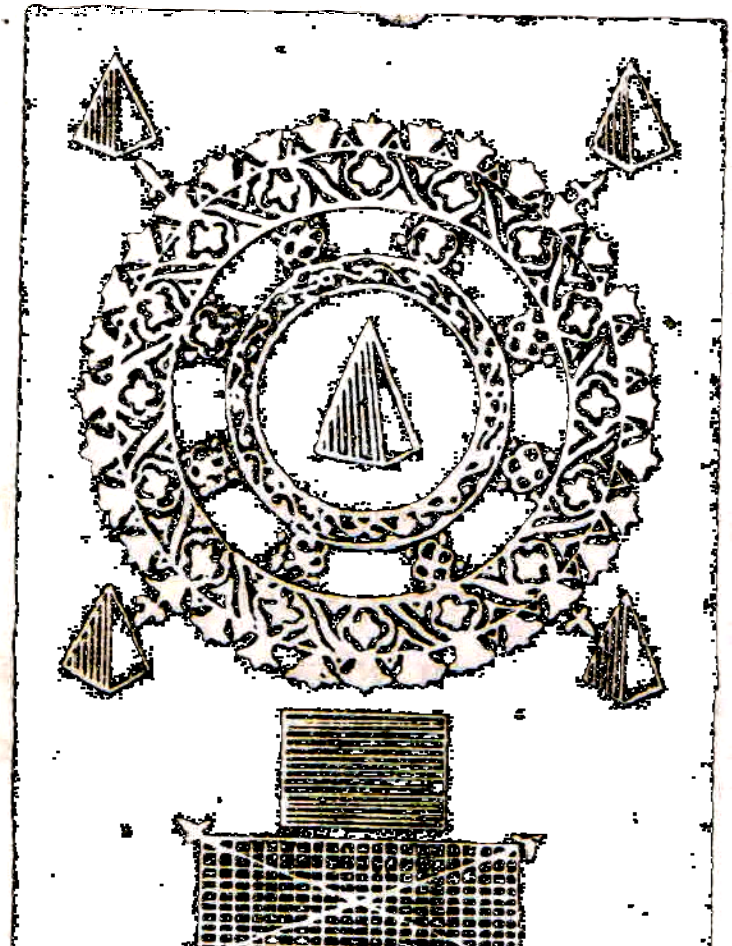

থুয়া ব্রতের পাট

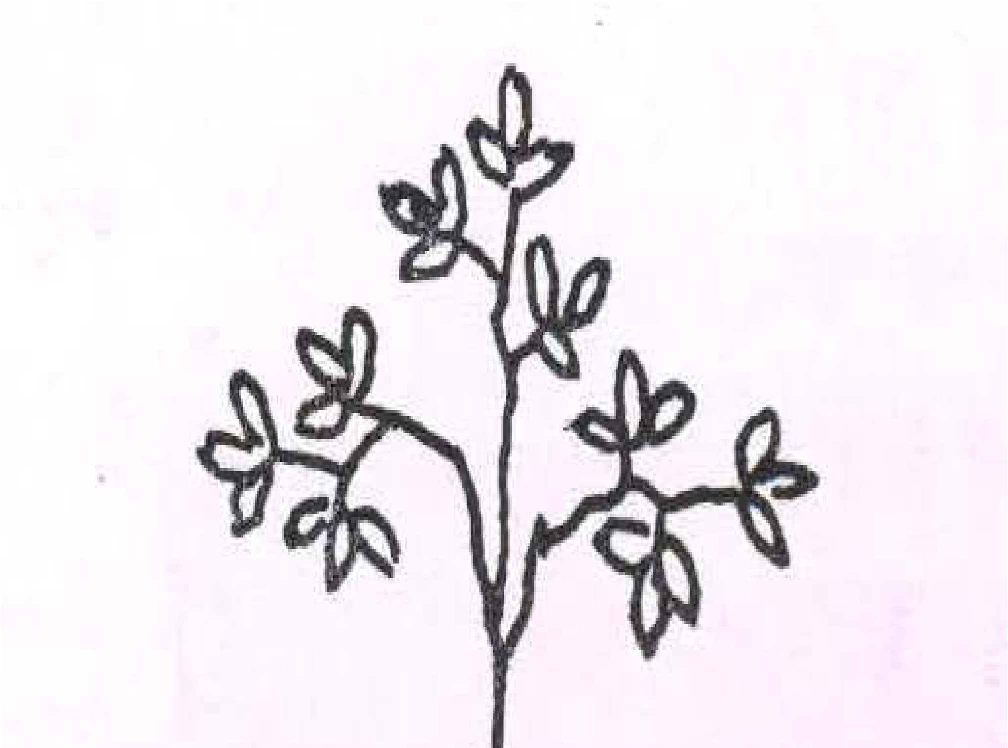

পুণ্যি পুকুর ব্রতের আলপনা

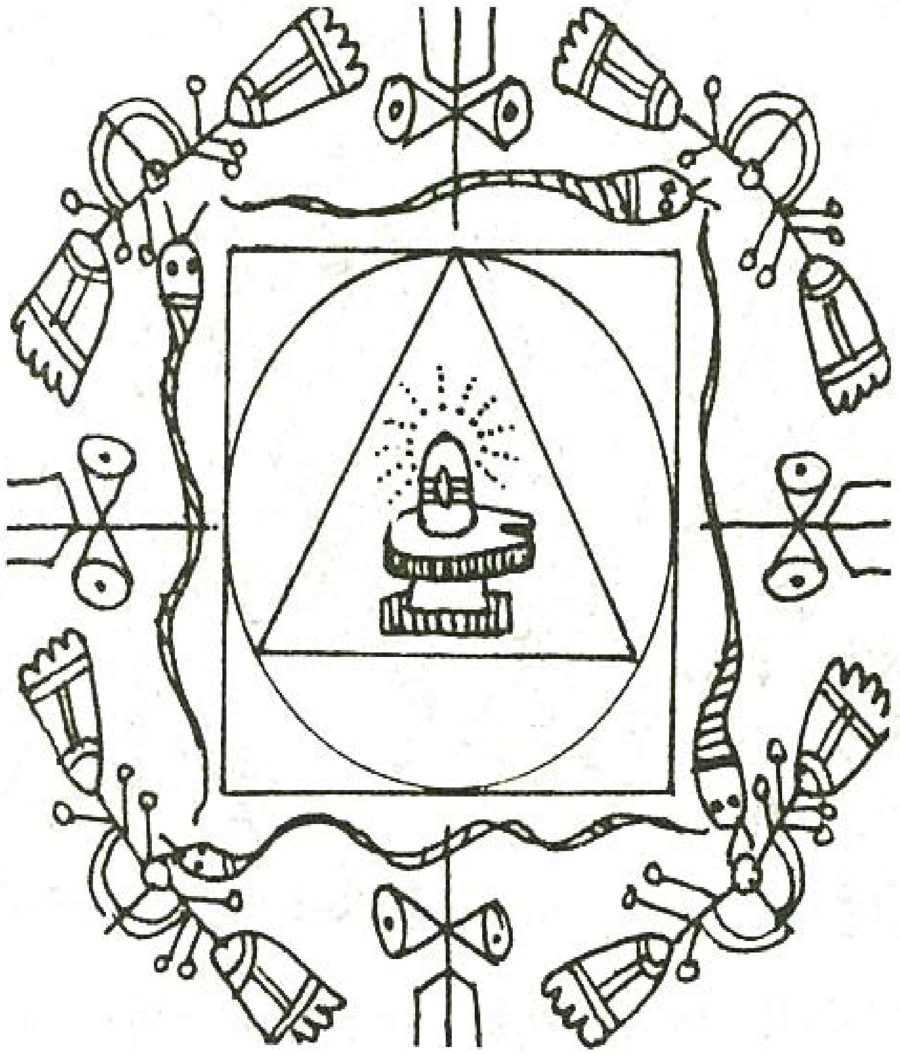

শঙ্কর ব্রত

অশ্বত্থ-নারায়ণ ব্রত

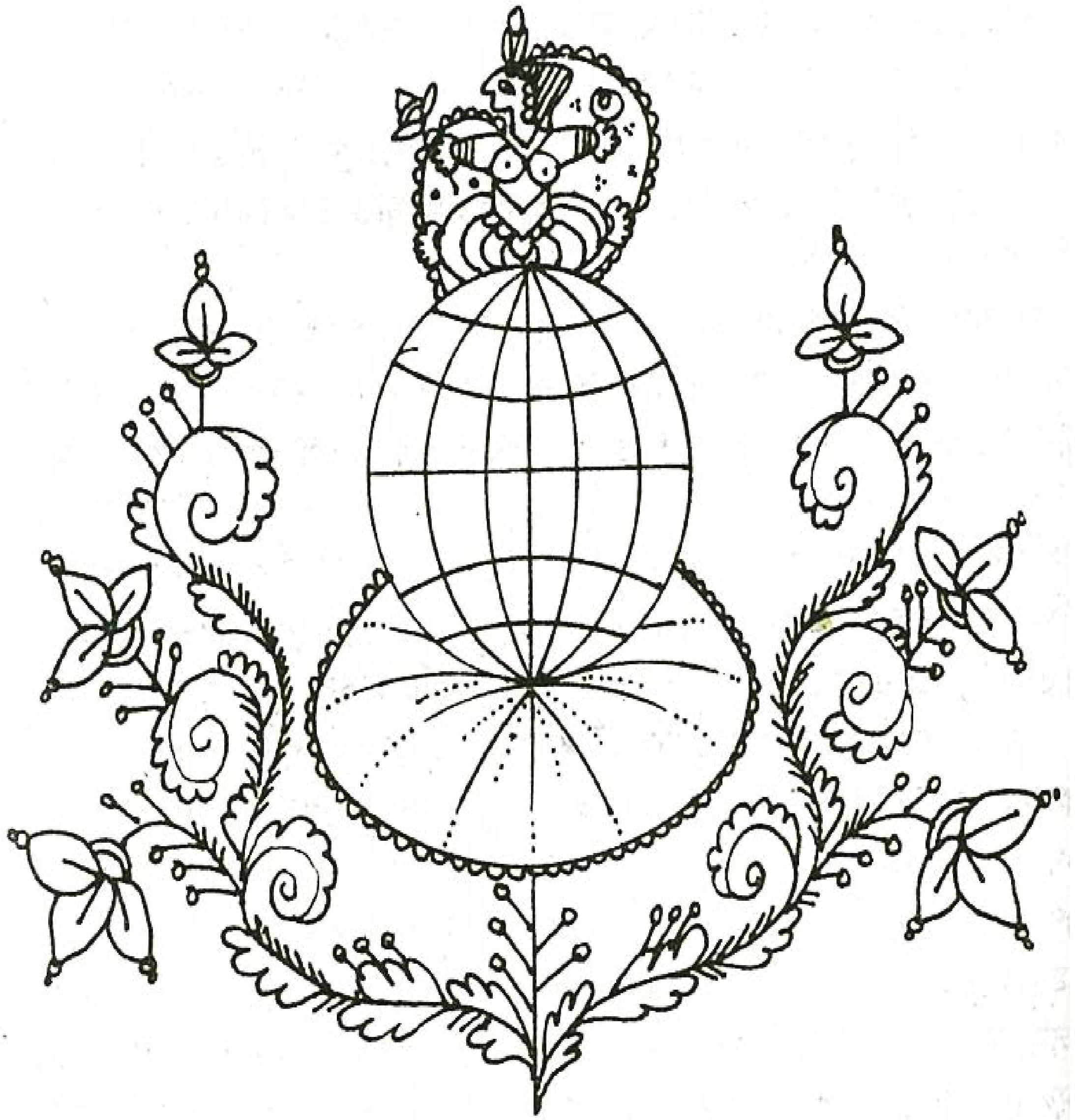

পৃথিবী ব্রত

২. <u>একটা সাক্ষাৎকার</u>

‘দয়াময়ীর কথা’ উপন্যাসের লেখিকা সুনন্দা শিকদারের সাক্ষাৎকার:

৩০.০৩.২০১৬ তারিখে সুনন্দা শিকদার মহাশয়ার বাসগৃহে (৩/৩, কৈলাস ব্যানার্জী লেন, বালি, হাওড়া) তাঁর যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তার নির্যাস :

প্রশ্ন: আপনি লিখেছেন ‘‘আমাদের গাঁয়ের সবাই বলে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ আর ‘ঠাকুরদাদার থলে’ লিখেছেন, এ সবই আসলে সোনাঢুলির শাস্তর’’। সত্যিই কী গ্রন্থগুলোর উৎস সোনাঢুলির শাস্তর?

উত্তর: আমাদের গ্রামের বট-পাকুড় গাছের তলায় বসে সোনাঢুলি গল্প বলতেন। গ্রামের লোক গর্ব করে বলত সোনাঢুলির শাস্তর। দক্ষিণাদা সেসব সংগ্রহ করে নাম দিয়েছিলেন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’, ‘ঠাকুরদাদার থলে’। তবে এ আমার ধারণা, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: আপনার এরকম ধারণার কারণ কী?

উত্তর: *ঠাকুরমা’র ঝুলি* মূলত আমার গ্রামে বসে লেখা, গ্রামের কথার ওপর ভিত্তি করে রচনা। এ ভাষা একেবারেই আমার গ্রামের ভাষা, এখনও আমার গ্রামের লোকেরা এভাবেই কথা বলে।

প্রশ্ন: গল্পগুলোর জন্ম হল কীভাবে?

উত্তর: ময়মনসিংহের মানুষ ছিল জমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর। তবে চাষের কাজ সারা বছর থাকে না। চাষের কাজ হয়ে গেলে চাষীদের কী কাজ? তাছাড়া চাষ চলাকালীনও চাষবাস করে এসে পান্তাভাত খাওয়ার পর চাষীর হাতে অখণ্ড অবসর। সন্ধেবেলাও তো সে মাঠে যাবে না, গল্প করেই কাটাবে। ফলে কাজের সময় বা মরসুম বাদে গল্প করাই এখানকার মানুষের অন্যতম মনোরঞ্জনের বিষয়।

প্রশ্ন: এই অবসরের ছাপ কী *ঠাকুরমা’র ঝুলি*-র ভাষায় লক্ষ করা যায়?

উত্তর: ‘এক যে ছিল রাজা’ বা ‘এক দেশের এক রাজপুত্র’ - বেশি সময় নিয়ে কথা বলা বা ধীরে কথা বলা, দীর্ঘ অবসর বলেই ভাষা এত গতিহীন, ধীর।

প্রশ্ন: দক্ষিণারঞ্জনের গল্প লেখার ধরন সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

উত্তর: আমার গ্রামে যেভাবে গল্পগুলো বলা হত, দক্ষিণাদা সেভাবেই লিখেছেন। কল্পনাপূর্ণ বাচনভঙ্গি, সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। তাছাড়া সম্ভবত জীবনের অপরিসীম অবকাশ, কম চাহিদা, শান্তি— এসবের প্রভাবও গল্পের ভাষায় রয়ে গেছে।

প্রশ্ন: দক্ষিণারঞ্জনের সব গ্রন্থের ভাষাই কী একই ধরনের?

উত্তর: *দাদামশায়ের থলে*-র ভাষা আলাদা। এই গ্রন্থের বেশ কিছু গল্পে নাগরিকতার প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন: শিশুরাই কী শুধু গল্পগুলোর শ্রোতা?

উত্তর: গল্প যখন বলা হচ্ছে তখন মনে হয় না শুধু শিশুরাই শুনছে। 'আটকুঁড়ে' শব্দের অর্থ শিশুরা কীভাবে জানবে? তাই গল্পের শ্রোতা কিন্তু বয়স্করাই।

প্রশ্ন: আপনি লিখেছেন, 'জয়জ্যাঠা বলতেন, ''সোনাঢুলির কাছে শাস্তর আমিও শুনছি, দক্ষিণাও শুনছে। ও একটু লেখবার-পড়বার জানে, আর বই ছাপাইবার টেকা আছে বইলা এত নাম কইর্‌ল।''' জয়জ্যাঠার এই ধারণা কতটা যুক্তিসম্মত?

উত্তর: সোনাঢুলি অনেক বড় গল্প-বলিয়ে ছিলেন, পিসিমা বলতেন, তাঁর জিহ্বায় সরস্বতীর অধিষ্ঠান ছিল। জয়জ্যাঠা কখনই অত বড় মাপের গল্প-বলিয়ে ছিলেন না। তাঁর পরিবেশন-পদ্ধতিও ছিল আদিরসাত্মক। তুলনায় দক্ষিণারঞ্জনের পরিবেশন-পদ্ধতি অনেক উঁচু দরের, অনেক পরিশীলিত। তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও সর্বসম্মত। কাজেই জয়জ্যাঠার এই ধারণা একেবারেই যুক্তিসম্মত নয়।

প্রশ্ন: দক্ষিণারঞ্জনের গল্পগুলো কী সংরক্ষণের চেষ্টা হয়েছিল?
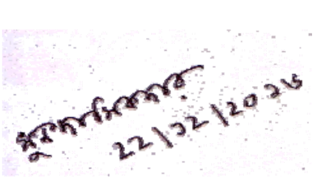
উত্তর: না, জমিদার বাড়ির উত্তর পুরুষেরা সংরক্ষণের কোন চেষ্টা করেনি।